ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস

সুলতান মাহমুদ গজনবীর

ভারত অভিযান

ভারত অভিযান - ৩

ভারত অভিযান

(তৃতীয় খণ্ড)

এনায়েতুল্লাহ

অনুবাদ
শহীদুল ইসলাম

এদারায়ে কোরআন

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ — ২০০৮

প্রকাশক ▸ আরিফ বিল্লাহ্, এদারায়ে কুরআন, ৫০, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০, স্বত্ব ▸ সংরক্ষিত, প্রচ্ছদ ▸ নাজমুল হায়দার
কম্পিউটার কম্পোজ ▸ এম. হক কম্পিউটার্স, মুদ্রণ ▸ আল-আরাফা প্রিন্টার্স
মোবাইল ঃ ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

মূল্য ঃ একশত ষাট টাকা মাত্র

BHAROT OVIJAN-3 : Writer Enayatullah, Translated by Shahidul Islam, Published by Edara-e- Quran, 50 Banglabazar, Dhaka-1100, Printed by Al-Arafa Printers Date of Publication March 2008.

PRICE TAKA ONE HUNDRED SIXTY ONLY

ISBN 984-70109-0000-3 SET

উৎসর্গ

তাকিয়া তাবাস্সুম (যীবা) গল্প উপন্যাস তার পড়া হয়ে ওঠে না কিন্তু আব্বুর নতুন বই এলেই দখলে নেয়ার জন্যে মরিয়া।

...............আর অভিযোগ কেন যে আমি ছোট হলাম! ছোট না হলে আব্বুর ছদ্মনাম আবুশিফা না হয়ে আবুযীবা হতো। সত্যি, অনিষ্পন্ন অভিযোগ। অতএব, এ উৎসর্গ তার নামে। বইপ্রিয়তা তাকে আলোকিত মানুষ করুক, এই দু'আ।

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ্! 'এদারায়ে কুরআন' কর্তৃক প্রকাশিত সুলতান মাহমূদ এর ভারত অভিযান সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। এজন্য আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং পাঠক মহলকে জানাচ্ছি মোবারকবাদ। নিয়মিত বিরতি দিয়ে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না কিন্তু দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও মুদ্রণ সামগ্রির উচ্চমূল্য আমাদের টুঁটি চেপে ধরেছে। ফলে কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে এই সিরিজের প্রকাশনা।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে রবিউল আউয়াল '০৮ এর বইমেলা উপলক্ষে এই সিরিজের তৃতীয় খণ্ডটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে সুখানুভব করছি।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতার পরও আমরা এ খণ্ডটি আগেরগুলোর চেয়ে আরো সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তবুও মুদ্রণ প্রমাদ ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। বিজ্ঞমহলের কাছে যে কোন ত্রুটি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মতো তৃতীয় খণ্ডটিও পাঠক-পাঠিকা মহলে আদৃত হলে আমাদের সার্বিক প্রয়াস সার্থক হবে।

—প্রকাশক

লেখকের কথা

"মাহমূদ গজনবীর ভারত অভিযান" সিরিজের এটি তৃতীয় খণ্ড। উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতান মাহমূদ গজনবী সতের বার ভারত অভিযান পরিচালনাকারী মহানায়ক হিসেবে খ্যাত। সুলতান মাহমূদকে আরো খ্যাতি দিয়েছে পৌত্তলিক ভারতের অন্যতম দু' ঐতিহাসিক মন্দির সোমনাথ ও থানেশ্বরীতে আক্রমণকারী হিসেবে। ঐসব মন্দিরের মূর্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন মাহমূদ। কিন্তু উপমহাদেশের পাঠ্যপুস্তকে এবং ইতিহাসে মাহমূদের কীর্তির চেয়ে দুষ্কৃতির চিত্রই বেশী লিখিত হয়েছে। হিন্দু ও ইংরেজদের রচিত এসব ইতিহাসে এই মহানায়কের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে তাঁর সুখ্যাতি চাপা পড়ে গেছে। মুসলিম বিদ্বেষের ভাবাদর্শে রচিত ইতিহাস এবং পরবর্তীতে সেইসব অপইতিহাসের ভিত্তিতে প্রণীত মুসলিম লেখকরাও মাহমূদের জীবনকর্ম যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের বোঝার উপায় নেই, তিনি যে প্রকৃতই একজন নিবেদিতপ্রাণ ইসলামের সৈনিক ছিলেন, ইসলামের বিধি-বিধান তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। জাতিশত্রুদের প্রতিহত করে খাঁটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও দৃঢ় করণের জন্যেই নিবেদিত ছিল তার সকল প্রয়াস। অপলেখকদের রচিত ইতিহাস পড়লে মনে হয়, সুলতান মাহমূদ ছিলেন লুটেরা, আগ্রাসী ও হিংস্র। বারবার তিনি ভারতের মন্দিরগুলোতে আক্রমণ করে সোনা-দানা, মণি-মুক্তা লুট করে গজনী নিয়ে যেতেন। ভারতের মানুষের উন্নতি কিংবা ভারত কেন্দ্রিক মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা তার কখনো ছিলো না। যদি তৎকালীন ভারতের নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য করা এবং পৌত্তলিকতা দূর করে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার একান্তই ইচ্ছা তাঁর থাকতো, তবে তিনি কেন মোগলদের মতো ভারতে বসতি গেড়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতেন না? ইত্যাকার বহু কলঙ্ক এঁটে তার চরিত্রকে কলুষিত করা হয়েছে।

মাহমূদ কেন বার বার ভারতে অভিযান চালাতেন? মন্দিরগুলো কেন তার টার্গেট ছিল? সফল বিজয়ের পড়ও কেন তাকে বার বার ফিরে যেতে হতো গজনী? ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জবাব; ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ সৈনিক সুলতান মাহমূদকে তুলে ধরার জন্যে আমার এই প্রয়াস। নির্ভরযোগ্য দলিলাদি ও বিশুদ্ধ ইতিহাস ঘেটে আমি এই বইয়ে মাহমূদের

প্রকৃত জীবন চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রকৃত পক্ষে সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর মতোই মাহমূদকেও স্বজাতির গাদ্দার এবং বিধর্মী পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে একই সাথে লড়াই করতে হয়েছে। যতো বার তিনি ভারত অভিযান চালিয়েছেন, অভিযান শেষ হতে না হতেই খবর আসতো, সুযোগ সন্ধানী সাম্রাজ্যলোভী প্রতিবেশী মুসলিম শাসকরা গজনী আক্রমণ করছে। কেন্দ্রের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বাধ্য হয়েই মাহমূদকে গজনী ফিরে যেতে হতো। একপেশে ইতিহাসে লেখা হয়েছে, সুলতান মাহমূদ সতের বার ভারত অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু একথা বলা হয়নি, হিন্দু রাজা-মহারাজারা মাহমূদকে উৎখাত করার জন্যে কতো শত বার গজনীর দিকে আগ্রাসন চালিয়ে ছিল।

সুলতান মাহমূদের বারবার ভারত অভিযান ছিল মূলত শত্রুদের দমিয়ে রাখার এক কৌশল। তিনি যদি এদের দমিয়ে রাখতে ব্যর্থ হতেন, তবে হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকতাবাদ সাগর পাড়ি দিয়ে আরব পর্যন্ত বিস্তৃত হতো।

মাহমূদের পিতা সুবক্তগীন তাকে অসীয়ত করে গিয়েছিলেন, "বেটা! ভারতের রাজাদের কখনও স্বস্তিতে থাকতে দিবে না। এরা গজনী সালাতানাতকে উৎখাত করে পৌত্তলিকতার সয়লাবে কাবাকেও ভাসাতে চায়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময়ের মত ভারতীয় মুসলমানদেরকে হিন্দুরা জোর জবরদস্তি হিন্দু বানাচ্ছে। এদের ঈমান রক্ষার্থে তোমাকে পৌত্তলিকতার দুর্গ গুড়িয়ে দিতে হবে। ভারতের অগণিত নির্যাতিত বনি আদমকে আযাদ করতে হবে, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে হবে।"

আলবিরুনী, ফিরিশ্‌তা, গারদিজী, উতবী, বাইহাকীর মতো বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ তৎকালীন সবচেয়ে বড় বুযুর্গ ও ওলী শাইখ আবুল হাসান কিরখানীর মুরীদ ছিলেন। তিনি বিজয়ী এলাকায় তার হেদায়েত মতো পুরোপুরি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি নিজে কিরখানীর দরবারে যেতেন। কখনও তিনি তাঁর পীরকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠাননি। উপরন্তু তিনি ছদ্মবেশে পীর সাহেবের দরবারে গিয়ে ইসলাহ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি আত্মপরিচয় গোপন করে কখনও নিজেকে সুলতানের দূত হিসেবে পরিচয় দিতেন। একবার তো আবুল হাসান কিরখানী মজলিসে বলেই ফেললেন, "আমার একথা ভাবতে ভালো লাগে যে, গজনীর সুলতানের দূত সুলতান নিজেই হয়ে থাকেন। এটা প্রকৃতই মুসলমানের আলামত।"

মাহমূদ কুরআন, হাদীস ও দীনি ইলম প্রচারে খুবই যত্নবান ছিলেন। তাঁর দরবারে আলেমদের যথাযথ মর্যাদা ছিল। সব সময় তার বাহিনীতে শত্রু পক্ষের চেয়ে সৈন্যবল কম হতো কিন্তু তিনি সব সময়ই বিজয়ী হতেন। বহুবার এমন হয়েছে যে, তার পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ময়দানে দু'রাকাত নামায আদায় করে মোনাজাত করতেন এবং চিৎকার করে বলতেন, "আমি বিজয়ের আশ্বাস পেয়েছি, বিজয় আমাদেরই হবে।" বাস্তবেও তাই হয়েছে।

অনেকেই সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী আর সুলতান মাহমূদকে একই চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বীর সেনানী মনে করেন। অবশ্য তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একই ছিল। তাদের মাঝে শুধু ক্ষেত্র ও প্রতিপক্ষের পার্থক্য ছিল। আইয়ুবীর প্রতিপক্ষ ছিল ইহুদী ও খৃস্টশক্তি আর মাহমূদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল হিন্দু পৌত্তলিক রাজন্যবর্গ। ইহুদী ও খৃস্টানরা সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর সেনাদের ঘায়েল করতো প্রশিক্ষিত সুন্দরী রমণী ব্যবহার করে নারী গোয়েন্দা দিয়ে আর এর বিপরীতে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে এরা ব্যবহার করতো শয়তানী যাদু। তবে ইহুদী-খৃস্টানদের চেয়ে হিন্দুদের গোয়েন্দা তৎপরতা ছিল দুর্বল কিন্তু সুলতানের গোয়েন্দারা ছিল তৎপর ও চৌকস।

তবে একথা বলতেই হবে, সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর গোয়েন্দারা যেমন দৃঢ়চিত্ত ও লক্ষ্য অর্জনে অবিচল ছিল, মাহমূদের গোয়েন্দারা ছিল নৈতিক দিক দিয়ে ততোটাই দুর্বল। এদের অনেকেই হিন্দু নারী ও যাদুর ফাঁদে আটতে যেতো। অথবা হিন্দুস্তানের মুসলিম নামের কুলাঙ্গররা এদের ধরিয়ে দিতো। তারপরও সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর চেয়ে সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা কার্যক্রম ছিল বেশি ফলদায়ক।

ইতিহাসকে পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য, বিশেষ করে তরুণদের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশনের জন্যে গল্পের মতো করে রচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থ। বাস্তবে এর সবটুকুই সত্যিকার ইতিহাসের নির্যাস। আশা করি আমাদের নতুন প্রজন্ম ও তরুণরা এই সিরিজ পড়ে শত্রু-মিত্রের পার্থক্য, এদের আচরণ ও স্বভাব জেনে এবং আত্মপরিচয়ে বলীয়ান হয়ে পূর্বসূরীদের পথে চলার দিশা পাবে।

এনায়েতুল্লাহ
লাহোর।

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

প্রতিবেশী মুসলিম শাসকদের মধ্যে এলিখ খান ছিলো সুলতানের জঘন্যতম শত্রু। সুলতানের অনুপস্থিতির সুযোগে একবার সে গজনী দখলের উদ্দেশে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আগ্রাসন চালিয়েছিলো। কিন্তু তাকে গজনী বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে জীবন নিয়ে পালাতে হয়েছিলো। হিন্দুস্তান থেকে সংবাদ পেয়ে বিদ্যুদ্গতিতে গজনী ফিরে এসে সুলতান নিজে এলিখ খানকে প্রতিরোধ করেছিলেন। এলিখ খান সুলতানের শাসনাধীন খোরাসান অঞ্চল দখল করে নিতে তৎপর ছিলো।

"মাননীয় সুলতান! এলিখ খান একটি বিষধর সাপ। ও যতোদিন বেঁচে থাকবে, ততোদিন সুযোগ পেলেই আমাদের দংশন করতে থাকবে।" বলছিলেন সুলতান মাহমূদের কাছে আগত দুই গোয়েন্দা কর্মকর্তার একজন। এদের একজন সুলতানের নির্দেশে এলিখ খানের সেনাবাহিনীর মধ্যেই কাজ করতো। তারা জানালো, এবার আপনার অনুপস্থিতিতে এলিখ খান তার ভাই তোগা খান ও কাদের খানকে প্ররোচিত করছিলো তারা যেনো আপনার বিরুদ্ধে সামরিক সংঘাতে তাকে সহযোগিতা করে। তারা তিনজন মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল সেনাবাহিনী নিয়ে গজনী আক্রমণ করে দখল করে নিতে চাচ্ছিলো। কিন্তু তোগা ও কাদের খান আপনার ভয়ে এলিখ খানের সহযোগী হতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে এলিখ খান তার ভাই তোগা খানের বাদশাহী দখল করার জন্য সেনা অভিযান চালায়। কিন্তু উজগন্দ নামক স্থানে পৌছার পর তাদের উপর প্রচণ্ড তুষারপাত ও ঝড়োবৃষ্টি শুরু হয়। ফলে এলিখ খানের সৈন্যদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। বিপুলসংখ্যক সওয়ারী ও সৈন্য প্রচণ্ড তুষারপাতের কবলে পড়ে মারা যায়। প্রাকৃতিক প্রতিরোধের মুখে বড় ধরনের ক্ষতি সাধিত হয়। বাধ্য হয়েই এলিখ খান সেনাভিযান পরিহার করে আপন রাজধানীতে ফিরে আসে।

"তোগা খান কী করতে চায়?" জানতে চাইলেন সুলতান।

"তিনি আপনার সহযোগী। আমাদের যে সহকর্মী তোগা খানের সেনাবাহিনীতে কর্মরত, সে খবর দিয়েছে, এলিখ খানের অভিযান প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যর্থ হওয়ার পর তাকে হুঁশিয়ার করে পয়গাম পাঠায়, যদি পুনর্বার সে তার রাজ্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায়, তাহলে তিনি সুলতানের সাথে মৈত্রী গড়ে তুলবেন।"

"তোগা খানকে কি বিশ্বাস করা যায়?"

"মাননীয় সুলতান! কারো মনের কথা তো আর বলা যায় না। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা বোঝা যায়, তাতে তোগা খান আপনার সাথে মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী।"

"এর অর্থ হলো, এলিখ খানের মতো একজন হিংসুটে ক্ষমতালিপ্সু আগ্রাসীর দুষ্কৃতি থেকে নিজের রাজ্য ও শাসনের নিরাপত্তার জন্য তোগা খান আমাদের সাথে মৈত্রী গড়তে আগ্রহী।" ব্যাখ্যা করলেন সুলতান। "ঠিক আছে, আমি তার সাথে মৈত্রী স্থাপনে অস্বীকৃতি জানাবো না। তবে তোগা খানের সাথে আমার একবার সাক্ষাৎ হওয়া দরকার। এসব ক্ষমতালোভী মুসলিম শাসক আমাদের জন্য পায়ের বেড়িতে পরিণত হয়েছে।... তোমরা তোগা খানকে খুবই গোপনে একথা জানিয়ে দাও যে, আমি শীঘ্রই তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছি। সাক্ষাতের জন্য তাকে আমার কাছে আসতে হবে না, আমিও তার কাছে যাবো না। গজনীর বাইরে যতো দূরেই হোক সেখানে চলে আসলে আমি নিজে গিয়ে সেখানে তার সাথে সাক্ষাৎ করবো।"

এসব কারণে বিজয়ের উল্লাসে শরীক হতে পারেননি সুলতান। অভ্যন্তরীণ হিংসা আর স্বজাতির ক্ষমতলিপ্সু শাসকদের প্রতিহিংসায় গৃহযুদ্ধের খড়গ সবসময় সুলতানের মাথার উপর ঝুলন্ত ছিলো। তিনি এ পর্যায়ে এসে অনুভব করলেন, ঘরের ভেতরের এই বিষধর সাপগুলোর মাথা পিষে ফেলা এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অত্যন্ত সংগোপনে সুলতানের গোয়েন্দারা তোগা খানের কাছে তাঁর পয়গাম নিয়ে গেলে সাক্ষাতের ব্যাপারে তিনি কোন আপত্তি করেননি। তিনি গজনী থেকে নিরাপদ দূরত্বে একটি জায়গার কথা বলে দিলেন। চারদিন পর সেই জায়গায় দুই শাসকের সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হলো।

সময়মতো ঠিক জায়গায় তোগা খান পৌঁছে গেলো। জায়গাটি ছিলো প্রাকৃতিক নিসর্গে ভরপুর মনোরম। একটি খরস্রোতা নদীর পাশে ঘন গাছগাছালী আর বনফুলের সমাহারে সবুজ-শ্যামল জায়গায় তোগা খান ও সুলতানের সাক্ষাৎ হলো। সুলতান তোগা খানকে বুকে জড়িয়ে নিলেন।

"এ কথা কি সত্য যে, আপনি আমার সাথে মৈত্রী স্থাপন করতে চান? আমি আপনার কাছে পয়গাম দিয়ে দূত পাঠানোর কথা ভাবছিলাম, ঠিক সেই সময় আপনার পয়গাম পেয়ে আপনার ডাকে সাড়া দিলাম। আমি আপনার সাথে মৈত্রী চুক্তি করতে আগ্রহী।" বললেন তোগা খান।

"আপনার এই মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্য কি আপনার রাজত্বের নিরাপত্তার জন্য, নাকি মুসলমানরা পরস্পর মিলেমিশে থাকা আল্লাহর নির্দেশ– এ জন্য? আপনি যদি রাজত্বের নিরাপত্তার জন্য মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী হয়ে থাকেন, তাহলে সেই মৈত্রীতে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি শুধু বাগদাদ খেলাফতের অধীনে মৈত্রী স্থাপন করতে পারি। আমি চাই স্বাধীন মুসলিম রাজ্যগুলোর অস্তিত্ব থাকুক, সবাই খেলাফতে বাগদাদকেই মুসলমানদের কেন্দ্র বলে স্বীকার করে নিক। ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে অক্ষুণ্ন রাখতে হলে সকল মুসলিম শাসকের খেলাফতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিকল্প নেই।" সুলতান বললেন।

সুলতান মাহমূদের কথা শুনে তোগা খানের ঠোঁটের কোণে একটা বিরক্তিকর হাসির ভাব ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, "সুলতান মাহমূদকে আমি খুবই দূরদর্শী ও জ্ঞানী মনে করতাম। কিন্তু বুঝতে পারছি, আপনার মধ্যে রণকৌশল ও যুদ্ধজয়ের যেমন পারদর্শিতা আছে।... বোঝা যাচ্ছে, আপনার মধ্যে ধর্মীয় ভাবাবেগ প্রবল। বলা চলে আপনি ধর্মের ব্যাপারে অতি মাত্রায় আবেগপ্রবণ।"

"আপনি কী বোঝাতে চাচ্ছে? পরিষ্কার করে বলুন।" সুলতান বললেন।

"আপনি যে খলীফাকে ইসলামের সেবক ও কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে রেখেছেন, তিনি এতোটাই ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যলিপ্সু, যেমনটা ক্ষমতালিপ্সু আমার ভাই ও আপনার প্রতিবেশী মুসলিম শাসকবৃন্দ। এরা আপনার কাছ থেকে গজনী ও খোরাসান ছিনিয়ে নেয়ার জন্য সবসময়ই চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।" তোগা খান বললেন।

"আপনি কি বাগদাদের খলীফা কাদের বিল্লাহ আব্বাসীর কথা বলছেন?" জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

"আমি জানি, আমার কথা আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না।" বললেন তোগা খান। "বেশ কিছুদিন আগেই এ ব্যাপারে আমি আপনাকে অবহিত করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার ভাই এলিখ খানের কারণে আমি বিড়ম্বনা বাড়াতে চাইনি। সেই সাথে আমার মধ্যে এই আশংকাও বিরাজ করছিলো যে, আপনার কাছে আমার কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না। আপনি আমার ব্যাপারে বেশি সন্দেহপরায়ণ হয়ে যেতে পারেন। আমিও আপনার মতোই কেন্দ্রীয় খেলাফতের প্রত্যাশী। কিন্তু সেই খলিফাকে আমি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ভাবতে রাজি নই, যে একটি এলাকার শাসক হওয়ার পরও নিজের রাজ্যবিস্তারে চক্রান্তের আশ্রয় নেয়।"

"তোগা খান! ক্ষমতাসীন খলিফার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের আগে ভেবে নাও– যদি এ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহলে আমি সেনা অভিযান পরিচালনা করে তোমার রাজত্বের সাধ মিটিয়ে দেবো।" রাগে-ক্ষোভে ফুঁসে উঠলেন সুলতান।

হাসলেন তোগা খান। সেই হাসিতে কিছুটা রহস্যময়তা এনে বললেন, "মানুষের মধ্যে যখন শক্তির অহংকার দেখা দেয়, তখন নিজের ভুলগুলোকেও দূরদর্শিতা মনে করে এবং নিজের উপলব্ধির ব্যতিক্রম কোন কথা শুনতে পছন্দ করে না। সুলতান নিজেকে সামরিক শক্তির গর্ব থেকে মুক্ত করুন। আমি খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করে আপনার কাছ থেকে কী সার্থ অর্জন করতে পারবো? বাস্তবতা অনুধাবন করতে চেষ্টা করুন। দেখুন, আপনার বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের এমন কোন শাসক নেই, যে চক্রান্তে শরীক হয়নি। শুধু আমি আর কাদের খান ছাড়া আর সবাই আপনার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানও করেছে। আপনার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযানে শরীক না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আমরা সামরিক দিক থেকে দুর্বল ছিলাম। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আপনার বিরুদ্ধে মহাশক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারতাম। কিন্তু আমি ও কাদের খান সবসময় গৃহযুদ্ধের বিপক্ষে ছিলাম এবং আপনার ভারত অভিযান সাফল্য লাভের প্রত্যাশী ছিলাম। আপনার হয়তো জানা নেই, এলিখ খান আমাকে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য শুধু উস্কানিই দেয়নি, তার কথায় সাড়া না দেয়ার অপরাধে আমার বিরুদ্ধে...।"

"আপনার বিরুদ্ধে সেনাভিযানও করেছে।" তোগা খানের মুখের অনুচ্চারিত কথা পূর্ণ করে দিলেন সুলতান। "কুদরতি তুফান ও তুষারপাত তার সেই অভিযান ব্যর্থ করে দেয়। এ ছাড়াও আপনার নিজের ব্যাপারেও কোন কথা জানতে চাইলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন তোগা খান।

"আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে যদি আপনার কাছে খবর থেকে থাকে, তাহলে আমার ইচ্ছা ও বলার মধ্যে আপনার কোন ধরনের সংশয় থাকা উচিত নয়। তারপরও যদি আমার ব্যাপারে আপনার সংশয় দূর না হয়, তাহলে বুঝতে হবে আমার এখানে নিয়োজিত আপনার গোয়েন্দা কোন কাজই করছে না। শুধু শুধুই বেতন-ভাতা নিচ্ছে।" বললেন তোগা খান।

"বলুন, কী বলতে চান আপনি?" তোগা খানের উদ্দেশে বললেন সুলতান।

"বর্তমান খলীফা কাদের বিল্লাহ আব্বাসী ক্ষমতালিপ্সু এবং সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী।" বললেন তোগা খান। "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, খোরাসানের অর্ধেকটা শাসন করছেন খলীফা আর অর্ধেকটা আপনার নিয়ন্ত্রণে।... খলীফা আপনার শাসনাধীন অংশও কব্জা করতে উদগ্রীব। এ লক্ষ্যে তিনি ক্ষমতালিপ্সু এলিখ খানকে ব্যবহার করছেন। খলীফা এলিখ খানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে যদি আপনার বিরুদ্ধে সেনাভিযান চালায়, তাহলে তিনি সৈন্যবল দিয়ে প্রকাশ্য সহযোগিতা না করলেও গোপনে পরিবহন, অস্ত্রশস্ত্র ও আর্থিক সুবিধা দিয়ে সহযোগিতা করবেন। খলীফা যদি মুসলমানদের ঐক্য, সংহতি ও এককেন্দ্রিকতার প্রত্যাশী হতেন তাহলে তো তার উচিত ছিলো, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এলিখ খানের বিরুদ্ধে তিনি সেনাভিযান করতেন। তিনি দৃশ্যত হিন্দুস্তান অভিযানে আপনাকে বাহবা দিচ্ছেন আর পর্দার অন্তরালে চাচ্ছেন আপনি যেনো হিন্দুস্তানে ব্যস্ত থাকেন। আর ওখানে আপনার সামরিক শক্তি ক্ষয় হতে থাকুক, যাতে আপনি সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েন। খলীফা সেই দিনের প্রত্যাশায় প্রহর গুণছেন, যেদিন তিনি খবর পাবেন আপনি হিন্দুস্তানে পরাজিত হয়েছেন, নয়তো সম্মুখসমরে মারা গেছেন। আমীর আবুল মুলক, দারা বিন কাবুস, আবুল কাসেমকে আপনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছেন খলীফা কাদের বিল্লাহ আব্বাসী। এই অঞ্চলে গৃহযুদ্ধের পেছনে খলীফার চক্রান্ত সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।"

তোগা খানের কথা শুনে ক্ষোভে-দুঃখে সুলতানের চোখ লাল হয়ে যায়। তিনি যে খলীফাকে মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পবিত্র আসনে সমাসীন ভাবতেন, আজ তাকেই তার শত্রুতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা শুনে তিনি হতবাক হয়ে পড়েন।

"আপনি এসব কথার প্রমাণ চাইলে আমি আপনাকে প্রমাণ দেখাবো।" বললেন তোগা খান। "সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, আমি আপনার সহযোগী, প্রয়োজনে আমার সৈন্যরা আপনার সহযোগিতা করবে, আমার দূত যাবে আপনার কাছে। আমার সামরিক শক্তি কম হতে পারে, তবে ঈমানের দিক থেকে আমি দুর্বল নই। এলিখ খান যখন আমার বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালাতে এসেছিলো, তখন খোদায়ী তুষারপাত ও ঝড় তাকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটতে বাধ্য করেছিলো। সে একজন ঈমান বিক্রেতা।"

"যে জাতির কেন্দ্রীয় নেতা ঈমান বিক্রেতা হয়ে যায়, সেই জাতি সর্বাংশেই লুটেরা আর ডাকাতদের আখড়ায় পরিণত হয়।" দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন সুলতান।

খ্যাতিমান ঐতিহাসিক কাসিম ফারিশ্‌তা ও আলবিরুনী লিখেছেন, সুলতান মাহমূদকে কখনো এমন বিমর্ষ হতে দেখা যায়নি। তোগা খানের সাথে সাক্ষাতের পর তিনি যখন গজনীতে ফিরে এলেন, তখন তার চেহারা ছিলো বিধ্বস্ত। তিনি কোনো কথাই বলতে পারছিলেন না। অস্থিরতায় তার দু'হাত নিসপিশ করছিলো। উজির তাকে জিজ্ঞেস করলেও তোগা খানের সাথে কী কথা হয়েছিলো, তা বলেননি।

সুলতান মাহমূদ ছিলেন সমকালীন বিখ্যাত বুযুর্গ আবুল হাসান খিরকানীর ভাবশিষ্য। খিরকানী গজনী থেকে প্রায় দু'দিনের দূরত্বে বসবাস করতেন। সুলতান মাহমূদ মাঝে-মধ্যে আধ্যাত্মিক গুরু আবুল হাসান খিরকানীর সান্নিধ্যে যেতেন। গুরুর কাছে গেলে তিনি মানসিক প্রশান্তি অনুভব করতেন। তার মনের বোঝা খিরকানীর সাথে যে কোনো সমস্যা নিয়ে আলাপের দ্বারা হাল্কা হয়ে যেতো।

তোগা খানের সাথে সাক্ষাতের পর বাগদাদের খলীফা সম্পর্কে অনাকাঙ্খিত খবরাখবর শুনে তিনি এতোটাই কষ্ট পেলেন যে, তার চিন্তাশক্তি স্থবির হয়ে গেলো। কারণ, খলীফাকে তিনি বিশ্বের ইসলামী চেতনার কেন্দ্রবিন্দু

মনে করতেন। তিনি ভাবতেন, বাগদাদই ইসলাম ও মুসলমানদের ইজ্জত, মর্যাদা ও উজ্জীবনের প্রাণশক্তি। কিন্তু খলীফা কাদের বিল্লাহ আব্বাসী ছিলো ইসলামী সালতানাতের কলঙ্ক। তিনি মনে মনে কখনো তোগা খানের প্রতি ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন, আবার কখনো খলীফার প্রতি তার ক্ষোভ-ঘৃণা সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছিলো। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিলো যে, তোগা খান তাকে বিভ্রান্ত করতে অসত্য কোনো তথ্য দেয়নি। এ খবর তার চিত্তকে অস্থির করে তুলেছিলো। এমতাবস্থায় বারবার তার আধ্যাত্মিক গুরু আবুল হাসান খিরকানীর কথা মনে পড়ছিলো।

সেই দিনই তিনি আবুল হাসান খিরকানীর সাথে সাক্ষাতের জন্য রওনা হলেন। ভোরে রওনা হয়ে পরদিন সন্ধ্যায় তিনি গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন। গুরুর সকাশে পৌঁছে তাঁর হাতে চুমু দিয়ে সুলতান মাহমূদ বললেন, "আমার বিশ্বাসের পরিপন্থী একটা সংবাদ আমাকে মানসিকভাবে চরম হতাশাগ্রস্ত করে ফেলেছে। দারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছি আমি। আমাকে স্বস্তির কোনো পথ বাতলে দিন গুরু।"

"কী হয়েছে? হিন্দুস্তান থেকে কি পরাজিত হয়ে এসেছো?" জিজ্ঞেস করলেন খিরকানী।

"আপনাদের দুআয় হিন্দুস্তানের মুশরিকদের কাছে আমি কখনো পরাজিত হবো না। বিজয়ী কোনো সুলতান তখনই পরাজিত হয় যখন স্বজাতীয় কোন ভাই তার পিঠে আঘাত হানে।" সুলতান বললেন।

"আমি সেইসব আত্মঘাতী ভাইদের ব্যাপারে মোটেও বেখবর নই সুলতান। কিন্তু ভুলে যেও না আল্লাহ সত্যের পক্ষে আছেন। আল্লাহ তোমাকে মদদ করবেন, তোমার হতাশ হওয়ার কোনোই কারণ নেই।" বললেন খিরকানী।

"আপনি হয়তো জানেন। কিন্তু এ কথাও কি আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে যে, খলীফা আল-কাদের বিল্লাহ আমার বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে প্ররোচনা দিচ্ছে। আমাকে একথা বলেছে এলিখ খানের ভাই তোগা খান।" সুলতান বললেন।

খিরকানী স্মিত হেসে বললেন, "আমি এটাও জানি। খলীফার অসৎ ধারণা সম্পর্কে আমি যখন প্রথম জানতে পারি, তখন তুমি হিন্দুস্তানে। তুমি আজ না আসলে আমিই তোমাকে এ ব্যাপারে অবহিত করতে খবর পাঠাতাম।"

"তাহলে কি আমি তোগা খানের সংবাদকে সত্য বলেই বিশ্বাস করবো? আমি কি এতোদিন আত্মপ্রবঞ্চনায় ছিলাম যে খলীফাতুল মুসলিমীন আল্লাহর রসূলের প্রতিনিধি?" সুলতান বললেন।

"যারা সত্যিকার অর্থে রাসূলের প্রতিনিধি ছিলেন, তারা গত হয়ে গেছেন।" বললেন খিরকানী। "তাদের পর যারা এসেছে এবং ভবিষ্যতে যারা আসবে, তারা প্রবৃত্তির পূজারী খলীফা হবে। বর্তমান খলীফা একটি রাজ্য শাসন করে। সমরকন্দের শাসকও তিনি। তিনি যে কোনো মূল্যে তার মসনদ আঁকড়ে থাকতে তৎপর। রাজত্বই তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। খেলাফতের সকল রীতি পদদলিত করে বর্তমান খলীফা তার প্রত্যক্ষ রাজত্বের পরিধিকে সম্প্রসারিত করতে শক্তিশালী ও দুর্নীতিপরায়ণ শাসকদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলেছেন। তুমি কি জানো না, তোমার পিতার শাসনামলে কারামাতীদের সাথে বর্তমান খলীফা কাদের বিল্লাহ আব্বাসী গোপনে মৈত্রী গড়ে তুলেছিলেন? আর তখন কারামাতীরা অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিলো। এরপর তুমি যখন আপসহীনভাবে নিজের দৃঢ়তা ও সাহসিকতার উপর ভর করে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে হিন্দুদের দু'টি গজনী আক্রমণ প্রতিহত করে ওদের দেশের ভেতরে গিয়ে হিন্দুদের পরাজিত করে হিন্দু অঞ্চল নিজের কব্জায় আনতে শুরু করলে এবং কারামাতীদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে ওদের ভণ্ডামী ও ভ্রষ্টামী নির্মূল করতে সক্ষম হলে, তখনই খলীফা তোমাকে 'আমীমুল মিল্লাত ও য়ামীনুদ্দৌলা' খেতাবে ভূষিত করেন। তোমাকে তার বিশ্বস্ত ও অনুগত করে নেন। হিন্দুস্তানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পৌত্তলিকতা দূর করে সেখানে ইসলামের সত্যের বাণী প্রচার করা আর বিন কাসিমের বিজিত রাজ্যগুলোর নিগৃহীত মুসলমানদেরকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নাগপাশ থেকে মুক্তির ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই। বরং তোমার ক্রমবর্ধমান শক্তিতে সে শংকিত। এ আশংকা থেকেই তিনি প্রকাশ্যে তোমাকে বাহবা দিচ্ছেন আর নেপথ্যে তোমার শত্রুদেরকে উস্কানি দিয়ে তোমার শক্তি খর্ব করতে তৎপর রয়েছেন।"

"একজন কেন্দ্রীয় খলীফার এ ধরনের তৎপরতায় লিপ্ত হওয়া কি সমীচীন?" বললেন সুলতান।

"তুমি তাকে খলীফাতুল মুসলিমীন বলছো? আমি তাকে কখনো মুসলিম বিশ্বের অভিভাবক মনে করি না। শরীয়তের দৃষ্টিতে তার খলীফার মসনদে

আসীন হওয়ার কোনোই যোগ্যতা নেই। খলীফা হওয়ার জন্য তাকওয়া ও ইসলামী আদর্শের অনুসারী হওয়া অপরিহার্য। সেই সাথে মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন তার একান্ত কর্তব্য। তার মধ্যে কোনো ধরনের বৈষয়িক লালসা থাকা মোটেই উচিত নয়। এসব বিচারে সে মোটেও খলীফা হওয়ার উপযুক্ত নয়। যে খলীফা প্রত্যক্ষ রাজ্য শাসন করে, সে দুর্নীতিমুক্ত থাকতে পারে না।" খিরকানী বললেন।

"আমরা কি এমন খলীফাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারি না?" বললেন সুলতান মাহমূদ।

"না। কারণ, খেলাফত এখন পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত সম্পদে পরিণত হয়েছে। খেলাফত এখন ইসলামের প্রতীক হওয়ার পরিবর্তে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত ক্ষমতার মসনদে পরিণত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রধান কারণ খেলাফতের বিকৃতি সাধন। খেলাফত এখন শক্তি, ক্ষমতা ও ব্যক্তি শাসনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এখন যাকেই খলীফা বানানো হোক, সে-ই এমন হবে। ধীরে ধীরে মুসলিম উম্মাহ আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। উম্মাহর ঐক্য, সংহতি, সম্মান ও মর্যাদা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে মুসলিম সালতানাত। ভবিষ্যতে এমন হবে যে, হাতে কুরআন শরীফ নিয়ে খলীফারা নিজেদেরকে ইসলামের সেবক ঘোষণা করবে; কিন্তু ইসলামের শত্রুদেরকে বন্ধু আর বন্ধুদের শত্রু বানাবে। তারা হবে মুসলিম উম্মাহর জন্য জলজ্যান্ত ধোঁকা। তারা নিজেদের চারপাশে তোষামোদকারী ও অনুগত ভৃত্যের জাল তৈরি করবে। মুসলিম উম্মাহ আরবী, আজমী, মিশরী, তুর্কি নানা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে যাবে। ইসলামের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যেই সৃষ্টি হবে সংশয়। শাসন ক্ষমতায় যারাই অধিষ্ঠিত হবে, তারা হবে স্বৈরাচারী।" খিরকানী বললেন।

"এ প্রেক্ষিতে আমার কী করা উচিত?" বললেন সুলতান। "আমি খলীফাকে তোষামোদ করতে পারবো না।"

"খলীফাকে তুমি বুঝিয়ে দাও, তার চক্রান্তের ব্যাপারে তুমি অবগত।" বললেন খিরকানী। "মাহমূদ! মুসলমান যখন ঈমান নিয়ে বাণিজ্য করে, তখন বস্তুনিষ্ঠতার অধিকারী সত্যপন্থী ঈমানদানদের বোকা ও মিথ্যাবাদী মনে করতে থাকে। তুমি হিন্দুস্তানে যেসব লোকের হাতে ঐসব এলাকার শাসনভার ন্যস্ত

করেছো, আমার ভয় হয়, ওরা না আবার প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে যায়। মুসলমানদেরকে দু'টি জিনিস বড় বেশী ঘায়েল করে ফেলে– একটি প্রবৃত্তির খায়েশ আর অপরটি সম্পদ ও ক্ষমতার মোহ। হিন্দুস্তান ধোঁকা ও প্রতারণার উর্বর ভূমি। তোমার নিযুক্ত শাসকরা ঈমান বিক্রেতা হয়ে যায় কিনা এ বিষয়টি আমাকে খুব ভাবায়। ভবিষ্যতে তোমার সমূহ বিপদ ও কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে, তাতে তুমি ঘাবড়ে যেয়ো না।"

"তাহলে কি আমি খলীফাকে বিষয়টি জানিয়ে দেবো?" সুলতান বললেন।

"সত্য কথা বলতে দ্বিধা করা উচিত নয়। আমিও খলীফাকে বিষয়টি জানাতে চেষ্টা করবো।" খিরকানী বললেন।

আধ্যাত্মিক গুরু আবুল হাসান খিরকানীর সান্নিধ্য থেকে গজনী ফিরে সুলতান মাহমূদ বাগদাদের খলীফা কাদের বিল্লাহ আব্বাসীর কাছে এই বলে পয়গাম পাঠালেন যে– "গজনী সালতানাতের অন্তর্ভূক্ত খোরাসানের অধিকাংশ এলাকা আপনি দখল করে রেখেছেন। আপনাকে আমি আমাদের রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত এলাকার একটি মানচিত্র এঁকে দিচ্ছি। যেসব এলাকা আমি চিহ্নিত করে দেবো, সেসব অঞ্চল থেকে আপনি আপনার আমলা ও সেনাদের প্রত্যাহার করে নিবেন। খলীফার কোনো এলাকারই প্রত্যক্ষ শাসক হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমি জানি, আপনি আমার প্রস্তাব মানতে সম্মত হবেন না। এতোদিন আমি খেলাফতের সম্মানে নীরব ছিলাম; কিন্তু আমার আজীবন লালিত ধারণা এখন ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আশা করি, আপনি নির্বিবাদে আমার চিহ্নিত এলাকাগুলো আমাদের ফেরত দেবেন। আশা করি, নিজের মর্যাদা ও সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে আপনি কোনো ধরনের প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে আমার আবেদনে সাড়া দেবেন।"

ঐতিহাসিক ফারিশতা, আলবিরুনী ও গরদিজী প্রমুখ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে খলীফা কাদের বিল্লাহ পুরোপুরি জ্ঞাত ছিলেন। তিনি এটাও জানতেন যে, সুলতান যা ইচ্ছা করেন এবং বলেন, তা বাস্তবে প্রতিফলন না ঘটিয়ে ক্ষান্ত হন না। খলীফা এটাও জানতেন, গজনী অঞ্চলের সকল অধিবাসী সুলতানের অনুগত। তাই সুলতানের পয়গাম পাওয়ার পর কোনো ধরনের টালবাহানা না করে খোরাসান রাজ্যের যে অংশটুকু গজনী সালতানাতের অংশ ছিলো, তা থেকে সেনাবাহিনী ও আমলাদের প্রত্যাহার করে সুলতানের নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর করলেন।

খলীফার এই কাজে সুলতান আরো ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এতো তাড়াতাড়ি খলীফার রণেভঙ্গ দেয়ার অর্থ হলো তার মধ্যে আসলে ধর্মীয় চেতনা অনুপস্থিত। সে ক্ষমতালিপ্সু ও ধুরন্ধর। এরপর সুলতান মাহমূদ এই বলে আবার বাগদাদে দূত পাঠালেন যে, সমরকন্দের উপর আপনার দখলদারিত্ব বৈধ নয়। এই শহরটিও আমার অধীনে হস্তান্তর করুন। সুলতানের সমরকন্দ চাওয়ার পয়গামের জবাবে খলীফা এই বলে তার এক বিশেষ দূতকে সুলতানের কাছে পাঠালেন যে, "খলীফা কোনো অবস্থাতেই সমরকন্দের দখল হস্তান্তর করবেন না। খলীফা এও বলেছেন, আপনি যদি এই দাবী আদায়ে শক্তি প্রয়োগ করেন, তাহলে খলীফা গোটা জাতির সম্মুখে আপনাকে অপমানিত করবেন।"

জবাবে সুলতান মাহমূদ দূতকে বললেন, "তুমি বাগদাদে গিয়ে খলীফাকে জিজ্ঞেস করো, সে কী চায়। আমি এক হাজার জঙ্গী হস্তি নিয়ে বাগদাদ আসবো।" রাগে-ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, "খলীফাকে বলবে, আমাকে যদি বাগদাদ আসতেই হয়, তাহলে আমি বাগদাদের রাজপ্রাসাদের প্রতিটি ইট খুলে ফেলবো আর প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ হাতির পিঠে বোঝাই করে গজনী নিয়ে আসবো।"

এক ইংরেজ ঐতিহাসিক এইচ এইচ হোয়ার্থ অন্যান্য মুসলিম ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃত করে লিখেছেন, সুলতান মাহমূদের এই হুমকিতে খলীফা কাদের বিল্লাহ আব্বাসী রীতিমতো ভড়কে যান। তিনি এমন এক মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন যে, ইচ্ছা করে নিজের পদকে অবলম্বন করে তিনি সুলতান মাহমূদকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিতে পারতেন। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবনাচার এতোই কদর্য ছিলো যে; তিনি নিজ অবস্থানের চেয়ে অত্যন্ত নমনীয়ভাবে সুলতান মাহমূদের ক্ষোভের জবাব দিলেন। যার ফলে সুলতান মাহমূদ সেনাভিযান পরিচালনা করে সমরকন্দকে নিজের শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

এক হাজার বারো খৃস্টাব্দের প্রায় অর্ধেক বছর চলে গেছে। সুলতান মাহমূদ ভারতের বিজিত রাজ্যগুলোর ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিতই ছিলেন। পা ।বের রাজা আনন্দ পাল তখনো জীবিত থাকলেও তার শক্তি-সামর্থ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো। তিনি সুলতান মাহমূদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

গোয়েন্দাদের মাধ্যমে হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজাদের তৎপরতার খবরাখবর তিনি রীতিমতো পাচ্ছিলেন। তার কাছে একদিন খবর এলো, রাজা আনন্দ পাল মারা গেছেন। তার ছেলে তরুণ চন্দ্রপাল এখন পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

থানেশ্বর মন্দিরের সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ বিষ্ণুদেবীর মূর্তি সুলতান মাহমূদ গজনী নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে নিয়ে বিষ্ণুমূর্তিকে খুবই অপমানজনকভাবে ধ্বংস করা হয়েছিলো। হিন্দুদের কাছে বিষ্ণুমূর্তির অমর্যাদা যতোটুকু না ছিলো গ্লানির, তার চেয়ে বেশি ছিলো আতংকের। হিন্দুরা বিষ্ণুমূর্তির অমর্যাদার কারণে দেবদেবীদের অভিশাপে নিপতিত হওয়ার আশংকায় ভীতসন্ত্রস্ত ছিলো। পণ্ডিতরা দেবালয়ে মূর্তির সামনে বসে ভয়ে থর থর করে কাঁপতো। তাদের ধারণা ছিলো, বিষ্ণমূর্তি পৃথিবীতে মানুষের আগমনের সাথে সাথেই সৃষ্টি হয়েছিলো। পৃথিবীর প্রথম মানুষটিও বিষ্ণুমূর্তিকেই পূজা করতো। সেই পুরনো দেবমূর্তির এহেন অমর্যাদায় হিন্দুরা গঙ্গার পানিতে নেমে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো। সাধারণ একটু বাতাস এলে কিংবা আকাশের গর্জন শুনলেই হিন্দুরা দু'হাত জোড় করে বিড় বিড় করে ভগবানের কাছে ক্ষমাভিক্ষা চাইতো।

জয়পালের মৃত্যুর পর আনন্দ পাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বেশ জাকজমক নিয়ে কয়েকটি যুদ্ধে সুলতান মাহমূদকে হুমকি দিয়েছিলো। কিন্তু প্রত্যেকটি যুদ্ধেই সুলতান মাহমূদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় আনন্দ পাল। অবশেষে সে সুলতানের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এরপরও সুলতানকে ফাঁকি দিয়ে জব্দ করার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয় আনন্দ পাল।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, ক্রমাগত পরাজয়ে আনন্দপাল হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলো। বিশেষ করে সুলতান মাহমূদ থানেশ্বর মন্দির কব্জা করে নেয়ার পর এর শোক সইতে না পেরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে রাজা আনন্দ পাল। অবশেষে তার মৃত্যুর পর পুত্র তরুণ চন্দ্রপাল ক্ষমতাসীন হয়।

রাজা আনন্দ পালের মৃত্যুর খবর শুনে হিন্দুস্তানের ছোট-বড় সকল রাজা-মহারাজা ও রায়গণ এসে লাহোরে জমায়েত হয় আনন্দ পালের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে। আনন্দ পালের মরদেহ যখন চিতায় জ্বলছিলো, তখন কনৌজের রাজা সমবেত হিন্দু শাসকদের উদ্দেশে উচ্চ আওয়াজে বললো,

"আজ আমরা এমন এক মহান পুরুষের চিতার পাশে দাঁড়িয়েছি, যিনি সারাজীবন মন্দিরের হেফাযতের জন্য মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে কাটিয়েছেন। হিন্দুস্তানের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র শাসক, যিনি নিজের সীমানা পেরিয়ে গিয়ে সুলতান মাহমূদকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। আমাদের গাদ্দারী ও কাপুরুষতার কারণে আজ হিন্দুস্তানের ঐতিহাসিক মন্দিরগুলো থেকে মুসলমানদের আযান ধ্বনিত হচ্ছে। আসুন, বীরপুরুষ রাজা আনন্দ পালের জ্বলন্ত চিতার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা শপথ নিই, আমরা সবাই মিলে মন্দিরের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবো এবং হৃত মন্দিরগুলো ফিরিয়ে এনে মসজিদগুলোকে মন্দিরে পরিণত করবো।"

"আমি এই অঙ্গীকার করছি বিষ্ণুদেবীর প্রতিশোধ নিতে। আমি গজনীর প্রতিটি ইট খুলে ফেলবো।" বললো কনৌজের রাজা।

সমবেত প্রত্যেক রাজা-মহারাজা, ঋষি ও পুরোহিত আনন্দ পালের জ্বলন্ত চিতার তপ্ত আগুনের তাপে উত্তপ্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলো, তারা ভারতে ইসলামের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি লাশের বাঁধ দিয়ে হলেও রোধ করবে। প্রত্যেকেই শপথ করলো, তারা মুসলমানদের মসজিদগুলোকে মন্দির, মুসলমানদেরকে হিন্দু এবং গজনীকে মহাভারতের রাজধানীতে রূপান্তরিত করবে। আনন্দ পালের উত্তরাধিকারী তরুণ চন্দ্রপাল সমবেত রাজাদের সারিতে দাঁড়িয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিলো।

"রাজকুমার তরুণ চন্দ্রপালেরও এ সমাবেশে কিছু বলা উচিত। তিনিই তো এখন ক্ষমতাসীন রাজা।" বললো এক পুরোহিত। "শোক-তাপ এখন ভুলে যাওয়া উচিত। রাজপুতরা অশ্রু নয়, বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শোককে শক্তিতে পরিণত করে।"

যুবক তরুণ চন্দ্রপাল সারি ঠেলে আরো সামনে এগিয়ে এলো। বাবার জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে সমবেত রাজা-মহারাজাদের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, "আপনারা সবাই তো কঠিন সব অঙ্গীকারবাণী উচ্চারণ করলেন। কিন্তু বলুন তো, আপনাদের মধ্যে এমন ক'জন আছেন, যিনি কৃত অঙ্গীকার পূরণ করবেন? ইসলামের স্রোতের সামনে লাশের বাঁধ এতোদিন পর্যন্ত কেন আপনারা দিতে পারেননি। মুসলমানরা যখন থানেশ্বরের দিকে যাত্রা করেছিলো, তখন আপনাদের এই শক্তি ও দাপট কোথায় ছিলো? এখানকার

মসজিদগুলোকে মন্দির এবং মুসলমানদেরকে হিন্দু বানানো খুব কঠিন কাজ নয়, রাজপুতরা রক্তের সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়াকে ভয় করে না। আপনারা আমার বাবার খুব প্রশংসা করেছেন; কিন্তু বাবা তার এলাকায় প্রত্যেকটি যুদ্ধ মোকাবেলা করেছেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের কাছে এ জন্য কিছু সৈন্য দিয়েছিলেন, যাতে আমরা মুসলমানদেরকে পেশোয়ারে ঠেকিয়ে রাখি। আপনারা কথায় যেমন সাহসিকতা দেখান, কাজে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আপনারা চান, সুলতান মাহমূদের অগ্রযাত্রা আমরা এখানেই বাধাগ্রস্ত করে রাখি আর আপনারা নির্বিবাদে রাজত্ব করবেন।"

"মহারাজ! আপনি আসলে কী বলতে চাচ্ছেন?" তরুণ চন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলো এক রাজা।

"আমি পরিষ্কার বলে দিতে চাই, আমার রাজ্যকে নিরাপদ রাখার জন্য আমি মুসলমানদেরকে বন্ধু হিসেবে বরণ করে নেবো। সুলতান মাহমূদ আমার রাজ্যে আক্রমণ করলে আমি মোকাবেলা করবো। কিন্তু এখানকার নিরপরাধ মুসলমানদের উপর আমি হাত উঠাবো না।" বললো তরুণ চন্দ্রপাল।

"তাহলে আপনি কি মাহমূদের মিত্র ও আনুগত্য মেনে নিচ্ছেন?" প্রশ্ন করলো কনৌজের রাজা।

"হ্যাঁ, আমি মাহমূদকে কর দেবো এবং তার আনুগত্য মেনে চলতেই চেষ্টা করবো।"

"আপনি কি জানেন না, এখানকার মুসলমানরা হিন্দুস্তানে বসবাস করলেও গজনী সুলতানেরই আনুগত্য করে?" বললো অপর এক রাজা।

"আপনার কি একথা জানা নেই যে, গজনীতেই বহু হিন্দু বসবাস করে, আর গজনী বাহিনীতে পৃথক একটি হিন্দু ইউনিট পর্যন্ত রয়েছে? কিন্তু তাদের থেকে কি কেউ বিদ্রোহ করে সেখান থেকে এখানে এসেছে? ওদের কব্জায় আছে সেনাবাহিনীর চৌকস ঘোড়া, জঙ্গী হাতি, আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র। তারা সেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারছে। তাদের কেউ এ পর্যন্ত কেনো হিন্দুস্তানে পালিয়ে এলো না? এখানকার সব মুসলমান আমাদের শত্রু নয়। অনেকেই আমাদের খুবই বিশ্বস্ত।" বললো তরুণ চন্দ্রপাল।

হঠাৎ মহিলাদের ভিড় ঠেলে এক সুন্দরী তরুণী রাজা-মহারাজাদের সারিতে দাঁড়ানো তরুণচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ালো। সে তরুণচন্দ্রের হাত

থেকে তরবারী কেড়ে নিয়ে উঁচিয়ে ধরে বললো, "আপনারা সবাই জানেন, আমি এই ব্যক্তির স্ত্রী। তাকে বলুন, সে আমাকে বাবার জ্বলন্ত চিতায় ফেলে কিংবা এই তরবারী দিয়ে হত্যা করুক। আমি পরিষ্কার ঘোষণা করছি, আমি রাজপুতের কন্যা। আমার বাবা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি আমার ধর্ম অবমাননার প্রতিশোধ নেবো, আমার বাবার রক্তের বদলা নেবো। আজ থেকে আমি আমার স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করছি। সে একটা কাপুরুষ। যে ব্যক্তি গজনী সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না।"

তরুণচন্দ্র তরুণীর প্রতি ধেয়ে এলো। কিন্তু ততোক্ষণে তাদের দু'জনের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে গেলো আরেক যুবক এবং দ্রুত সে তরুণীর হাতের তরবারী কেড়ে নিলো। এই তরুণ ভীমপাল। আনন্দ পালের দ্বিতীয় পুত্র এবং তরুণচন্দ্রের ছোট ভাই। ঐতিহাসিকরা তাকে ভীমপাল বাহাদুর নামে উল্লেখ করেছেন। ভীমপাল ছিলো খুবই ডানপিঠে ও দুঃসাহসী। ভীমপাল তরুণপালকে বাধা দিয়ে বললো, "খবরদার তরুণপাল! এখানে এমন কেউ নেই, যে তোমার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। এই মহিলার গায়ে তুমি হাত তুললে তুমি যে আমার ভাই এবং ওর স্বামী আমি সেকথা ভুলে যাবো। এখন থেকে আমিই হবো আমার বাবার সিংহাসনের অধিকারী। বাবার সিংহাসনের সে-ই স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, যে তার অপমানের প্রতিশোধ নিতে সক্ষম।"

ভীমচন্দ্র সমবেত লোকদের দিকে তাকিয়ে তরবারী উঁচিয়ে বললো, "আমি যদি গজনী সুলতানের বশ্যতা অস্বীকার করি এবং বিষ্ণুদেবীর অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার অঙ্গীকার করি, তাহলে কি আপনারা আমাকে বাবার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নেবেন?"

"হ্যাঁ, তুমিই মহারাজা জয়পাল ও মহারাজা আনন্দ পালের যোগ্য উত্তরসূরী।" ঘোষণা করলো প্রধান পুরোহিত।

এরপরই সমাবেশ থেকে আওয়াজ উঠলো, "তরুণচন্দ্র পালকে বসিয়ে দাও, তরুণচন্দ্রের কাছ থেকে তরবারী ছিনিয়ে নাও। ভীমপাল মহারাজের জয় হোক।"

দেখতে দেখতে ভীমপালের জয়ধ্বনি উচ্চকিত হলো। এর সাথে পাল্লা দিয়ে উঁচু হয়ে উঠলো আনন্দ পালের চিতার আগুন। চিতার লেলিহান অগ্নি

শিখার সাঁই সাঁই শব্দ আর ভীমপালের জয়ধ্বনিতে তলিয়ে গেলো তরুণচন্দ্রের বাস্তববাদিতার অস্তিত্ব। কিছুক্ষণের মধ্যে আনন্দ পালের দূরদর্শী বড় ছেলে ব্রাহ্মণ্যবাদী উগ্রতার কাছে পরাজিত হয়ে সাধারণ রাজকুমারে পরিণত হলো। তার জায়গায় আনন্দ পালের উগ্র ও অদূরদর্শী দ্বিতীয় পুত্র ভীমপাল রাজা-মহারাজা ও পুরোহিতদের সমর্থনে সিংহাসনে স্থলাভিষিক্ত হলো। পাঞ্জাবের মহারাজায় অভিষিক্ত হলো ভীমপাল।

* * *

দিন শেষে সেই রাতেই আনন্দ পালের রেখে যাওয়া রাজপ্রাসাদে হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজা ও পুরোহিতদের কনফারেন্স বসে। সমাবেশের সভাপতির আসন অলংকৃত করলো আনন্দ পালের দ্বিতীয় পুত্র ভীমপাল। মসনদ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রাসাদ থেকে গায়েব হয়ে গেলো তরুণচন্দ্র পাল। শুরু হলো ভীমপালের নেতৃত্বে মুসলিম উৎখাতের চিন্তা-ভাবনা।

সবচেয়ে প্রবীণ পুরোহিত প্রস্তাব করলো, "হিন্দুস্তানের সবগুলো মসজিদ গুড়িয়ে দিতে হবে এবং এখানকার মুসলমানদের বাধ্য করা হবে– হয় তারা গজনী চলে যাবে, নয়তো সনাতন ধর্ম গ্রহণ করবে।"

"এ ব্যাপারে আমি দাদা তরুণচন্দ্রের কথা সমর্থন করি। নিরপরাধ মুসলমানদের উপর আমরা কেনো হাত তুলতে যাবো?" বললো ভীমপাল। "আমরা শত্রুর সংখ্যা বাড়াতে চাই না, বন্ধুর সংখ্যা বাড়াতে চাই। এখানকার সবগুলো মসজিদ ধ্বংস করে দিলেও মুসলমানদের কিছু যায়-আসে না। মুসলমানরা যেখানেই নামায পড়তে দাঁড়ায়, সে জায়গায়ই মসজিদে পরিণত হয়। এসব ছায়ার পেছনে আমাদের দৌড়ে কোনো লাভ হবে না। সুলতান মাহমূদের মতো মহাশক্তির বিরুদ্ধে হবে আমাদের লড়াই। আমি হিন্দুস্তানের ইতিহাসে আমার নামের সাথে এ কাহিনী রেখে যেতে চাই না, ভীমপাল গজনীর সুলতানের কাছে পরাজিত হয়ে নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছে।"

"আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো মুসলমানরা শুধু আমাদের মন্দিরগুলো ধ্বংস করে দেয়নি; মন্দির দখল হয়ে যাওয়ার কারণে বিপুল হিন্দু ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে।" বললো এক বিচক্ষণ পুরোহিত।

"লোকজন দেবদেবীর অভিশাপ ভয় পাচ্ছে; কিন্তু এখনো দেবদেবীদের কোন অভিশাপে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়নি। দেবতাদের অভিশাপ বর্ষণের আগেই আমাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাণ্ডব হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে, মুসলমানরা যেগুলোকে ভূত বলে সেগুলোই আমাদের দেবতা। দেবতাদের অসম্মানকারী কোনো মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নেই।"

"যেসব দুর্গ মুসলমানদের দখলে রয়েছে, সেগুলো অবরোধ করা হোক।" প্রস্তাব করলো এক রাজা। কিন্তু সাথে সাথেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলো কয়েকজন। তারা বললো, "মুসলিম দখলকৃত কোনো দুর্গ অবরুদ্ধ হওয়ার খবর পেলে পূর্ণ শক্তি নিয়ে চলে আসবে মাহমূদ। যে কোনো সামরিক পদক্ষেপের আগে আমাদের প্রস্তুতি নেয়া দরকার। আর প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন সময়। সময় নিয়ে পূর্ণ প্রস্তুতির পর আমরা ইচ্ছা করলে মাহমূদকে হিন্দুস্তানের কোনো সুবিধামতো এলাকায় টেনে নিয়ে ফাঁদে ফেলা সম্ভব হবে।"

"এ সময়ের মধ্যে রেরা, মুলতান ও থানেশ্বরে যেসব মুসলিম কর্মকর্তা রয়েছে তাদেরকে আমাদের হাত করে নেয়ার চেষ্টা করা দরকার, যাতে তারা মাহমূদের সহযোগিতা না করে।" প্রস্তাব করলো ভীমপালের উজির। ভীমপালের উজির ছিলো অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। সে আরো বললো, "মুসলমান কর্মকর্তাদের বাগে আনার কৌশল আমাদের জানা আছে। সে কৌশল প্রয়োগ করে আমরা এদের অকার্যকর করে দিতে পারি।"

"মুসলমান কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি খুবই সতর্ক ও নিষ্ঠাবান।" বললো ভীমপাল। "তবুও আমার মনে হয়, আপনার কোনো কৌশল এসব সেনাপতি ও কর্তাব্যক্তিদের বাগে আনতে সফল হবে।"

উজির স্মিত হেসে বললো, "মুসলমানরাও মানুষ। সাধারণ মানুষরা অবতার ও পয়গাম্বরের গুণবিশিষ্ট হয় না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা দুর্বলতা এবং একটা চাহিদা থাকে। যারা এই দুর্বলতা ও চাহিদাকে দমিয়ে রাখতে পারে, তারাই হয় মুনি-ঋষি কিংবা পীর-বুযুর্গ। আমরা মানুষের মধ্যে থাকা সহজাত দুর্বলতা ও চাহিদাকে উস্কে দিয়ে তাদেরকে সেই উচ্চাসন থেকে নিচে নামিয়ে দিতে পারি। তাদের মধ্যে ভোগবাদের স্বপ্ন জাগিয়ে দিতে পারলে তারা কর্তব্যপরায়ণতা ভুলে যাবে।... আমরা থানেশ্বর থেকেই এ কাজ শুরু করতে পারি।"

রাজা-মহারাজাদের কনফারেন্সে আরো সিদ্ধান্ত হলো, এখন থেকে ভারতের সকল রাজা-মহারাজা সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের পূর্ণ প্রস্তুতি শুরু করবে। সেই সাথে মুসলমান সেনাধ্যক্ষ ও কর্মকর্তাদের পক্ষে নিয়ে আসার পূর্ণ চেষ্টাও অব্যাহত থাকবে। এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর আনন্দ পালের দ্বিতীয় পুত্রকে সুলতান মাহমূদের কাছে এই বলে বার্তা পাঠানোর কথা বলা হলো যে, তিনি আর সুলতান মাহমূদের করদাতা নন। রাজা আনন্দপাল যে মৈত্রী চুক্তি করেছিলেন, তা প্রত্যাখ্যান করা হলো।

হিন্দুস্তান থেকে ফেরার সময় সুলতান মাহমূদ তার অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল তাঈ, আলতানতুশ এবং আরসালান জায়েবকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, সেখানকার সমস্যা ছিলো খুবই কঠিন। হিন্দুস্তানের অভিযানে অনেক অভিজ্ঞ জেনারেল ছিলেন। কিন্তু তারা উল্লেখিত তিন জেনারেলের মতো দূরদর্শী ছিলেন না। সুলতান সেসব সেনাধ্যক্ষকেই বিজিত এলাকার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োগ করেছিলেন।

থানেশ্বর রাজ্যের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন বাহরাম গৌঢ় আর শহরের গভর্নর প্রশাসক ছিলেন কুতুব গোজাক। কুতুব গোজাক এ-ই প্রথম হিন্দুস্তানে এসেছিলেন। এখানকার প্রতিটি জিনিসই তার মনে বিস্ময় সৃষ্টি করতো। তিনি যখন দেখলেন, দু'টি মেয়েকে দু'টি আসনে বসিয়ে সেই আসনগুলোকে মানুষশূন্য করে ফেলা হলো এবং কিছুক্ষণ পর সেই জায়গায় আবার সেই তরুণীদেরকেই গায়েব থেকে হাজির করা হলো, তাতে তিনি খুবই বিস্মিত হলেন। গজনীর নারীরাও রূপ-সৌন্দর্যে কম ছিলো না কিন্তু তার কাছে হিন্দুস্তানের নারীদের রূপ-লাবণ্য দারুণ আকর্ষণীয় মনে হলো। তাকে জানানো হলো, হিন্দুস্তান আসলেই কারামত ও জাদুর দেশ। এখানে নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল কোন্‌টা সত্যিকার কারামত আর কোন্‌টা জাদু। কুতুব গোজাকের কাছে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যজনক লাগলো, এখানকার লোকজন সাপপূজা করে এবং নারীরা তাদের দুধ সাপকেও পান করায়।

একদিন সাত-আটজনের একটি মুসাফির সন্ন্যাসীদল চার-পাঁচজন তরুণী নিয়ে থানেশ্বর মন্দিরে পূজা দিতে এলো। সন্নাসীদের সবার গলা থেকে পায়ের

টাখনু পর্যন্ত সাদা কাপড়ে আবৃত। তরুণীরাও সাদা কাপড়ে আবৃতা। কিন্তু খুব হাল্কা ওড়না দিয়ে তাদের মাথা ঢাকা। সব কজন তরুণীরই চুল হাল্কা বাদামী, চোখ নীলাভ, গায়ের রঙ শ্যামল-রাঙা মিশেল। সবার গড়ন ও চালচলন এক ধরনের। পুরুষদের সবারই দাড়ি আছে, তবে মাত্র একজনের দাড়ি সাদা।

সন্ধ্যার পর এই অভিযাত্রীদল যখন থানেশ্বর দুর্গে প্রবেশ করছিলো, তখন তাদের সবাইকে দেখে অতি ধর্মপরায়ণ সাধু-সন্ন্যাসী ও সংসার বৈরাগীই মনে হচ্ছিলো। তারা দুর্গের ফটকে এসে দুর্গপতির সাথে সাক্ষাতের আবেদন করলো। তারা আবেদনে জানালো, তাদের সাথে কয়েকজন তরুণী আছে। এ জন্য তারা সরাইখানায় থাকতে ভয় পাচ্ছে। তারা দুর্গপতির সাথে সাক্ষাত করে একটা নিরাপদ জায়গায় রাতযাপনের অনুমতি চায়। তাদের আবেদন মানবিক বিবেচনা করে দুর্গপতির সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হলো। মুসাফিরদল দুর্গপতির কাছে যেতে দেখে সেনাধ্যক্ষ বাহরাম ও তার ডেপুটিও তাদের দেখার জন্য দুর্গপতির দফতরের দিকে রওনা হলেন।

এ লোকগুলোর পোশাক-পরিচ্ছদ তেমন আশ্চর্যকর ছিলো না। আশ্চর্যের বিষয় ছিলো, এই দলের পুরুষরা যেমন ছিলো সুন্দর, তার চেয়েও বেশি সুন্দর ছিলো তরুণীরা। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিলো পুরুষদের মধ্যে সাদা দাড়িওয়ালা লোকটির গলায় একটি সাপ পেঁচানো ছিলো। সাপটি ফণা তুলে কখনো লোকটির মাথার উপর, কখনো চেহারায় উঁকি-ঝুঁকি মারছিলো। পুরুষদের সবার কাছেই ছিলো একটি করে সুন্দর লাঠি। প্রত্যেক লাঠির মাথায় ছিলো একটি করে ফণাদার সাপের মূর্তি। তরুণীদের গলায় সুন্দর কারুকার্যময় সুতার তৈরি দড়ি পেঁচানো ছিলো। সেসব দড়িতে ছোট ছোট ঘুঙুর বাঁধা ছিলো। তরুণীদের হাঁটার তালে তালে ছোট ঘুঙুরগুলো এক ধরনের বাজনা সৃষ্টি করছিলা, যেনো কোনো ঝরনার পানি পাথরে আঘাত খেয়ে খেয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে।

দুর্গশাসক কুতুব গোজাক অভিযাত্রীদলকে সসম্মানে বসালেন। কারণ, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তার কাছে সম্মানি শ্রেণীর লোক মনে হচ্ছিলো।

"আমরা আপনার কাছে আসবার সাহস করতাম না; কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি, আপনি একটি ভ্রান্ত ধর্মের বিরোধী। বাতিল নির্মূলে আপনাদের

প্রয়াসের জন্য আমরা আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই অনেক বড় মাপের ও অভিজাত বংশের লোক।" বললো সাদা দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসী।

"আপনাদের ধর্ম কী?" সেনাধ্যক্ষ বাহরাম জিজ্ঞেস করলেন।

"আমরা সাপের পূজারী।" বললো সাদা দাড়িওয়ালা। "অবশ্য সাপের পূজা করলেও আমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করি। আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন সেই সব লোক, যারা বাদশাহ সিকান্দরের সাথে মহাভারতে এসেছিলেন। তাদের সম্পর্কে এই জনশ্রুতি আছে যে, তারা একটি বিশাল নাগকে খোঁজ করতেন, যে নাগের দেখা তারা ভারতের বাইরে কোথাও পাননি। কিন্তু হিন্দুস্তানে এসে তারা কাঙ্ক্ষিত নাগের দেখা পান। ফলে তারা সেকান্দরের সেনাবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং শীর্ষ নাগের পেছনে দৌড়াতে থাকেন। বলা হয়ে থাকে, প্রভু তাদেরকে মুকুটধারী সেই নাগ দিয়েছিলেন। সেই নাগের রঙ ছিলো লাল-সোনালী। তার মাথায় ছিলো টুপির মতো ফুল এবং একটি কালো নাগের উপরে সেই নাগটি আরোহণ করেছিলো।... মুকুটধারী নাগ দৌড়ে পালাতে থাকলে আমাদের পূর্বপুরুষদের কয়েকজন নাগের পিছু ছুটতে থাকলো। এক পর্যায়ে নাগ এমন দুর্গম এলাকায় চলে গেলো, যেখানে কোনো মানুষের পক্ষে পৌঁছা সম্ভব ছিলো না। গঙ্গা নদীর একটি শাখা নদী প্রবাহিত হচ্ছিলো এই এলাকা দিয়ে। নদীর উপরে একটি প্রাকৃতিক পুল ছিলো। বস্তুত সেটি ছিলো নদী প্রস্তের সমান বড় একটি পাথর। কিন্তু পাথরটি ছিলো খুব সরু এবং ধারালো। সেই পাথরের নিচ দিয়ে প্রবাহিত পাহাড়ি নদীটি ছিলো খুবই স্রোতস্বিনী এবং গভীর। নাগ সেই পুলের উপর দিয়ে চলে গেলো। চার অনুসরণকারীও তার পিছু নিলো। তন্মধ্যে দু'জন পা পিচলে পড়ে গেলে তারা খরস্রোতা নদীর স্রোতে ভেসে গেলো আর দু'জন তীরে পৌঁছতে সক্ষম হলো। নদীর এপারটি ছিলো নাগদের বসতি। খুবই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর এলাকা। আমাদের দুই পূর্বপুরুষ সেখানেই পরবর্তীতে বসতি স্থাপন করেন। সেখান থেকেই এসেছি আমরা। সাপদের সাথেই আমাদের বসবাস। সাপই আমাদের ধ্যান-জ্ঞান।"

"সাপকে কি আপনারা উপাস্য মনে করেন?" জিজ্ঞেস করলেন প্রশাসক।

"না, আমরা প্রভুকেই প্রভু মানি। কিন্তু সাপকে আমরা এ জন্য পূজা করি যে, এই সাপ আমাদের ও প্রভুর মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে। সাপ যেমন শয়তানি করতে পারে, তদ্রূপ ফেরেশতার কাজও করতে পারে। লোহা ও

পাথরকে সাপ স্বর্ণে পরিণত করতে পারে। কোনো সাপের যদি একশ' বছর বয়স হয়ে যায় তাহলে তার শরীরে এমন একটি টুকরো তৈরি হয়, যা হীরার মতো চমকাতে থাকে। কেউ সেটিকে বলে মনসা, কেউ বলে মণি। সাপ সেটিকে সবসময় মুখের ভেতর রাখে। অনেক সময় নাগ সাপ সেই মনসা কিংবা মণিকে নিয়ে খেলা করে, বাতাসে উড়িয়ে দেয় আবার ঝাঁপ দিয়ে ধরে ফেলে। সেই মণিকে যদি আপনি লোহার টুকরোয় স্পর্শ করেন, তাহলে লোহাও সোনা হয়ে যাবে। সেটি যদি আপনার তরবারীতে স্পর্শ করা যায়, তাহলে তরবারীও সোনায় পরিণত হবে। কিন্তু কোনো মানুষ আজো সেই সর্পমণি অর্জন করতে পারেনি। মণি মুখে নিয়ে সাপ রাতে ঘুমোতে পারে না। সাপ মণিটি মুখ থেকে বের করে মাটিতে রেখে ঢেকে দিয়ে তারপর ঘুমোয়। শত বছরে এ ধরনের মণিওয়ালা সাপ দু'একটি জন্মে। কিন্তু শোনা গেলেও এ পর্যন্ত কেউ মণিওয়ালা সাপের দেখা পায়নি। সেই সাথে সাপের মণিও কেউ অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। হিন্দুস্তানে একথা প্রচলিত আছে যে, যে সেই সাপের মণি অর্জন করতে পারবে, সে সারা হিন্দুস্তানের রাজত্ব লাভ করবে। শীর্ষ নাগও তার আনুগত্য স্বীকার করবে। তখন তার রাজমহল, তার রাজদুর্গ সব সাপে পাহারা দেবে। তখন সে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শাসক হিসেবে অভিহিত হবে।"

"আপনি কিংবা আপনার পূর্বপুরুষদের কেউ কি সেই নাগের সর্পমণি দেখেছেন?" জিজ্ঞেস করলো সেনাধ্যক্ষ বাহরাম।

"না, দেখিনি। আমাদের এলাকায় মণিওয়ালা সাপ আছে; সে কিন্তু যেখানে থাকে সেখানে আমাদের কারো যাওয়ার অনুমতি নেই। কেউ সেখানে যাওয়ার দুঃসাহস করে না। সাপ কোথায় থাকে, সেই জায়গাটি আমরা চিনি; কিন্তু সেখানে যাওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আমাদেরকে বলা হয়েছে, ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে স্বর্ণ পড়ে রয়েছে। হীরা, মোতি, পান্নার স্তূপ সেখানে। আমাদের পুরোহিত বলেছেন, ওখানকার মেয়েদেরকে দেখে কেউ বিশ্বাসই করবে না এরা মর্তের কোনো মানুষ। সেইসব সুন্দরী রমণীদের কথা জগতের অনেকেই জানে; কিন্তু তারা বিশ্বাস করে ওখানকার রমণীরা নাগিনী, মানুষ নয়। আসলে সে কথা ঠিক নয়। আসলে এরা আমাদেরই বংশজাত। কিন্তু এরা অত্যধিক সুন্দরী হলেও খুবই দুর্ভাগা। জীবনের একটা সময় পর্যন্ত তারা খুবই উচ্ছল থাকে বটে; কিন্তু এক পর্যায়ে নির্জীব হয়ে যায়। কারণ, তারা জীবনে কখনো পুরুষের সান্নিধ্য পায় না।"

সাদা দাড়িওয়ালা লোকটি এমনই জাদুময় ভঙ্গিতে স্বপ্নপুরী নাগের কথা বলছিলো যে, দুর্গপতি কুতুব গোজাক, সেনাধ্যক্ষ বাহরাম ও তার ডেপুটি রুদ্ধশ্বাসে তা শুনতে লাগলো এবং বিস্ময়ে তাদের গায়ের পশম খাড়া হয়ে গেলো। তাদের সামনেই উপবিষ্ট ছিলো চার তরুণী। তাদের ঠোঁটে ছিলো স্মিত হাসির আভা। গজনীর এই শাসকরা তরুণীদের রূপ-সৌন্দর্য দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। তারা ভেবেই পাচ্ছিলো না, এদের চেয়েও আরো সুন্দরী কোনো মানুষ হতে পারে! তারা মেহমানদের খুবই খাতির-যত্ন করলো এবং তাদের জন্য রাজকীয় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলো।

এক পর্যায়ে সবাই ঘুমোনোর জন্য চলে গেলো। কিন্তু সাদা দাড়িওয়ালাকে দুর্গশাসক কুতুব গোজাক তার কাছে বসিয়ে রাখলো। সে বৃদ্ধ থেকে সেই নাগের রাজ্যের গোপন রহস্য জানতে চেষ্টা করতে লাগলো। সাদা দাড়িওয়ালা কুতুব গোজাককে বললো, "সারা হিন্দুস্তানের রাজত্বের ভেদ লুকিয়ে রয়েছে নাগের দেশে। যেখানে অপরিচিত কারো পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় এবং কেউ যাওয়ার দুঃসাহসও দেখাতে পারে না।"

"আচ্ছা, কারো পক্ষে কি সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়?" খুব মনোযোগ দিয়ে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো কুতুব। "আমার ধন-দৌলতের কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমি শুনেছি, হিন্দুস্তানের পাহাড়ী অঞ্চলে এমন গাছ-গাছড়া রয়েছে, যা সেবন করলে...।"

"হ্যাঁ, যা বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করে...।" কুতুব গোজাকের অসমাপ্ত কথা বলে দিলো সন্ন্যাসীরূপী সাদা দাড়িওয়ালা। "আমাকে দেখুন, আমার দাড়ি সাদা হয়ে গেছে, বয়সও একশ' পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আমার শরীরে হাত দিয়ে দেখুন, এখনো কেমন শক্তি-সামর্থ রয়েছে। আপনি ঠিকই শুনেছেন। আমাদের এলাকায় এমন গাছ-গাছড়া রয়েছে, যেগুলোতে সাপের বিষ মিশ্রিত রয়েছে, যেগুলো বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করে। সেইসব গাছ আমরা চিনি। সেগুলোতে এমন সব গুণ রয়েছে, যে শুধু বার্ধক্যকেই রোধ করে না, জীবনকেও দীর্ঘস্থায়ী করে।"

কুতুব গোজাক ভাবছিলো, এ লোকের কাছ থেকে সে একাই রহস্য উদঘাটন করছে। কিন্তু এদিকে যুবক সামর্থবান সেনাধ্যক্ষ বাহরাম সেই দলের একজন পুরুষ ও একজন তরুণীকে তার কক্ষে নিয়ে জানতে চাচ্ছিলো, তারা

কি তাদের সেই বিস্ময়কর এলাকায় তাকে নিয়ে যেতে পারে? কিন্তু দলের পুরুষ লোকটি তাকে বলছিলো, তারা তাদের দলের সাথে এবং এলাকার গোপন রহস্য ফাঁস করে দেয়ার মতো গাদ্দারী করতে পারে না। পুরুষ লোকটি কথা বলতে বলতে একটা অজুহাত খাড়া করে সেনাধ্যক্ষের কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। তরুণী একাকী সেনাপতির কক্ষে রয়ে গেলো। তরুণী মনোহরী ভঙ্গিতে হাসছিলো। সেনাপতি তার সাথেও আলাপ জুড়ে দিলো। তরুণী সেনাপতিকে বললো, "জীবনে আপনার মতো এমন সুদর্শন সুপুরুষ আমি কখনো দেখিনি।"

"তুমি তো বেহেশতে থাকো।" তরুণীকে বললো সেনাপতি বাহরাম।

"সেটি জান্নাত নয়, জাহান্নাম। সেখানে নারীর আবেগের কোনো মূল্য নেই। যৌবনকে যেখানে গলা টিপে হত্যা করতে হয়, তা জাহান্নাম বৈ আর কি। আমাদের জীবন তো ওইসব সন্ন্যাসীদের সাথেই কাটাতে হয়, যাদের কোনো প্রাণ-মন বলতে কিছু নেই। আমাদের তো নারীত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।" তরুণী বললো।

তাদের কথাবার্তা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে শেষ হলো, যেখানে দু'টি ভিন্ন সত্তা থাকলেও মনোদৈহিক দিক থেকে একাত্ম হয়ে যায়। তরুণী যখন সেনাপতির প্রতি আবেগপূর্ণ প্রেম-ভালোবাসা প্রদর্শন করলো, তখন সেনাপতি বাহরাম তাকে বললো, "আচ্ছা বলো তো, সাপের মণির কাহিনী কতটুকু সত্য?" তরুণী তাকে বললো, "আমার পক্ষে আপনাকে সঙ্গ দিয়ে ওখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু আমি আপনাকে পথের অবস্থা বলে দিতে পারি।" বস্তুত তরুণী সেনাপতিকে পথের দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলো আর সেনাপতি বাহরাম খান একটি কাগজে সাপের দেশের নকশা এঁকে নিচ্ছিলো।

"আপনার কাছে বিপুল পরিমাণ তীর থাকতে হবে। কারণ, এই পথে সাপের খুব উৎপাত। বিপদ দেখলেই যাতে তীর দিয়ে আপনি সাপ মেরে ফেলতে পারেন। আমি আপনাকে যে সুড়ং পথের কথা বলছি, সেটির উপরে একটি বিশাল অজগর কুণ্ডলী পাঁকিয়ে বসে থাকে। সেটির মাথায় তীর লাগলেই মরে যাবে। কিন্তু শরীরে তীর লাগলে আপনার পক্ষে প্রাণ নিয়ে বেঁচে আসা মুশকিল হবে। সুড়ং পথটি খুবই দীর্ঘ। আপনি সেটি অতিক্রম করলে একটি সুন্দর ঝর্না দেখতে পাবেন। সেই ঝর্নার তীরেই আপনি ওই সাপের

দেখা পাবেন। সেখানে সর্পরাজ মণি নিয়ে খেলা করতে থাকে। সেটি আপনি তীর দিয়ে মেরে ফেললেই মণি আপনার হাতের মুঠোয় এসে যাবে।”

“তখন তোমাকে আমি কোথায় পাবো?”

“আমাকে পেয়ে যাবেন।” চোখে চোখ রেখে ভুবনমোহিনী হাসি দিয়ে বললো তরুণী।

পরদিন প্রত্যুষেই নাগেশ্বরের কাহিনী রচনাকারী সন্ন্যাসীদল থানেশ্বর দুর্গ থেকে চলে গেলো। তারা রেখে গেলো নাগরাজ্যের বিস্ময়কর আখ্যান।

সকালে কুতুব গোজাক তার একান্ত নিরাপত্তারক্ষীদের থেকে দু'জনকে ডেকে পাঠালেন। এই দু'জন ছিলো তার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং দুঃসাহসী বীরযোদ্ধা। তাদের ডেকে তিনি বললেন, “শোনো! শাসক হিসেবে আমি তোমাদের ডেকে পাঠাইনি, একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে তোমাদের ডেকেছি আমি। তোমরা যদি আমাকে একটি কাজ করে দিতে পারো, তাহলে তোমাদেরকে আমি পদোন্নতি দিয়ে গজনী পাঠিয়ে দেবো। আর তোমরা যদি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিতে চাও, তাহলে অবসর দিয়ে দেবো। তবে তোমাদেরকে এখান থেকে বিদায় করার সময় এমন সোনাদানা-কড়ি দিয়ে দেবো যে, তোমাদের সাত পুরুষ সুখে-শান্তিতে আরাম-আয়েশে জীবন কাটাতে পারবে। তবে শর্ত হলো, তোমাদেরকে আমি এমন এক জায়গায় পাঠাচ্ছি, যেখানকার রহস্যের কথা পৃথিবীর কাউকে জানাতে পারবে না। আমি তোমাদেরকে বিশেষ এক পোশাকে একটি বিশেষ জায়গায় পাঠাবো।”

উভয়েই প্রতিশ্রুতি দিলো, তারা তাদের মিশনের খবর কাউকে জানাবে না। কুতুব গোজাক তাদের সামনে একটি চিত্র রেখে তাদের গতিপথ বোঝাতে লাগলো। সৈন্য দু'জন যতোই রাস্তার ভয়াবহতার কথা শুনতে লাগলো, বিস্ময় ও আশ্চর্যে তাদের চেহারা ফ্যাকাশে হতে লাগলো।

“গত রাতে সাদা চাদর পরিহিত সন্ন্যাসীরূপী একদল মুসাফিরকে আমার দফতরে হয়তো আসতে দেখেছো। ওই পথ দিয়ে পাহাড়ী নদী অতিক্রম করলেই সেই দলের সাদা দাড়িওয়ালা লোকটির দেখা পাবে তোমরা। তাকে পেয়ে গেলে তোমাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে। সে তোমাদেরকে একটি গাছের শিকড় এবং প্রচুর সোনাদানা দেবে। সেগুলো নিয়ে তোমরা সোজা আমার কাছে চলে আসবে। গাছের শিকড়টা আমাকে দিয়ে দিবে আর সোনাদানা তোমরা নিয়ে নিবে।”

"সেই গাছের শিকড়টি কেমন?" জানতে চাইলো এক সৈনিক।

"সেটি এমন এক গাছের শিকড়, তা খেতে পারলে তুমি শত বছরেরও বেশি বাঁচতে পারবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত শরীর থাকবে শক্ত-সামর্থ, টগবগে যুবকের মতো।"

সৈনিক দু'জন এ কথা শুনে পরস্পর চোখাচোখি করলো। ভাবখানা এমন যে, সোনাদানার চেয়ে এই শিকড়ের প্রতিই তাদের বেশি আগ্রহ।

"আমার নিজেরই যাওয়ার কথা ছিলো। সেই সন্ন্যাসী আমাকেই যেতে বলেছিলো। কিন্তু তোমরা তো জানো, দুর্গশাসকের পক্ষে এতো দীর্ঘ সময় দুর্গের বাইরে থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমার এই ক্ষমতা আছে, তোমাদের দু'জনকে যতো সময়ের জন্য ইচ্ছা বাইরে পাঠাতে পারি।"

গত রাতে সেনাপতির কক্ষে তরুণী যখন নাগের দেশে যাওয়ার পথের কথা বলছিলো, তখন সাদা দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসীরূপী লোকটি দুর্গশাসককে পথনির্দেশ দিচ্ছিলো এবং তাকে সশরীরে যাওয়ার প্রস্তাব করছিলো। সাদা দাড়িওয়ালা কুতুব গোজাককে এ কথাও বলেছিলো, আপনি আমাকে যে ইজ্জত ও সম্মান করেছেন, এর পরিবর্তে আপনাকেও চির যুবক থাকার ওষুধ ও সোনাদানা উপঢৌকন দেবো।

* * *

সর্পনাগের পূজারীরা চলে যাওয়ার পর সেনাপতি বাহরাম তার ডেপুটিকে বললো, "তুমি যদি না যাও, তবে আমি নিজেই যাবো। আমরা দু'জনের মধ্যে যে কোনো একজন বাইরে থাকলেও এ কথা বলা যাবে যে, বাইরে সেনাচৌকিগুলো দেখার জন্য গেছে। মেয়েটি আমাকে পথ বলে দিয়েছে। তুমি ভাবতে পারো, আমরা যদি সেখানে যেতে পারি, তাহলে আমাদের অবস্থান কোথা থেকে কোথায় চলে যাবে। এ কাজে আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা দরকার। হয় তুমি যাও, নয়তো আমি যাবো। চার-পাঁচজন চৌকস সৈন্য সাথে নিতে হবে।"

"মাননীয় সেনাপতি! আপনি কি দৃঢ় বিশ্বাস করে ফেলেছেন যে, ওই লোকটি যা বলেছে তা সর্বৈব সত্য?" সন্দেহ প্রকাশ করলো ডেপুটি সেনাপতি।

"আপনি কি ভেবেছেন, মেয়েটি এমন কঠিন রহস্যের কথা কেনো আপনার কাছে প্রকাশ করে দেবে?"

"হ্যাঁ, ভেবেছি। ভেদ বলে দেয়ার কারণ হলো, আমাকে দেখে তার এতোটাই ভালো লেগেছে যে, নিজের উপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই। সে আমাকে পাওয়ার জন্য আত্মভোলা হয়ে গেছে। সে একান্তভাবে চায় আমি তাদের রহস্য ভেদ করে সোনাদানা কব্জা করে নিই এবং তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করি।"

"কিন্তু আমার সন্দেহ হয় লোকগুলো তাদের তরুণী মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য রাত কাটানোর জন্য এসব উদ্ভট গল্প ফেঁদেছিলো।" বললো ডেপুটি সেনাপতি। "এরা আপনাদের ধোঁকা দিয়ে নির্বিবাদে রাত কাটিয়ে চলে গেছে।"

"তুমি আমায় সঙ্গ দেবে কিনা তাই বলো?" বললো সেনাপতি। "তোমাকে আমি অধীনস্ত মনে করে নয়, বন্ধু মনে করে আমার একান্ত বিষয়ে তোমাকে অংশীদার করেছিলাম। ওখান থেকে আমি যদি কিছু নিয়ে আসতে পারি, তাতে তোমারও অর্ধেক থাকবে। আচ্ছা বলো তো, ঘরবাড়ি আপনজন থেকে দূরদেশে হত্যা আর খুনাখুনিতেই জীবনটা শেষ করে দেয়াই কি আমাদের বিধিলিপি? এসব হচ্ছে রাজা-মহারাজা ও সুলতানদের ঝগড়া। যুদ্ধ করে যেসব ধন-রত্ন পাওয়া যায়, তাতে তাদের আরাম-আয়েশ বাড়ে। তারা যুদ্ধে আমাদের জীবন বিপন্ন করে আমাদের রক্তের বিনিময়ে রাজা-বাদশাহ হচ্ছে। মৃত্যু-বিভীষিকা থেকে নিজের জীবনটাকে উদ্ধার করে কিছুটা আরাম-আয়েশ করার অধিকার কি আমাদের থাকতে পারে না?"

সেনাপতি বাহরাম যখন তরুণীদের রূপ-সৌন্দর্যের কথা শুরু করলো, তখন ডেপুটি সেনাপতিরও চোখ চমকে উঠলো। সেনাপতি ডেপুটিকে বললো, "তুমি চিন্তা করো না। তুমি না গেলে আমিই যাবো। আমি হয়তো আমার জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে তোমার প্রধান কাজ হবে আমার অনুপস্থিতির কারণ গোপন রাখা। তুমি আমার অনুপস্থিতির ব্যাপারে বলবে, দূরে অবস্থিত আমাদের বিভিন্ন সেনাচৌকিগুলো পরিদর্শন করে সেগুলোকে আরো কার্যকর করার জন্য আমি পরিদর্শনে বেরিয়েছি। প্রশাসক আমার এ কাজে কোনো বাধা দেবে না। তোমার দ্বিতীয় কাজ হবে, দৃশ্যত আমাদের উপর আক্রমণ হওয়ার আশংকা নেই, তবুও নিশ্চিন্তে থাকা উচিত

নয়। কারণ, আমরা শত্রুবেষ্টিত অবস্থায় রয়েছি। শত্রু থেকে কখনো নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। যদি কোন কারণে শত্রুরা দুর্গ আক্রমণ করে, তাহলে দুর্গ রক্ষার জন্য তুমি জীবন বাজি রাখবে। তাহলে সৈন্যরা আর আমার অনুপস্থিতির ঘাটতি অনুভব করবে না।"

ডেপুটি সেনাপতি সেনাপতি বাহরামের প্ররোচনায় সায় দিয়ে দিলো। সে এই গোপন রহস্য গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলো। তার সামনে এখন সমস্যা হয়ে দেখা দিলো সেনাপতির ক'জন সহচর নির্বাচন। কারণ, সোনা-রুপার লোভে যে কোনো সিপাহী এ অভিযানে যেতে এবং বিষয়টি গোপন রাখতে রাজি হবে; কিন্তু বিপুল ধন-রত্ন হাতিয়ে নিতে এরাই আবার স্বয়ং সেনাপতিকেই হত্যা করে বসতে পারে। এমনও হতে পারে, তারা নিজেরাও খুনাখুনিতে জড়িয়ে পড়বে। নানা কারণে সেনাপতির জন্য চারজন সফরসঙ্গী নির্বাচনে ডেপুটিকে খুবই চিন্তায় ফেলে দিলো। অনেক ভেবে-চিন্তে তার বিশেষ ঝটিকা বাহিনী থেকে চার সিপাহীকে নির্বাচন করলো ডেপুটি সেনাপতি।

তারা মনে করেছিলো, তারা দু'জন ছাড়া এই গোপন রহস্যের ব্যাপারটি আর কেউ জানে না এবং সেই সর্পরাজ্যে যাওয়ার পথও জানা নেই আর কারো। এদিকে সাদা দাড়িওয়ালা ব্যক্তি দুর্গশাসককেও সর্পরাজ্যে যাওয়ার পথের কথা বলে গিয়েছিলো। হৃতযৌবন ফিরে পাওয়ার ওষুধের জন্য দুর্গশাসক দু'জন বিশ্বস্ত সেনাকে পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। তার কাছেও বিষয়টি গোপন রাখাই ছিলো প্রধান সমস্যা। সেও এই আত্মপ্রবঞ্চনায় মুগ্ধ ছিলো যে, সে ছাড়া আর কেউ এই গোপন রহস্যের কথা জানে না।

সাদা দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসী তার দলবল নিয়ে অতি প্রত্যুষে দুর্গ ত্যাগ করে চলে যায়। তরুণীদের বহনের জন্য হাওদাওয়ালা উট ছিলো। আর কাফেলার পুরুষরা সফর করছিলো ঘোড়াগাড়ীতে। সন্ন্যাসীদের কাফেলা যখন শহর অতিক্রম করছিলো, তখন তাদের দেখার জন্য পথে পথে বহু লোক জমায়েত হতে শুরু করছিলো। এক পর্যায়ে দর্শনার্থীদের ভিড় ঠেলে থানেশ্বর শহর পেরিয়ে গেলো সন্ন্যাসীদল। শহর ছেড়ে সন্ন্যাসীদের দলনেতা গাড়িচালকদের বললো, ফেরার পথেও মুসলমানদের সেনাচৌকির দিকে নজর রেখো। কোনো চৌকির ধারে-কাছে যেয়ো না। তুমি তো জানো, ওদের চৌকি কোন্ কোন্ জায়গায় রয়েছে।

দুপুরের দিকে সন্ন্যাসী কাফেলা একটি জঙ্গলময় বিরান ভূমিতে পৌঁছলো। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সেখানে কোনো লোকালয় ছিলো না। তাছাড়া এলাকাটি ছিলো খুবই দুর্গম। মাঝে-মধ্যে টিলা, ঝোঁপঝাড় আর উঁচু-নিচু। একটি সুবিধা মতো জায়গা দেখে সন্ন্যাসীদের দলনেতা যাত্রা বিরতি দিয়ে বিশ্রামের জন্য থেমে গেলো। তরুণীরা উটের উপরের হাওদা থেকে নেমে এলো। ঘোড়াগুলোর বাঁধন খুলে দেয়া হলো। মাটির উপর মাদুর পেতে সবাই বসলো। কাফেলার সবাই ছিলো খুবই খুশি। তরুণীরা তো উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছিলো। দলের অন্যরা তরুণীদের উচ্ছ্বাস-আনন্দ দেখে হাসছিলো।

"আচ্ছা, আমরা যে শিকার বধ করতে পেরেছি, তা কীভাবে বোঝা যাবে?" দলপতির কাছে জানতে চাইলো এক তরুণী।

"থানেশ্বরে আমাদের লোকজন আছে। দুর্গের ভেতরেও আছে আমাদের গোয়েন্দা।" বললো দলনেতা সাদা দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসী। "দুর্গশাসক ও সেনাপতি যদি আমাদের বাতানো পথে অগ্রসর হয়, তাহলে আমাদের লোকেরা তাদের অনুসরণ করবে। তারা যদি নিশ্চিত হয় যে, এরা আমাদের বলা পথেই অগ্রসর হচ্ছে, তাহলে কোন্ কোন্ জায়গায় খবর পৌঁছাতে হবে, সে ব্যাপারে তারা জানে।"

"যে সেনাপতির কাছে আমাকে পাঠানো হয়েছিলো, সে তো আমার কথা শুনে অভিভূত হয়ে পড়েছিলো।" বললো এক তরুণী।

"ওরা কী করবে সে নিয়ে তোমাদের দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই। ওরা যা-ই করুক, সেটি হবে আমাদের জন্য সহায়ক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, থানেশ্বর মন্দির অচিরেই আমাদের হাতে ফেরত আসবে।"

হঠাৎ করে কাফেলার একজন উৎকর্ণ হয়ে বললো, "মনে হয় আমার কানে ঘোড়া দৌড়ের আওয়াজ ভেসে আসছে।"

"এখানে কে আসবে; আমাদের ঘোড়াগুলোরই আওয়াজ হবে হয়তো।" সান্ত্বনা দিলো একজন।

এ ব্যাপারে আর কেউ মনোযোগ দিলো না। অথচ তা তাদের ঘোড়ার আওয়াজ ছিলো না। সন্ন্যাসী কাফেলাটি থানেশ্বর পেরিয়ে বিজন ময়দানে প্রবেশ করলে একটি ঝোপের আড়াল থেকে তাদের পর্যবেক্ষণ করছিলো এক বালক। তখন উটের হাওদাগুলোর পর্দা উঠানো ছিলো। ফলে ভেতরে বসা তরুণীদের

স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলো বালকটি। বালক ঘোড়াগাড়ীতে আরোহীদেরও গভীর দৃষ্টিতে দেখে বুঝতে পারলো এই অভিযাত্রী দল অত্যন্ত দামী। সে বিপরীত দিকে দৌড়ে কোথায় যেনো হারিয়ে গেলো।

দশ-বারোজনের একটি অপেক্ষমান কাফেলার কাছে গিয়ে থামলো বালকটি। কাফেলার লোকেরা তখন মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি দিয়ে আরাম করছিলো। অদূরেই তাদের ঘোড়াগুলো বাঁধা ছিলো। বালকটি গিয়ে তার দেখা কাফেলার কথা বললো এবং জানালো কাফেলাটি কোন্দিকে যাচ্ছে। তাদের মধ্য থেকে এক যুবক বালকটিকে সাথে নিয়ে কাফেলার অবস্থা জানার জন্য অগ্রসর হলো। তারা পাহাড়ী টিলা ও ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে কাফেলা দেখে বালকের পিঠ চাপড়িয়ে ফিরে এলো। সে এসে অন্যদের বললো, "শিকার খুবই মূল্যবান।" তাদের কেউ কেউ বললো, "কাফেলা কোন্দিকে যায়, তা দেখে ওদের পিছু পিছু অগ্রসর হও। রাতের বেলায় ওদের উপর হামলা করো।" আরেকজন বললো, "রাত-দিন বাদ দাও। আমাদের জন্য সবই সমান। শুধু খেয়াল রাখো, আশপাশে যেনো কোনো সেনাচৌকি না থাকে। কোনো সেনাচৌকিতে আওয়াজ চলে গেলে সৈন্যরা এসে আমাদের সবাইকে হত্যা করবে; কারো পালানোর সুযোগ থাকবে না।"

"হতভাগা মুসলমান সৈন্যরা তো আমাদের জীবন বিপন্ন করে ফেলেছে।" দলনেতা বললো। "এ জন্য আমরা হিন্দু রাজা-মহারাজাদের শাসনই বেশি পছন্দ করি। তারা রাজধানীর বাইরের লোকদের কোনো পরোয়াই করে না। অথচ গজনীর লোকেরা তো জঙ্গলেও শাসন জারি করেছে। আগে জঙ্গল ছিলো সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে। যাক, চলো এখনই কাফেলাকে লুটে নিই। আশপাশে কোনো সেনাচৌকি নেই।"

আসলেও তাদের ধারে-কাছে কোনো সেনাচৌকি ছিলো না। কিন্তু গজনী বাহিনীর সাত-আটজন সৈনিক দূরবর্তী একটি চৌকি থেকে থানেশ্বর ফিরে যাচ্ছিলো। তারা ছিলো অশ্বারোহী। খুব নিশ্চিন্তে গল্প-স্বল্প করে তারা ধীর-স্থিরভাবে পথ অতিক্রম করছিলো।

সর্পপূজারী সন্ন্যাসীদের কাফেলা একটি জায়গায় যাত্রা বিরতি করে আহারাদি সেরে শুয়ে-বসে বিশ্রাম করছিলো। পথে দস্যুদের একটি ঘোড়া হ্রেষারব করছিলো বটে; কিন্তু তাদের কেউ সেদিকে খেয়াল করেনি। দস্যুরা

তাদের ঘোড়াগুলোকে কাফেলার অবস্থান থেকে কিছুটা দূরে বেঁধে রেখে হেঁটে কাফেলার দিকে অগ্রসর হলো। অগ্রসর হয়েই দস্যুদল ঘিরে ফেললো কাফেলা।

দস্যুদলের নিক্ষিপ্ত একটি তীর কাফেলার এক লোকের বুকে এসে বিদ্ধ হলো। সবাই আতঙ্কিত হয়ে চতুর্দিকে দেখতে লাগলো। ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের কানে ভেসে এলো, "সবাই দাঁড়িয়ে যাও, কোনো চেঁচামেচি করবে না এবং কেউ পালানোর চেষ্টা করবে না।"

কাফেলার লোকজন দেখতে পেলো, ঝোঁপের আড়াল থেকে দশ-বারজন লোক বেরিয়ে এসেছে। ওদের সবার চেহারা ঢাকা। মাথা কালো কাপড়ে আবৃত। শুধু চোখ দু'টো খোলা। এরা ডাকাত। দস্যুতাই এদের পেশা। ডাকাত দলকে এগিয়ে আসতে দেখে সন্ন্যাসীরূপী কাফেলার পুরুষরা তাদের ঢিলেঢালা পোশাকের আড়াল থেকে খঞ্জরের চেয়ে বড় তরবারীর চেয়ে ছোট এক ধরনের অস্ত্র বের করে মোকাবেলার জন্য তৈরি হয়ে গেলে। ডাকাতদল যাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে সন্ন্যাসী মনে করেছিলো, মুহূর্তের মধ্যে তাদের কায়া বদলে গেলো। তারা এখন তরবারী নিয়ে রীতিমতো ডাকাতদলের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে গেলো। সন্ন্যাসীরা দুই তরুণীকে আগলে রেখে মোকাবেলা করছিলো আর ডাকাতদল তাদের বেষ্টনী ভেঙ্গে তরুণীদের কব্জা করার চেষ্টা করছিলো।

ডাকাতদল ভেবেছিলো, সন্ন্যাসীরূপী এই লোকগুলোকে ধমক দিয়েই কাবু করে ফেলবে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। তারা মনে করেছিলো, ধমকি দিয়েই সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নেবে এবং সুন্দরী তরুণীদের অপহরণ করে নিয়ে যাবে। কিন্তু তাদেরকে কঠোর প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হলো। সন্ন্যাসীরূপী লোকগুলোও নিয়মিত সৈন্যের মতো লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হলো। অবশ্য সন্ন্যাসীদের হাতিয়ারগুলো যুৎসই ছিলো না। লম্বা তরবারী দিয়ে ডাকাতরা তাদের কাবু করে ফেললো এবং কয়েকজনকে হত্যা করে ফেললো। তরুণীরাও এমন সাহসিকতার পরিচয় দিলো যে, মৃতদের ছোট্ট তরবারীগুলো হাতে নিয়ে তারাও আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হলো। এক পর্যায়ে তরুণীরা ডাকাতদের হুমকি দিলো, তোমরা রাজপুত কন্যাদের গায়ে হাত দিতে পারবে না। আমরা মৃত্যুবরণ করবো; তবু তোমাদের লালসার শিকার হবো না। কাফেলার জোরদার আক্রমণে দু'তিন ডাকাতও মারা গেলো।

গজনীর সৈন্যরা ওদের কাছ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো। হঠাৎ তাদের কানে ভেসে এলো নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। তারা থেমে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো, কাছেই দশ-বারটি ঘোড়া বাঁধা। তারা পূর্ব থেকেই জানতো হিন্দুস্তানের বিজন এলাকায় ডাকাত ও পথদস্যুদের আখড়া থাকে। রাজা-মহারাজারা এই দস্যুদের নিয়ন্ত্রণে কখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। অথচ সুলতান মাহমূদ বিজিত এলাকার প্রশাসকদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেনো শহর অঞ্চলের বাইরেও যেসব সেনাচৌকি থাকে, তাদেরকে নির্দেশ দেয় এলাকায় রীতিমতো টহল দিতে, যাতে নিরাপদে মুসাফিরগণ যাতায়াত করতে পারে এবং পথদস্যুদের যেনো সৈন্যরা নির্মূল করতে চেষ্টা করে।

সৈন্যদল তাদের গতিপথ বদল করে তাদের অশ্বগুলোকে তাড়া করলো। মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়াগুলোর কাছে পৌঁছে দেখতে পেলো, একদল দুর্বৃত্ত অদূরে কয়েকজন তরুণীকে তুলে নেয়ার জন্য চেষ্টা করছে। সৈন্যরা ওদের হুমকি দিলো। সৈন্যদের উপস্থিতি দেখে ডাকাতদল তরুণীদের ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু তারা ওদের ঘোড়া পর্যন্ত পৌঁছার আগেই সৈন্যরা তাদের পাকড়াও করে ফেললো।

এরপর অকুস্থলে এসে দেখলো দু'তরুণী ছাড়া আর বাকি সবাই নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে সাদা দাড়িওয়ালা একজনের দেহে তখনো প্রাণ আছে বলে মনে হলো। সৈন্যরা তার চেহারায় পানির ঝাপটা দিয়ে তাকে ঘোড়াগাড়ীতে তুলে নিলো আর তরুণীদের অভয় দিয়ে বললো, তোমাদের আর কোনো ভয় নেই, তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারো। ধৃত ডাকাতদের হাত-পা বেঁধে ওদের ঘোড়ার সাথেই হেঁটে যেতে বাধ্য করলো। তরুণী দু'জনকে একটি ঘোড়াগাড়ীতে সওয়ার হতে অনুরোধ করলো। অতঃপর সবাই রওনা হলো থানেশ্বরের পথে।

গজনীর সৈন্যরা এতোগুলো ঘোড়া, কয়েকজন বন্দি আর শেষ রাতে বিদায় হওয়া সন্ন্যাসী কাফেলার উট ও ঘোড়াগাড়ী নিয়ে থানেশ্বর দুর্গে যখন প্রবেশ করলো, তখন বেলা ডুবে গেছে।

ডাকাতদলের গ্রেফতারি এবং লুণ্ঠিত কাফেলার কথা দুর্গশাসক কুতুব গোজাক ও সেনাপতি বাহরামের কানে পৌঁছামাত্রই তারা উভয়ে দৌড়ে এলেন। তাদেরকে জানানো হলো, এই ডাকাতদল সন্ন্যাসীদের কাফেলা আক্রমণ করে

দু'তরুণী ও অন্যান্য সব পুরুষকে হত্যা করেছে। সৈন্যরা জানতো না, এরা শেষ রাতে এ দুর্গ থেকেই রওনা হয়েছিলো।

দুর্গশাসক সাদা দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসীর জীবন বাঁচানোর জন্য চিকিৎসকদের সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। দুর্গশাসক তার হৃতযৌবন ফিরে পাওয়া এবং দীর্ঘ জীবন লাভেব জন্য সন্ন্যাসীকে বাঁচানোর প্রতি মনোযোগী হলেন। এদিকে দুই তরুণী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। তাদের মুখে কথা বের হচ্ছিলো না। একটি পৃথক কক্ষে তাদের থাকতে দেয়া হলো। তাদের সেবা-যত্নের জন্য দু'জন মহিলাকে নিযুক্ত করা হলো। দুর্গশাসক ও সেনাপতি তাদের সান্ত্বনা দিলো, তোমাদের আর কোনো শংকা নেই; সৈন্যদের দিয়ে তোমাদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

সাদা দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসী অচেতন ছিলো। রাতভর চিকিসকরা তার চিকিৎসা অব্যাহত রাখলো। দুর্গশাসক নিজে চিকিৎসা তদারকি করলেন। পরদিন দুপুরে সে হুঁশ ফিরে পেলো। চোখ খুলেই সে ক্ষীণকণ্ঠে জানতে চাইলো সে এখন কাথায়? তাকে জানানো হলো, সে এখন থানেশ্বর দুর্গে। দুর্গশাসক নিজে তার চিকিৎসার তদারকি করছেন। তাকে আরো জানানো হলো, তার কাফেলার দু'জন তরুণী অক্ষত অবস্থায় বেঁচে আছে। তাদেরকে সৈন্যরা সযত্নে এনে এখানে রেখেছে। সে তরুণী দু'জনকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাদের ডেকে পাঠানো হলো।

তরুণীদ্বয় এসে তাকে জানালো, গজনী সৈন্যরা তাদেরকে উদ্ধার করে এনেছে এবং আপনাকে জীবিত দেখে সৈন্যরা এখানে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। তারা এ কথাও জানালো যে, দুর্গশাসক ও সেনাপতি নিজে তাদের সার্বিক দেখাশোনা করছেন। এমনকি তাদের সেবা-যত্নের জন্য দু'জন মহিলাকেও নিয়োগ করা হয়েছে।

গজনীর সৈন্যদের এই মহানুভবতার কথা শুনে সন্ন্যাসীর চোখে পানি চলে এলো। সে আবেগপ্রবণ হয়ে তরুণীদের বললো, "আমি আর এই লোকদের ধোঁকা দিবো না। দুর্গশাসকের হয়তো আমার প্রতি যত্নবান হওয়ার ব্যক্তিস্বার্থ থাকতে পারে। কিন্তু থানেশ্বর অভিমুখী গজনী সৈন্যদের তো আমার প্রতি যত্নবান হওয়ায় কোনো স্বার্থ ছিলো না। তোমাদের মতো সুন্দরী তরুণীদের এরা পরম সম্মানে আদর-যত্নে এখানে নিয়ে এসেছে। অথচ তোমরা ছিলে

একেবারেই অসহায়। ওরা তোমাদের যা ইচ্ছা, তাই করতে পারতো; কিন্তু বিন্দুমাত্র কদর্যতা তোমাদের স্পর্শ করেনি। বরং তোমাদের এখানে এনে পরম আদর-যত্নে রেখেছে। এরা আমাকে নতুন জীবন দিয়েছে। আমি আর এদের ধোঁকা দিতে পারি না।"

সে দুর্গশাসকের সাথে কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করলে দুর্গশাসককে খবর দেয়া হলো। দুর্গশাসক তখনই চলে এলো এবং তরুণীরা তাদের কক্ষে চলে গেলো।

"আমি আপনার সৈন্যদের এই মহানুভবতার প্রতিদান দিতে চাই।" ক্ষীণকণ্ঠে বললো সন্ন্যাসী।

"আপনি একে অনুগ্রহ মনে করবেন না।" বললো দুর্গশাসক। "আপনি আগে সুস্থ হয়ে নিন। আমি দু'জনকে প্রস্তুত করে রেখেছি, যারা আপনাকে নিয়ে যাবে। আপনি জানেন, আমি আপনার কাছে কী প্রত্যাশা করি। আর ওই সৈন্যদের কথা বলছেন, যারা আপনাকে ডাকাতদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। আপনি সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে গেলে ওদের জন্য কিছু সোনাদানা দিয়ে দিলেই চলবে।"

"আসলে আমার কাছে না আছে কোনো সোনাদানা, না আছে কোনো বিস্ময়কর ওষুধী গাছ।" দৃঢ়কণ্ঠে বললো সন্ন্যাসী। "আপনার সেবা ও যত্নের প্রতিদান আমি সোনাদানা আর যৌবন ফিরে পাওয়ার কথিত ওষুধ দিয়ে দিতে চাই না। আমি আপনার ও সৈন্যদের উপকারের প্রতিদান একটি কঠিন সত্য উচ্চারণ করে দিতে চাই। প্রকৃতপক্ষে আমি আপনাকে চির যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার ওষুধী গাছের কথা এবং সর্পমণি ও সোনাদানা এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরা যে মনোরম জগতের কথা বলেছিলাম, তা সবই অসত্য ও কাল্পনিক। জগতে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। এ কারণে আপনি ইচ্ছা করলে দেয়ালের উপর থেকে ফেলে দিয়ে আমাকে হত্যা করতে পারেন এবং এই তরুণীদেরকে উপভোগ করেও প্রতিশোধ নিতে পারেন। তারপরও আমি বলবো, প্রকৃত সত্য বলে দিয়ে আমি আপনার বড়ই উপকার করছি। আপনি দু'জনকে ওষুধী গাছ আনার জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন। যদি এদেরকে কাল্পনিক ঠিকানার সন্ধানে পাঠিয়ে দিতেন, তাহলে তারা জীবনেও সেই অবাস্তব গন্তব্যের খোঁজ পেতো না। বরং ঠিকানাবিহীন পথে ঘুরে ঘুরে জীবন বিপন্ন করতো। আপনার

দুই সেনাকর্মকর্তাও আমার এক তরুণীর ধোঁকায় পড়ে সর্পমণি আর সোনাদানা কব্জা করার নেশায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলো। তারাও হয়তো কথিত সর্পমণি ও সোনাদানার স্বর্গীয় রাজ্যের তালাশে বেরিয়ে পড়তো।"

সন্ন্যাসীর মুখে পূর্ব কথার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা শুনে দুর্গশাসকের মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো। কয়েকবার তার চেহারার রং বদল হলো। তিনি দাঁতে দাঁত পিষতে শুরু করলেন।

"আপনি বিস্মিত হবেন না।" দুর্গশাসকের উদ্দেশে বললো সন্ন্যাসী। আমি এই পরিস্থিতিতেও আপনাকে ধোঁকায় রাখতে পারতাম এবং আপনার সেবা-যত্নে আমি নিশ্চিন্তে সুস্থতা লাভ করতে পারতাম। কিন্তু আমি কল্পনাও করতে পারিনি আপনার সেনাবাহিনীর সাধারণ সিপাহীরাও এতো উঁচুমানের সততা ও চরিত্রের অধিকারী। আসলে আপনাদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ আপনাদের ধর্মের বস্তুনিষ্ঠতা ও সত্যতা। বাস্তবে আমরা লাহোর থেকে এসেছিলাম। রাজা আনন্দ পালের দ্বিতীয় পুত্র ভীমপাল এখন সিংহাসনে সমাসীন। রাজা ভীমপালের অভিজ্ঞ সেনাপতি তার একটি চক্রান্তের অংশ হিসেবে আমাদের পাঠিয়েছে। আমাদের পরিকল্পনা ছিলো আপনাকে ও আপনার সেনাপতিকে স্বপ্নিল জগতের লোভ দেখিয়ে এবং প্রচুর সোনাদানা, চিরযৌবন ও রাজত্বের মোহে ফেলে বিভ্রান্ত করা। আপনাকে দুর্গের বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং প্রয়োজনে আপনাকে গায়েব করে ফেলার পরিকল্পনাও আমাদের ছিলো।"

"আমরা আপনার কথায় বিভ্রান্ত হয়ে যাবো কিসের ভিত্তিতে আপনি এ বিশ্বাস করলেন।" সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলো কুতুব গোজাক।

"আপনি তো একজন মানুষ, ফেরেশতা নন। মানুষ যতোই ন্যায়নিষ্ঠ হোক না কেনো আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতার বাসনা সবার মধ্যে কাজ করে। এই বাসনাকে আপনি দমিয়ে রাখতে পারেন; কিন্তু তা নির্মূল করতে পারবেন না। ধন-সম্পদ ও সুন্দরী নারী ভোগ-বিলাসিতার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপকরণ। আমরা মানুষের মানবিক দুর্বলতাগুলো বুঝি। যে কোনো মানুষের মধ্যে যৌবনকে দীর্ঘদিন ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা থাকে। আপনার দৈহিক গড়ন ও বার্ধক্যের টান দেখে আমি আপনার পড়ন্ত যৌবনকে উস্কে দেয়ার কথা বলে আপনাকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আপনি আমার কথায়

আকৃষ্ট হয়ে বলেছিলেন, সোনাদানার চেয়ে আপনার কাছে যৌবন ফিরে পাওয়ার ওষুধী গাছটিই বেশি কাঙ্খিত।”

সন্ন্যাসীরূপী লোকের কথায় কুতুব গোজাকের চেহারায় লজ্জার আভাস ভেসে উঠলো।

“আপনি পেরেশান হবেন না।” বললো সন্ন্যাসী। “আপনার জায়গায় অন্য কোনো ব্যক্তি হলেও আমাদের ফাঁদে পা দিতো। আমি তরুণীদেরকে নিয়ে এসেছিলাম আপনার মধ্যে যৌবনের ভাটার টান অনুভূত করানো জন্য। দুনিয়াটাকে আমি খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। বহু মানুষকে আমি ঘেঁটেছি। আমি মানুষের স্বভাবজাত প্রবণতা নিয়ে গভীর নিরীক্ষা করেছি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে আমি আপনার মধ্যে প্রয়োগ করেছি। মনের বাসনা পূরণের জন্য এবং জীবন ও জগতকে উপভোগ করার লোভে মানুষ বিবেককে চাপা দিয়ে আবেগের দাসত্ব করতে শুরু করে। তখন কর্তব্যপরায়ণ মানুষও আপন কর্তব্য ও দায়িত্ব ভুলে যায়। অধঃপতনের দিকে ধাবমান লোকটিও তখন নিজের অধঃগতি অনুধাবন করতে পারে না। তখন অনেকেই বুঝতে পারে না হৃতযৌবন ফিরে আসে না এবং সোনাদানা ধন-সম্পদের দ্বারা এবং দৈহিক ভোগবাদিতার দ্বারা আত্মার প্রকৃত প্রশান্তি পাওয়া যায় না। জাগতিক ধোঁকা ও প্রবৃত্তির প্ররোচনাকে যারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তারাই হয় সাধু-সন্ন্যাসী বা পীর-বুযুর্গ। যে মানুষের মধ্যে আত্মার নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যায়, সে শত শক্ত দুর্গেও পরাজয়বরণ করে। শত্রুরা তার পিঠে চড়ে বসে। আপনি আপনার মিশন থেকে বিচ্যুৎ হয়ে গিয়েছিলেন আর আমাদের কর্তব্য ছিলো আমাদের মিশনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।... কিন্তু এই পড়ন্ত জীবনে আমি কায়মনোবাক্যে আপনাকে একটি রূঢ় বাস্তব উপদেশ দিতে চাই। যে দুই তরুণী ডাকাতদের হাত থেকে বেঁচে গেছে এদেরকে আপনারা আটকে রাখবেন না। এদেরকে আটকে রাখলে এরা আপনার সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ফেলবে, আপনাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা জন্ম দেবে। অবশ্যম্ভাবী নৈতিক ও বাহ্যিক উভয় ধরনের পরাজয় থেকে রক্ষা পেতে হলে নিজের প্রবৃত্তিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।”

সাদা দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসীর ক্ষত শুকাতে প্রায় মাসখানিক সময় লেগে গেলো। এই সময়ের মধ্যে সেনাপতি বাহরাম জেনে গেলো সাপ ও মানুষ

একই সাথে বসবাস করে পৃথিবীতে এমন কোনো রাজ্য নেই। সেই সাথে দুর্গে নিয়ে আসা তরুণীদ্বয়ও তাকে জানিয়ে দিলো আসলে সর্পরাজ্য সর্পমণি বলতে বাস্তবে কিছুই নেই।

এসব রূঢ় বাস্তবতা প্রকাশ করার পরও কুতুব গোজাক যথারীতি পরম যত্নে সন্ন্যাসীর চিকিৎসা তদারকি অব্যাহত রাখলেন। তরুণী দু'জনকে সসম্মানে দুর্গেই রাখা হলো। এক পর্যায়ে তাদের বিদায়ের সময় হলো।

"আপনি শত্রুতার বিষাক্ত মনোভাব নিয়ে এখানে এসেছিলেন আর এখন আপনাকে আমরা বন্ধুর মতোই বিদায় জানাচ্ছি। আমাদের আচার-ব্যবহার যদি আপনার ভালোই লেগে থাকে, তাহলে যাওয়ার সময় অন্তত এতোটুকু বলুন, আসলে আপনাদের রাজা-মহারাজাদের উদ্দেশ্য কী?" সন্ন্যাসীর উদ্দেশে বললেন দুর্গশাসক। "সে কি আমাদের সুলতানের প্রতি আনুগত্য বহাল রাখবে, না তার বাবার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে?"

"আমরা আপনাদের ঈমান ও কর্তব্য বিনষ্টের জন্য যে কঠিন আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম, এটাই প্রমাণ করে আমাদের নতুন মহারাজা ভীমপাল আপনাদের সুলতানের আনুগত্য করবে না বরং তাকে চ্যালেঞ্জ করবে।" বললো সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী আরো বললো, "রাজা ভীমপাল নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে করদরাজা থাকবে না। আপনাদের অধীনস্ত দুর্গশাসক ও সেনাপতিদেরকে মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করার মিশন হিসেবেই আমরা আপনার কাছে এসেছিলাম। তাকে নিশ্চিত করা হয়েছে, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হলে গজনী বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়বে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, গজনীর সুলতানকে তাড়িয়ে একটি দুর্গম ও কঠিন জায়গায় নিয়ে গিয়ে তার উপর সমন্বিত আক্রমণ করা হবে। সেই সাথে তাকে কর দিতে অস্বীকার করবে নতুন রাজা ভীমপাল।"

রাজা ভীমপালের কাছে খবর পৌঁছে গেলো সন্ন্যাসীর বেশে থানেশ্বর দুর্গে যে গোয়েন্দাদেরকে মিশনে পাঠানো হয়েছিলো, তা অকার্যকর হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে এ কথা জানানো হয়নি যে, শুধু মিশনই ব্যর্থ হয়নি, বরং তারা যে পরিকল্পনা করেছিলো, তাও ফাঁস হয়ে গেছে। অবশ্য ভীমপাল এসব চক্রান্তে বিশ্বাসীও ছিলো না। নিজের সাহসিকতা ও সামরিক কার্যক্রমের প্রতি ভীমপালের বেশি আস্থা ছিলো। সে পুরো উদ্যমে যুদ্ধপ্রস্তুতি করতে লাগলো

এবং কোন্ দুর্গম ও কঠিন জায়গায় সুলতানকে পরাজিত করা যায়, তা জায়গা নির্বাচনের প্রতি বেশি মনোযোগী হলো।

ঝিলম থেকে রাওয়ালপিণ্ডি পর্যন্ত একের পর এক পাহাড় অবস্থিত। বর্তমানে পাহাড়ের ভেতর ও পাদদেশ দিয়ে চলে গেছে মহাসড়ক ও রেলপথ। পূর্বে এসব জায়গার পথ ছিলো গুহার মতো। ঝিলম পাহাড়ী এলাকায় বুগীরটিলা নামে একটি জায়গা ছিলো। সেখানকার অধিবাসীদের জাদু-টোনা ছিলো সারা ভারতবর্ষে বিখ্যাত। সুলতান মাহমূদের সময়ে এই এলাকাটি ছিলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ এবং খুবই দুর্গম। ভীমপাল সুলতান মাহমূদের সাথে মোকাবেলার জন্য ঝিলম ও রাওয়ালপিন্ডির মাঝামাঝি দুর্গম এই স্থানটিকে বেছে নিলো। সে তার সেনাবাহিনী সেই দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় স্থানান্তরের নির্দেশ দিলো। সেই সাথে সেনাপতিদের বললো, তারা যেনো পাহাড়ী এলাকায় যুদ্ধ করার জন্য সেনাদেরকে বিশেষভাবে তৈরি করে। গজনী বাহিনীকে লাহোরে যাওয়ার জন্য এই দুর্গম ও সংকীর্ণ পথ অবলম্বন করতে হতো। এই সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য ভীমপাল জায়গায় জায়গায় ফাঁদ তৈরি করলো এবং পাহাড়ের উপরে তীরন্দাজ ইউনিট নিযুক্ত করলো। তীরন্দাজের উপরই বেশি গুরুত্ব দিলো ভীমপাল। আক্রমণের পর পাহাড়ী এলাকায় গজনী বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে তাদের পরাস্ত করার জন্য বিশেষ অশ্বারোহী ও হস্তি বাহিনীকেও প্রস্তুত করলো। হস্তি বাহিনীকে অতি সংকীর্ণ পথে আক্রমণ এবং বিস্তৃত ময়দানে মোকাবেলার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দিলো।

একদিন ভীমপালের কাছে খবর এলো, থানেশ্বর দুর্গ শাসকের পক্ষ থেকে এক দূত মহারাজার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। ভীমপাল তাদেরকে রাজ দরবারে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলো। থানেশ্বর দুর্গশাসকের দূতের সাথে ছিলো ভীমপালের পাঠানো সাদা দাড়িওয়ালা সেই সন্ন্যাসী ও তার সহযোগী দুই তরুণী। থানেশ্বর দুর্গের ডেপুটি সেনাপতি দূত হিসেবে বারজন নিরাপত্তা রক্ষী নিয়ে ভীমপালের রাজদরবারে এসেছিলো।

দূত রাজা ভীমপালের মুখোমুখি হয়ে বললো, "মহারাজ! আমরা আপনার আমানতকে ফেরত দিতে এসেছি। আপনার পাঠানো অন্যান্য সন্ন্যাসী ও তরুণীরা হিন্দু ডাকাতদের আক্রমণে নিহত হয়েছে বিধায় আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। এদেরকেও গুরুতর আহত অবস্থায় আমাদের সৈন্যরা উদ্ধার করে

এনেছিলো। আমরা তাদেরকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করেছি। আমরা তাদেরকে আরো আগেই ফেরত পাঠাতে পারতাম; কিন্তু এই বয়স্ক সন্ন্যাসীর আঘাত ছিলো মারাত্মক; তার সুস্থ হতে সময় লেগেছে। আপনি এই তরুণীদের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমরা আপনার আমানতের কোনো খেয়ানত করেছি কিনা। তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন, তাদের দলের কোনো সদস্য আমাদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছে কিনা।"

সমকালীন ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, ভীমপালের মতো দুঃসাহসী ও অত্যাচারী রাজাও সন্ন্যাসীর ব্যর্থতার কোনো প্রতিশোধ নিতে পারেনি। বরং ব্যর্থ সন্ন্যাসী ও দূতকে সসম্মানেই বিদায় করেছে। এর ফলে ডেপুটি সেনাপতি সাহসিকতার সাথেই রাজদরবারে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি রাজার উদ্দেশে বলেন, "মাননীয় মহারাজ! আপনি আমাদের করদাতা। চুক্তি অনুযায়ী আপনি ও আমাদের মধ্যে কেউ কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নেবে না। কিন্তু আপনি ইতিমধ্যেই বেশকিছু তৎপরতা চালিয়েছেন, যা চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং এটাও প্রমাণিত হয়েছে, হিন্দু রাজপুতরা সাপের চেয়েও ভয়ংকর।"

রাজা ভীমপাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দূতের দিকে তাকিয়ে বললো, "করদাতা অর্থ এই নয় যে, তোমরা আমাদের রাজদরবারে এসে যাচ্ছে তাই কথা বলবে।"

রাজার মনোভাব দেখে দরবারীদের কেউ কেউ তরবারীর বাঁটে হাত রেখে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে দূতের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। দূতরূপী ডেপুটি সেনাপতি চকিতে একবার রাজদরবারের চতুর্দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, "দুর্ভেদ্য রাজদরবারের ভেতরে নিরস্ত্র এক দূতের বিরুদ্ধে এতোজন লোক রণপ্রস্তুতি নিলেন, ভাবতেও অবাক লাগে। আমাদের সুলতানের দরবারে কোনো নিরস্ত্র দূতের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে যদি কোনো শাহজাদাও তরবারীর বাঁটে হাত রাখতো, তাহলে সুলতান তার হাত কেটে ফেলতেন। তরবারীর পরাকাষ্ঠা যুদ্ধ ময়দানে দেখাতে হয়। তোমরা যদি তরবারী চালনায় এতোটাই সিদ্ধহস্ত হতে, তাহলে এই বৃদ্ধ ও তরুণীদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে না। এরা তো তোমাদেরই বোন-কন্যা। এদের সম্ভ্রমকে তোমরা যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারলে?"

কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, সেদিন ভীমপালের রাজদরবারে যে ব্যক্তি দোভাষীর কাজ করছিলো, সে থানেশ্বর দুর্গশাসকের বিশেষ দূত গজনী বাহিনীর একজন তুখোড় যোদ্ধা ডেপুটি সেনাপতির তিরস্কারমূলক বক্তব্য হুবহু

ভাষান্তরিত করে রাজাকে শোনাচ্ছিলো না। দূতের কঠোর ও কড়া তিরস্কার ও অবমাননামূলক শব্দগুলোকে অনেকটাই সাদামাটা ও সহজ ভাষায় রাজার কাছে পেশ করছিলো। অবস্থা দেখে দূত রাজার দোভাষীর উদ্দেশে বললেন, "আমি জানি না, তুমি আমার কথাগুলো হুবহু ভাষান্তরিত করে রাজার কাছে উপস্থাপন করছো কিনা। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, আমার আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে হুবহু তুমি রাজার কাছে পেশ করছো না। আমি যেভাবে বলছি, হুবহু সেভাবে আমার কথাগুলো তোমাদের রাজার কাছে উপস্থাপন করো।"

এ পর্যায়ে এ কথাটিও দোভাষী রাজাকে শোনালো।

"সম্মানিত দূত, শুনুন! আমার বাবা ছিলেন আপনাদের করদাতা। তিনি মারা গেছেন। এখন আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, আমি কর দেবো কিনা। অবশ্য এ অবস্থায়ও আমাদের মৈত্রী বহাল আছে এবং থাকবে।" বললো রাজা।

"আমি আপনার কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা এ মুহূর্তে কর্তব্য মনে করছি।" বললো দূতরূপী ডেপুটি সেনাপতি। "আপনার দাদা আমাদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। আপনার বাবাও কোনো ক্ষেত্রেই জয়লাভ করতে পারেননি। এখন আপনার পালা। আপনি ইতিমধ্যে কয়েক তরুণীকে বলি দিয়ে দিয়েছেন। আপনি পাথরের মূর্তির সামনে বসে আরাধনা করে কী পাচ্ছেন? পরাজয় ছাড়া এতে কি কোনো উপকার হয়েছে! আপনার কি এখনো বুঝে আসেনি, আপনাদের ধর্ম একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস? সেই অদ্বিতীয় নিরাকার প্রভুই আপনাদেরকে একের পর এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি করছেন। কারণ, তিনিই একমাত্র প্রভু। শাস্তি ও পুরস্কার দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে। আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুন মহারাজ।"

"কারো রাজদরবারে এসে কোনো দূত কারো ধর্মকে অবমাননা করুক এমন দুঃসাহস আমরা কোনো দূতকে দিই না।" বললো রাজা। "আমার রাজ দরবারে এসে আমার সামনে আমার ধর্মকে অবমাননা করে আপনি আমাদের সাথে মৈত্রীচুক্তির ব্যাপারে ভাবতে বাধ্য করছেন। ঠিক আছে, আপনি এখন আসতে পারেন।"

দূত রাজদরবার ত্যাগ চলে এলেন। সাদা দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসী এবং দুই তরুণী অধোমুখে তখনো রাজদরবারে দাঁড়ানো।

"ওদের এখান থেকে নিয়ে যাও।" হুংকার দিয়ে নির্দেশ দিলো ভীমপাল। "এই বৃদ্ধ আর মেয়েগুলো আমার জীবনের কলঙ্ক হয়ে থাকবে। আমার দৃষ্টি থেকে এদের সরিয়ে দাও। এসব আমি কখনো ব্যবহার করতে প্রস্তুত নই। আমি সম্মুখযুদ্ধে মোকাবেলা করেই মাহমূদকে বন্দী করে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করবো, এখন বলো কার ধর্ম সঠিক!"

ঝিলম তীরের পাহাড়ী এলাকা সেনা শিবিরে পরিণত হলো। সেখানে বিপুল সংখ্যক সৈন্য পাঠালো রাজা ভীমপাল। এদিকে মন্দিরে মন্দিরে হিন্দু পুরোহিতরা আবারও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে শুরু করলো। ফলে পূর্বের মতো বেসামরিক লোকজন ঢাল-তলোয়ার ও তীর-ধনুক নিয়ে লাহোরে জমায়েত হতে শুরু করেছে। হিন্দু জনসাধারণ রাজা ভীমপালের কোষাগারে অর্থ-সম্পদ জমা করতে শুরু করলো। হিন্দু নারীরা তাদের গায়ের অলংকার খুলে ভীমপালের যুদ্ধভাণ্ডারে দান করতে লাগলো। প্রত্যেক হিন্দুর মধ্যে যুদ্ধ-উন্মাদনা জন্ম নিলো। যেসব হিন্দু যুবক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন এলাকা থেকে লাহোর পৌছলো, তাদেরকে ঝিলম তীরবর্তী পাহাড়ী এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হলো।

সুলতান মাহমূদের কাছে খবরাখবর আসছিলো। কিন্তু তার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি যে, ভীমপাল তার বিরুদ্ধে আক্রমণ করার চক্রান্ত করছে এবং আক্রমণের জন্য প্ররোচনা দিচ্ছে। এমতাবস্থায় ১০১২ খৃস্টাব্দ চলে গেলো। ১০১৩ খৃস্টাব্দের শেষভাগে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর এলো, ভীমপাল সুলতানের সাথে তার বাবার মৈত্রীচুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং কর দিতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সুলতানের গোয়েন্দারা এ খবরও পাঠালো যে, রাজা ভীমপাল ঝিলম নদীর তীরবর্তী পাহাড়ী এলাকায় তার সৈন্যদের ছড়িয়ে রেখেছে এবং জায়গায় জায়গায় ফাঁদ তৈরি করেছে। সমকালীন হিন্দু জনতা ভীমপালকে বীর উপাধিতে ভূষিত করেছিলো। আর এদিকে শত্রু নির্মূলে সুলতান মাহমূদ ছিলেন অধৈর্যশীল। বেঈমানদের বিরুদ্ধে তিনি সব সময়ই ক্ষিপ্ত থাকতেন। তার এক পা সর্বদাই ঘোড়ার পাদানিতে থাকতো। ভীমপালের রণপ্রস্তুতির কথা শুনে সুলতান ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে তাঁর সৈন্যরাও কিছুটা বিশ্রাম নেয়ার অবকাশ পেয়েছিলো এবং তার সৈন্যঘাটতিও এ সময়ে পূরণ হয়ে গিয়েছিলো। ভীমপাল ভেবেছিলো, সুলতান মাহমূদ হয়তো আরো কিছুদিন পরে এদিকে অভিযান করবেন এবং লাহোর পর্যন্ত পৌছুতে তার বাহিনীর

অন্তত ছয় মাস সময় লাগবে। ততোদিনে শীতকাল শেষ হয়ে গ্রীষ্মকাল শুরু হয়ে যাবে। আর তখন হিন্দুস্তানীদের জন্য সময়টা যুদ্ধের উপযোগী হবে। কিন্তু ভীমপালের এ ধারণা ছিলো নিতান্তই ভুল।

ভীমপাল জায়গায় জায়গায় তার সৈন্য মোতায়েন করে ফাঁদ তৈরি করে নিশ্চিন্তে লাহোরে অবস্থান করছিলো আর ভাবছিলো, সুলতানের বাহিনী মারগালা অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকা অতিক্রম করলেই তার গোয়েন্দারা তাকে খবর দেবে। রাওয়ালপিন্ডি অঞ্চলের একটি জায়গার নাম মারগালা। ভীমপাল সুলতানের ক্ষিপ্রগতি সম্পর্কে জানতো না। তাই সে রাজকীয় চালে ধীরগতিতে অগ্রসর হয়ে লাহোর থেকে বালনাথ নামক পাহাড়ী উপত্যকায় পৌঁছলো। এদিকে সুলতান মাহমূদ মারগালা এসে গতি থামিয়ে দিলেন। সারা রাত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। তিনি এখানে যাত্রাবিরতি করে তাঁর গোয়েন্দাদের মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করেন, শত্রু বাহিনীর অবস্থান কোথায়, তাদের বিস্তৃতি কোন্ পর্যন্ত এবং তাদের রণকৌশল কী ধরনের হতে পারে? ইত্যবসরে ভীমপাল বালনাথ নামক স্থানে পৌঁছায়। জায়গাটি ছিলো পাহাড়-টিলা ও খানা-খন্দকে ভরা। ভীমপাল জায়গাটিকে নিজের সুবিধা অনুযায়ী দুর্গের মতো ব্যবহার করার পরিকল্পনা করে অবস্থান গ্রহণ করে।

প্রত্যুষেই সুলতান মাহমূদ ভীমপালের অবস্থান এবং সেখানকার ভৌগোলিক পরিস্থিতির সামগ্রিক তথ্য পেয়ে যান। সুলতানকে আরো জানানো হলো, ঝিলমের টিলা ও পাহাড়ের চূড়ায় ভীমপালের তীরন্দাজ বাহিনী অবস্থান নিয়েছে এবং জায়গায় জায়গায় ওঁৎ পেতেছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি জেনে সুলতান সেনাকমান্ডারদের ডেকে বললেন, তিনি লাহোর যাবেন না এবং ঝিলমের পাহাড়ী পথেও তিনি অগ্রসর হবেন না। তিনি কমান্ডারদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে অগ্রবর্তী সেনাদেরকে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

ভীমপালের সৈন্যবল সুলতানের সৈন্যবলের চেয়ে অনেক বেশি ছিলো। অবস্থানগত দিক থেকেও ভীমপাল ছিলো সুবিধাজনক স্থানে। সুলতান মাহমূদের সৈন্যরা আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলো। সাধারণ বাংকারে অবস্থানকারী কোনো বাহিনীকে আক্রমণ করতে হলে বেশি সৈন্যের প্রয়োজন হয়। কারণ, এমন আক্রমণে আক্রমণকারীদের জনবল বেশি ক্ষতির

সম্মুখীন হয় কিন্তু এক্ষেত্রে সুলতানের সৈন্যসংখ্যা বেশি ছিলো না। এ ক্ষেত্রে ঝটিকা বাহিনীকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সুলতানকে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হলো। সাধারণত গুপ্ত হামলা ও ঝটিকা আক্রমণের সাফল্য নির্ভর করে সৈন্যদের বীরত্ব ও সাহসিকতার উপর। রাতের অন্ধকারে লক্ষ্যস্থলে না গিয়েই যদি ফিরে এসে কোনো সৈন্যদল কর্তা ব্যক্তিদেরকে মিথ্যা তথ্য দেয়, তা নিরূপণ করার মতো বিকল্প কোনো সূত্র থাকে না।

এক্ষেত্রে সুলতান মাহমূদের গুপ্ত আক্রমণকারীদের নির্বাচন করা হতো সৈন্যদের দৈহিক ও মানসিক দৃঢ়তা এবং ধর্মীয় আবেগের ভিত্তিতে। ঝটিকা বাহিনীর সদস্যের সাথে সুলতান মাহমূদ আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতেন। সুলতান মাহমূদের ঝটিকা বাহিনীর সদস্যদের অবস্থা এমন হতো যে, তাদের জীবন-মরণে কবরস্থ হওয়া এবং কাফন দাফন হওয়ার সম্ভাবনাও থাকতো না।

পরদিন রাতের বেলায় সুলতান মাহমূদের সৈন্যরা পাহাড়ী অঞ্চলে পৌছে গেলো। ঝটিকা বাহিনীর সদস্যরা রাতের অন্ধকারে আরো এগিয়ে গেলো। প্রত্যেক দলে ছিলো দশ-বারজন দুর্ধর্ষ সৈন্য আর তাদের সাথে থাকতো একজন করে স্থানীয় গাইড। প্রত্যেক দলের টার্গেট ছিলো সেই পাহাড় চূড়া, যেখানে ভীমপাল অবস্থান করছে। সময়টা ছিলো ডিসেম্বরের শুরু এবং শীতের প্রচণ্ডতা। এমন বরফশীতল রাতে শত্রুপক্ষ থেকেও কোনো জঙ্গী তৎপরতার সম্ভাবনা নেই মনে করে ভীমপালের সৈন্যরা বাংকারে বাংকারে মাথা গুঁজে শুয়ে ছিলো।

সুলতানের ঝটিকা বাহিনী পা টিপে টিপে বরফশীতল রাতের অন্ধকারে পাহাড়ে ও টিলার চূড়ায় উঠে গেলো। হিন্দু তীরন্দাজ সৈন্যরা তখন বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। প্রতি বাংকারে মাত্র একজন করে প্রহরী পাহারা দিচ্ছিলো। এই একজন পাহারাদারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা তেমন কঠিন হলো না। কয়েকটি চৌকিতে হিন্দু সৈন্যরা জাগ্রত থাকার কারণে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো আর অধিকাংশ চৌকিতেই সুলতানের বাহিনী ঘুমন্ত সৈন্যদেরকে নিঃশেষ করে দিলো। জাগ্রত সৈন্যদের সাথে কঠিন মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হওয়ার কারণে চতুর্দিকে শোরগোল পড়ে গেলো। শোরগোলের আওয়াজ ভীমপালের কানে পৌছুলে পরিস্থিতি জানার জন্য ভীমপাল লোক পাঠালো। কিন্তু সংবাদ সংগ্রহ করে কেউই আর ফিরে এলো না।

রাত শেষে প্রত্যুষেই সুলতান মাহমূদ তাঁর গেরিলা দলের সাফল্যের সংবাদ পেলেন। অতঃপর তার সৈন্যদের একটি অংশকে তিনি চুপিসারে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ভীমপালের রণকৌশল সুলতান মাহমূদের বুঝতে মোটেও বেগ পেতে হলো না। ভীমপাল ভেবেছিলো, সুলতানের বাহিনী পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে অতিক্রম করবে। এ জন্য সে পাহাড়ের পাদদেশে সৈন্যদের ছড়িয়ে দিয়েছিলো।

দুপুরের আগেই সুলতানের সৈন্যরা ক্ষুধার্ত সিংহের মতো গর্জন দিয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে পাহাড়ের উপর থেকে নীচের দিকে তুফানের মতো ধেয়ে এলো। ভীমপালের সৈন্যরা আকস্মিক এই আক্রমণে প্রতিরোধের অবকাশই পেলো না। ওঁৎ পেতে ফাঁদ তৈরি করে রাখা হিন্দু সৈন্যরাই ফাঁদে আটকে গেলো। অবস্থা বেগতিক দেখে দাদা জয়পালের মতো ভীমপালও নিজের জীবন নিয়ে পালিয়ে গেলো। যাওয়ার আগে সে নির্দেশ দিলো, সকল সৈন্য বাংকার থেকে বেরিয়ে লাহোর রক্ষার চেষ্টা করো।

ভীমপালের ভাগ্য প্রসন্ন ছিলো যে, সে পালাতে সক্ষম হয়েছিলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রুবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ড নিঃশেষ হয়ে গেলো। হিন্দু বাহিনীর পতাকাও গায়েব হয়ে গেলো। পতাকা গায়েব ও কেন্দ্রীয় কমান্ড না থাকায় হিন্দু বাহিনী দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে শুরু করলো আর সুনিয়ন্ত্রিত ও লক্ষ্যভেদী গজনী বাহিনীর সৈন্যরা অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা এলাকা শত্রুমুক্ত করে ফেললো।

যুদ্ধ শেষে গজনী বাহিনীর হাতে হিন্দু যুদ্ধবন্দিরা জানিয়েছে, রাজা ভীমপাল পরিস্থিতি বেগতিক দেখে কাশ্মীরের দিকে পালিয়ে গেছে। সুলতান মাহমূদ ভীমপালের প্রতি এতোটাই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, তিনি একটি সেনা ইউনিট নিয়ে ভীমপালের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। কাশ্মীরে ঝিলাম নদীর তীরে অবস্থানরত হিন্দু সৈন্যরা সুলতানের অগ্রবর্তী দলকে ঘেরাও করে সবাইকে হত্যা করে। এই সাফল্যে হিন্দু বাহিনীর সেনাপতি সামনে অগ্রসর হয়ে সুলতানের বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তারা বুঝতে পারে, জীবনের সবচেয়ে ভুল কাজটিই তারা করেছে। কিছুক্ষণ ব্যর্থ মোকাবেলা করে অবশেষে তাদের সবাইকে সুলতানের কাছে পরাজয়বরণ করতে হয়।

বিজয়ের পর সুলতান মাহমূদ ঘোষণা করলেন, এখানকার সকল অধিবাসী যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে, তাহলে সকল বসতি উজাড় করে দেয়া হবে। সুলতানের ঘোষণায় লোকজন দলে দলে ইসলামে দীক্ষা নিতে লাগলো। সেখানকার যুগিরটিলা নামক স্থানের একটি মন্দিরে একটি মূর্তি ছিলো খুবই পুরনো। হিন্দুরা বিশ্বাস করতো, চল্লিশ হাজার বছরের পুরনো এই মূর্তিটি। সুলতান মাহমূদ পুরনো মূর্তিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে মন্দিরটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেললেন। ১১১৪ সালের জুলাই মাসে বিজয়ীবেশে সুলতান মাহমূদ পুনরায় গজনীতে ফিরে এলেন।

অজেয় দুর্গ

১০১৪ হিজরী সনের শেষ ভাগের ঘটনা। ঝিলম নদীর তীরবর্তী পাহাড়ের ঢালে সাধারণ একটি দুর্গে সুলতান মাহমূদের কিছুসংখ্যক সৈন্য অবস্থান করছিল। পাঞ্জাবের মহারাজ ভীমপালকে পরাজিত করে সুলতান মাহমূদ এ দুর্গ তাঁর অধীনে নিয়ে এসেছিলেন। পাঞ্জাবের বিজিত এলাকায় সুলতান মাহমূদ তার নিজস্ব শাসনব্যবস্থা চালু করতে পারেননি। কারণ, গযনীতে গণ্ডগোল দেখা দেয়ায় তাকে তড়িঘড়ি করে গযনীতে ফিরে যেতে হয়েছিল। পা াবের পরাজিত মহারাজার সাথে সুলতানের কৃতচুক্তি অনুযায়ী তিনি পাঞ্জাবের যে কোন স্থানে তাঁর সেনাবাহিনীর দু'-একটি শিবির স্থাপনের ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। চুক্তি মোতাবেক সেনাদের সর্বময় খরচ ভীমপালের বহন করার কথা ছিল।

বালনাথ দুর্গে সুলতান মাহমূদের সৈন্যদের অবস্থান কয়েক মাস হয়ে গেল। মাকরানের অধিবাসী সারওয়াগ নামের ডেপুটি সেনাপতি ছিলেন বালনাথের দুর্গপতি। হঠাৎ একদিন বালনাথ দুর্গে দু'জন অশ্বারোহী এলো। আগন্তুকদের একজন একটি মসজিদের ইমাম আর অপরজন গযনী বাহিনীর একজন সৈনিক। তারা কাশ্মীরের সীমান্ত এলাকা থেকে এসেছে। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আসায় তারা ছিল পরিশ্রান্ত। তাদের চেহারা ধুলোবালি মাখা আর শীতের তীব্রতায় ঠোঁট ফেটে চৌচির।

তাদের চেহারা ছবিই বলে দিচ্ছিল, তারা দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসেছে এবং পথিমধ্যে কোন বিশ্রাম ও পানাহার করেনি। এরা বালনাথ দুর্গে এসেই দুর্গরক্ষক সরওয়াগের কাছে চলে এলো।

"আপনারা খুবই ক্লান্ত। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন, এরপর আমি আপনাদের কাছ থেকে ওখানকার খোঁজ খবর জানবো।"

"ওখানকার যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তার চেয়ে আমাদের চেহারা মোটেও খারাপ হয়নি সম্মানিত দুর্গপতি।" বললেন আগন্তুক ইমাম।

"তাই! কী হয়েছে? হিন্দুরা কি আমাদের লোকজনকে বন্দী করে রেখেছে? উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন সারওয়াগ! হিন্দুরা কি আপনাদেরকে ইসলামের

প্রচার কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে? সুলতানের নির্দেশ বাস্তবায়নে হিন্দুরা আপনাদেরকে বাধা দিচ্ছে?"

"না, এমন কিছুই হয়নি। আমি বাধ্য হয়েই এই সিপাহীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। সে ঘটনা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে।... আমি নিজেও সৈনিক, শুধু ইমাম নই। আপনার এমনটি ভাববার অবকাশ নেই যে, আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওখান থেকে পালিয়ে এসেছি। কাশ্মীর যাদুগরদের স্বর্গরাজ্য। এছাড়া ওখানে এক প্রকার অস্বাভাবিক অদৃশ্য শক্তি রয়েছে, যারা মানুষকে নানাভাবে ধোঁকা দেয়। এই অস্বাভাবিক শক্তি জিনও হতে পারে, মানুষের প্রেতাত্মাও হতে পারে।" বললেন ইমাম।

"মনে হচ্ছে, আপনারা হিন্দুদের যাদুটোনার শিকার হয়েছেন। বললেন দুর্গপতি সারওয়াগ। আপনি যা বলছেন, এসব কথা এতো সহজে আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। সুলতান ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বহু যাচাই-বাছাই করে দুর্গপতির দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন। তাকে আমার সম্পর্কে বলা হয়েছিল, সেনাপতি সারওয়াগ কুসংস্কার ও অপপ্রচারে প্রভাবিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার মতো ব্যক্তি নয়। আপনি হিন্দুস্তানে জন্মগ্রহণকারী মানুষ। হিন্দুদের নানা কুসংস্কার ও ভৌতিক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী পরিবেশে বড় হয়েছেন। অথচ এখন আপনি মুসলমানদের ইমাম। একজন ইমামকে অবশ্যই বাস্তববাদী ও দূরদর্শী হওয়া উচিত। কারণ, আপনি সমাজের পরিচালক। সাধারণ মানুষ আপনাকে অনুসরণ করবে।

"সম্মানিত দুর্গপতি! এতদূর থেকে নাওয়া-খাওয়া, ঘুম-বিশ্রাম ত্যাগ করে অবিরাম সফর করে আপনার কাছে ছুটে এসেছি, আপনাকে বুঝতে হবে ব্যাপারটি সাধারণ কোন ঘটনা নয়। আপনার পক্ষে ঘটনার ভয়াবহতা কল্পনা করাও কঠিন। তাই আপনি আমার সবকথা শোনার আগেই বলে দিয়েছেন আমি বাস্তববাদী নই। বললেন ইমাম।

আমি একথা এজন্য বলেছি যে, আপনারা ওখানকার ঘটনা বলতে গিয়ে যাতে আবেগাপ্রবণ হয়ে বাড়িয়ে না বলেন।" বললেন দুর্গপতি। যা হোক, এখন আপনি যা বলতে চাচ্ছিলেন বলুন।

"প্রকৃতিগতভাবেই কাশ্মীর এমন শোভামণ্ডিত অঞ্চল যে, মনে হয় কাশ্মীর দুনিয়ার কোন ভূখণ্ড নয়, যেন এটা মানুষ নয়– জিন্নাতের আবাসস্থল। কখনো

মনে হয়, এ ভূখণ্ড হয়তো মর্তের মানুষের আবাসস্থল নয়, এখানে ওইসব মানুষের রুহেরা বাস করে, যারা সবাই জান্নাতী।" বললেন ইমাম।

"রূহ আল্লাহ তায়ালার একটি আমানত। মানুষ মরে গেলে রূহ আল্লাহর দরবারে চলে যায়। বললেন, দুর্গশাসক সারওয়াগ। কোন রূহ জমিনে বসবাস করে না। আপনি কল্পনা আর স্বপ্নের কথা বলবেন না সম্মানিত ইমাম। আসলে আপনি ওখানে কী দেখে এসেছেন, হুবহু সেই কথা বলুন।

"আমরা ওখানে গিয়ে মানুষকে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত করছিলাম। আমরা তাদেরকে নামায পড়াতে শুরু করি এবং মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে তাদের জানাতে থাকি। এ কথাও বুঝাতে চেষ্টা করেছি. আল্লাহর সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কী? ওখানকার লোকজন সুলতানের নির্দেশে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল বটে; কিন্তু আমরা তাদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিলে তারা মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে।

কিছুদিন পর সেখানে রাতের বেলায় বিস্ময়কর এক আলোর ঝলকানী দেখা দেয়। অথচ তখন আসমানে না কোন মেঘ ছিল, না বৃষ্টি-বাদলের লক্ষণ ছিল। আমি যে গ্রামে ছিলাম এক পর্যায়ে ওই গ্রামেও অদ্ভুত বিজলী দেখতে পাওয়া যায়। একদিন রাতের বেলায় সেই গ্রামের মাঠে ঘোড়া দৌড়ানোর আওয়াজ শোনা যায়। এমন নয় যে, আওয়াজটি কাছে থেকে শুরু হয়ে দূরে মিলিয়ে যেত, বরং কাছে থেকেই আওয়াজটি শোনা যেত এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তা হারিয়ে যেত।

একদিন দিনের বেলায় কাঠুরিয়া লোকজন জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহে গেলে তারা জঙ্গলের মধ্যে নারীকণ্ঠের কান্নার আওয়াজ শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়ে পালিয়ে এলো। তারা এসে এই খবর শোনালে অন্য লোকজন জঙ্গলে কোন বিপদাপন্ন নারীর কান্না কি-না তা যাচাই করতে গিয়ে কোন জনমানুষের অস্তিত্বই জঙ্গলে খুঁজে পায়নি।

একদিন রাতের বেলায় বিপন্ন নারীকণ্ঠের কান্না শোনা গেল। নারীর কান্না থেমে যাওয়ার পর জলদগম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো... 'দেব-দেবীদের অভিশাপ পতিত হবে... পাহাড় ফেটে যাবে... বনে আগুন জ্বলবে... সাবধান! দেব-দেবীদের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের অসন্তুষ্ট করো না।'

ইমাম আরো বললেন, এসব কথা শুনে আমি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি, দেবদেবীদের কোন অস্তিত্ব নেই, এসব দেখে তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। তোমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করবে। কিন্তু বুঝতে পারলাম, আমার আশ্বাসবাণীতে তারা আশ্বস্ত হতে পারছে না। এই ঘটনার চার/পাঁচ দিন পর পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে চারজন লোক ভীত-বিহ্বল অবস্থায় আমাদের গ্রামে এলো। তারা এসে জানাল, তাদের গ্রাম সংলগ্ন একটি পাহাড় ফেটে গেছে। ফাটা পাহাড় থেকে একটু পর পর আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। মাঝে মধ্যে ভেঙ্গে পড়ছে পাহাড়ের অংশবিশেষ। ভাঙ্গা পাহাড়ের আশপাশে অদ্ভুত আকৃতির মানুষের আনাগোনা তারা দেখতে পেয়েছে।

এসব ভীতিকর কাহিনী শুনে আমার গ্রামের লোকজন এতটাই ভীত হয়ে পড়ল যে, তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে গেল। আমি যতই তাদের 'কিছু হবে না' বলে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করি; কিন্তু তারা ততই ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমি গ্রামের মুরুব্বীদের বোঝাতে চেষ্টা করি, যা শোনা যাচ্ছে, এগুলো হিন্দু যোগী সন্ন্যাসীদের কারসাজী। এরা সাধারণ লোকজনকে ইসলাম গ্রহণ থেকে ফেরানোর জন্য এসব যাদুটোনা করছে।

সম্মানিত দুর্গশাসক! আমি যতই আশ্বাসবাণী শোনাই না কেন, কিছু ঘটনা আসলে এমনও ঘটেছে, যেগুলোর কোন ব্যাখ্যা নেই। কোন অবস্থাতেই এগুলোকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। যেমন ধরুন, রাতের বেলায় পরিষ্কার মেঘহীন আকাশে বিজলী চমকানোর বিষয়টি মানুষকে বোঝানো মুশকিল। মানুষকে কি বোঝাবো, আমার নিজের কাছেই এই বিষয়টির কোন ব্যাখ্যা নেই। তাছাড়া আরো এমন ঘটনাও ঘটেছে, এ সৈনিকের মুখে আপনি তা শুনুন।

"আমাদের সেনাচৌকির অবস্থান নদীর পাড়ে।" বললো সৈনিক। হঠাৎ এক রাতে আমরা নারীকণ্ঠের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। একাধিক নারীর কান্নার আওয়াজ শুনে চৌকির কমান্ডার যুবায়ের সাহেব আমাকে এবং অপর একজন সিপাহীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। যেদিক থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে এসেছিল, আমরা সেদিকে অগ্রসর হলে আওয়াজ থেমে গেল। অপর দিক থেকে দু'জন পুরুষকে আমরা আসতে দেখলাম। কমান্ডার যুবায়ের জামালী তাদের জিজ্ঞেস করলেন, নারীকণ্ঠের কান্নার আওয়াজ কোন দিক থেকে এসেছে? তারা জানালো, কোন নারীর কান্নার আওয়াজ তারা শোনেনি।

ঠিক সেই সময় নারীদের কান্নার আওয়াজ আবার শোনা গেল। কমান্ডার তখন তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এই তো কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এই মহিলারা কারা? তারা বললো, কোথায়, আমরা তো কারো কান্নার আওয়াজই শুনছি না? আমরা বিস্মিত হলাম, যে আওয়াজ আমরা দিব্যি শুনতে পাচ্ছি, একই আওয়াজ অন্যেরা শুনতে পাচ্ছে না কেন?

সেই দুই ব্যক্তি আমাদের জানালো, এই এলাকায় মাঝে মধ্যে দু'জন তরুণীকে দেখা যায়। যারাই দেখতে পায়, তাদেরকেই ওরা কাছে যেতে ডাকে, কিন্তু কাছে গেলে আর ওদের পাওয়া যায় না। তরুণীরা অদৃশ্য হয়ে যায়। লোক দু'জন আরো কিছু কথা বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু কমান্ডার জামালী আর কথা না বাড়িয়ে আমাদের নিয়ে চৌকিতে ফিরে এলেন। পরদিন সন্ধার পর যুবায়ের জামালী আমাকে ও অপর এক সাহসী সৈনিককে সাথে নিয়ে বের হয়ে বললেন, তিনি গতরাতের কান্নার রহস্য উদঘাটন করতে চান। আমাদের চৌকির ধারে-কাছে কোন জনবসতি ছিল না। গোটা এলাকাটি ছিল খুবই সুন্দর। আমরা দু'টি টিলাসম পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় একটি পাহাড়ের ঢালে আমরা দু'জন তরুণীকে দেখতে পেলাম। ওদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত আসমানী রঙের এমন পাতলা কাপড় জড়ানো ছিল যে, ওদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো দূর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। তরুণীদ্বয়ের মাথা ছিল খোলা, তাদের চুলগুলো ছিল আজানু প্রলম্বিত। ওরা পরস্পর কথা বলছিল আর আমাদেরকে ইশারায় কাছে যেতে আহ্বান করছিল। ওরা যেখানটায় দাঁড়ানো ছিল, সেই জায়গাটি ছিল অসম্ভব সুন্দর। চারদিকে ঘন ঘাস আর বাহারী রঙের লতাগুল্ম ও সুশোভিত ফুলগাছের ঝোপঝাড়। জায়গাটি ঘন গাছ গাছালীতে ভরা ছিল। গাছের ডালপালা পরস্পর মিলেমিশে পুরো জায়গাটায় ছাতার মতো আচ্ছাদন তৈরী করেছে। সূর্যের আলো ঘনগাছের পত্রপল্লব ভেদ করে মাটিতে পৌছাতে পারতো না। দাঁড়ানো দু'জনকে মনে হচ্ছিল এই প্রাকৃতিক পরিবেশেরই যেন অংশ। দুই তরুণীকে দাঁড়ানো দেখে আমরা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে পড়লাম। তরুণীদ্বয় তাদের অবস্থানেই দাঁড়িয়ে রইল। কমান্ডার যুবায়ের জামালী বললেন, তিনি সামনে এগিয়ে যাবেন। আমরা তাকে বাধা দিলাম। কিন্তু তিনি আমাদের বাধা মানলেন না। আমরা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলাম. তরুণী দু'জনের একজন হাতের ইশরায় যুবায়ের জামালীকে কাছে ডাকল।

আমাদের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কমান্ডার এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি তরুণীদের কাছে যাওয়ামাত্রই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সে কি বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল? দুর্গশাসক সারওয়াগ জানতে চাইলেন।

“না, বাতাসে মিলিয়ে যায়নি– খুব দ্রুত জমিনে তলিয়ে গেল। বললো সিপাহী।

“আমরা তাকে জমিনে তলিয়ে যেতে দেখে যখন তরুণীদের দিকে তাকালাম, তখন আর তরুণীদ্বয়কে ওখানে দেখতে পেলাম না। এই অবস্থা দেখে আমরা ভয়ে ওখান থেকে পালিয়ে এলাম। এই ব্যক্তি আমাদের এলাকার ইমাম। আমরা এসে তাকে এই ঘটনা জানালাম। মনে হলো, ইনি এসব ঘটনায় আগে থেকেই ভীত।”

“আমার জীবন নিয়ে আমার কোন ভয় নেই। আমার ভয় হচ্ছে, ইতোমধ্যে আমরা যেসব লোককে ইসলামে দীক্ষিত করেছি, তারা আবার ইসলাম থেকে পৌত্তলিকতায় ফিরে যাবে।” বললেন ইমাম।

ওখানকার অধিবাসীরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, তারা যেহেতু হিন্দুত্ব ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাই তাদের উপর দেবদেবীদের গযব আপতিত হচ্ছে। এজন্যই তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য আসমানী মাখলুক জমিনে নেমে এসেছে।”

চৌকির সৈন্যদের মধ্যেও এই ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে যে, সুলতান এখানে ক্ষমতাবলে মানুষকে ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন, এজন্যই এসব অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছে। বললো সৈনিক। কমান্ডার যুবায়ের জামালীর জমিনে দেবে যাওয়ার ঘটনাটি এমনই প্রভাব সৃষ্টি করেছে যে, যেই শোনে, তার চেহারাই বিবর্ণ হয়ে যায়। চৌকির সকল সৈন্যই এখন নানা সংশয় ও কুসংস্কারে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে।”

‘তোমাদের মধ্যে কি এমন সাহসী কেউ ছিল না যে কমান্ডার যে জায়গায় জমিনে দেবে গেছে, সেই জায়গাটিতে গিয়ে বিষয়টির কারণ অনুসন্ধান করবে? পাহাড়ী এলাকায় ঘাস ও ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে অনেক গভীর গর্ত থাকে। তাছাড়া এমনটিও তো হতে পারে, ওখানে গর্ত তৈরী করে রাখা হয়েছে আর এই দুই তরুণী স্রেফ হিন্দু যোগী-সন্ন্যাসীদের যাদুর অংশ হিসেবেই এমন মোহময় আচরণ করেছে?

সম্মানিত ইমাম, আপনি কি ঈমানের শক্তি সম্পর্কে জ্ঞাত নন? আপনি কি জানেন না, ঈমান শক্তিশালী হলে তার উপর কোন যাদুটোনাই কার্যকর হতে পারে না?

দুর্গশাসকের এ কথায় ইমাম নীরব হয়ে গেলেন, সিপাহীর কণ্ঠেও আর কোন কথা উচ্চারিত হল না।

"ঠিক আছে, আমি আপনাদের সাথেই যাচ্ছি। এখানে সুলতান আমাকে শুধু শাসনকাজ চালানোর জন্য নয়, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও ইসলামের পাহারাদার নিযুক্ত করেছেন। বললেন দুর্গশাসক সারওয়াগ।

এটা কোটলী কাশ্মীরের ঘটনা। দক্ষিণ কাশ্মীরের এই এলাকাটিতে তখন ছিল কোটলী রাজাদের রাজত্ব, যা পুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজুরী এলাকায় লোহা কোট নামের একটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। পাহাড়ের উপর অত্যন্ত মজবুত এই দুর্গ ছিল বহিরাক্রমণ থেকে অত্যন্ত সুরক্ষিত। সেই দুর্গের রাজা ছিল নন্দরায়। পাঞ্জাবের যে কোন রাজা যুদ্ধে পরাজিত হলে কোটলীর লোহাকোট দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিতো। কারণ, এই দুর্গটি ছিল অজেয় ও অস্বাভাবিক মজবুত। রাজা জয়পাল সুলতানের কাছে শেষবারের মতো পরাজিত হয়ে এই দুর্গেই এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জয়পালের ছেলে আনন্দপালও সুলতান মাহমূদের হাতে পরাজিত হয়ে এই দুর্গেই এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। রাজা ভীমপালকে টোল্লাযুগিয়া নামক স্থানে সুলতানের সৈন্যরা পরাজিত করার পর সেও কাশ্মীরের কোন অঞ্চলে এসেই আশ্রয় গ্রহণ করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সুলতান মাহমূদ রাজা ভীমপালকে তাড়া করে কাশ্মীর পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলেন। কাশ্মীরের রাজা নন্দরায়ের এক সেনাপতি তংগা সুলতান মাহমূদের প্রেরিত-অগ্রগামী দলকে ঘেরাও করে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ক্ষতির জন্য তংগাকেও চড়ামূল্য পরিশোধ করতে হয়। সুলতান নিজে তংগাকে তার দলবলসহ পাকড়াও করে যুদ্ধবন্দী করে ফেলেন। তংগার এই ক্ষয়ক্ষতিতে সুলতান এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তংগা ও তংগার সকল সহযোদ্ধাকে হত্যা করে তাদের মরদেহ ঝিলম নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এর পর বিজিত এলাকায় সুলতান ফরমান জারী করেন, যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না, তাদের গ্রাম ছাড়া করা হবে। ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে সকল নাগরিক সুবিধাসহ সরকারীভাবে তাদের ধন-জন ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা দেয়া হবে।

দুর্গ থেকে বাইরে এসে সুলতানের মোকাবেলা করার সাহস হয়নি রাজা নন্দরায়ের। তার সামরিক শক্তি অনেকাংশেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সুলতান মাহমূদ নন্দরায়ের এলাকায় পৌছে রাজা নন্দরায়ের কাছে পয়গাম পাঠালেন, তিনি যেন রাজা ভীমপালের মতোই তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে খিরাজ দিতে স্বীকারোক্তিমূলক সন্ধিচুক্তি করেন। রাজা নন্দরায় সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে তাকে খাজনা দিতে সম্মতি জানান। ফলে সুলতান ও রাজা নন্দরায়ের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্থাপিত হয়। চুক্তিতে শর্ত ছিল, নন্দরায়ের নিয়ন্ত্রিত যে কোন জায়গায় সুলতান ইচ্ছে মতো দু'তিনটি সেনাচৌকি স্থাপন করতে পারবেন এবং একজন শাসকের অধীনে গোটা এলাকার নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রিত হবে। নাগরিক ট্যাক্স রাজা নন্দরায়ই আদায় করবেন। কিন্তু তিনি সুলতানের সৈন্যদের সার্বিক ব্যয় নির্বাহ করবেন এবং বার্ষিক একটি মোটা অংকের সম্মানী বিজয়ী সুলতানকে দিতে বাধ্য থাকবেন।

সুলতান মাহমূদ বিজিত এলাকার সকল সাধারণ মানুষকে ইসলামে দীক্ষা নেয়ার নির্দেশ জারী করেন। সেই সাথে এই নোটিশও জারী করেন, পেশোয়ার, লাহোর, মুলতান ও বেরায় ইসলাম শিক্ষা দেয়ার মতো পারদর্শী কয়েকশত শিক্ষককে যেন কাশ্মীর এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং এখানকার নওমুসলিমদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয়। এসব জরুরী নির্দেশনা দেয়ার পর কেন্দ্রের গোলযোগের খবর পেয়ে তিনি দ্রুত রাজধানী গযনীতে ফিরে যান।

একাধিক ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন, সুলতান মাহমূদ বলেছিলেন, 'কারো উপর কোন ধর্মমত চাপিয়ে দেয়া যায় না। আমি যদিও কাশ্মীরের সকল মানুষকেই মুসলমান হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছি, কিন্তু আমি অমুসলিমদের এই অভিযোগ প্রমাণ করতে চাই না যে, বিজিত রাজ্যের নাগরিকদের উপর সামরিক শক্তিবলে ইসলাম চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

সুলতান বললেন, কাশ্মীরের লোকজন গোয়াড় ও অশিক্ষিত। এরা শাসকদের যে কোন নির্দেশকেই ধর্মীয় নির্দেশের মতো অলঙ্ঘনীয় মনে করে। এদের রাজা মহারাজার ইচ্ছা অনিচ্ছাই এদের ধর্ম। আমি এদের একথা বোঝাতে চাই যে, ধর্মের বিধি-নিষেধের সম্পর্কে কোন শাসক কিংবা রাজা-মহারাজাদের সাথে নয়। ধর্মের সম্পর্ক একান্তই আল্লাহর সাথে। আর

আল্লাহ বা মাবুদকে মাটি-পাথর দিয়ে বানানো যায় না। এই এলাকায় যদি কিছু মসজিদ তৈরী করে দেয়া যায়, তাহলে সেখানে উঁচু নীচু শাসক শাসিত একই সারিতে নামায পড়লে তারা বুঝতে পারতো, ইসলাম ধর্ম শ্রেণী বৈষম্য সমর্থন করে না। ধর্মের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। আল্লাহর কাছে মানুষ হিসেবে সবাই এক। রাজা হোক প্রজা হোক, শাসক হোক, কিংবা শাসিত, সবার মাথা-ই একসাথে একই মাটিতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদায় অবনত হয়।'

খ্যাতিমান অমুসলিম ঐতিহাসিক স্যার আর্লিস্টিন এর ভাষায় সুলতান মাহমূদ বলেছিলেন, 'যদি বিজিত এলাকার গণমানুষের কাছে ইসলামের মহত্ব কল্যাণকামিতা বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপন করা না হয়, তাহলে গণমানুষের মধ্যে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হবে যে, সুলতান বলেন এক আর করেন আরেক, যা সুলতানের ভাবমর্যাদা বৃদ্ধি ও ক্ষমতা সংহত করার জন্য সহায়ক, তা-ই তিনি করেন। ফলে নতুন মুসলমানরা ধর্ম থেকে নিরুৎসাহিত হয়ে ধর্মচ্যুত হয়ে যেতে পারে। আমার সালাতানাতের মধ্যে কোন মুসলমানের ধর্মচ্যুতিকে আমি বরদাশ্ত করবো না। সাধারণ মানুষকে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে তাদের প্রভু কে, তাদের রাসূল (সা.)-কে এবং তাদের ধর্মের বিধি-নিষেধ কী?

মহারাজা নন্দরায়ের শাসনকার্য দুটি দুর্গের ভেতরে বন্দী হয়ে পড়েছিল। আর দুর্গের বাইরে বিজিত রাজ্যে সুলতান মাহমূদ আল্লাহর নির্দেশ মতো আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাশ্মীরের নওমুসলিমদের ধর্ম শিক্ষা দেয়ার জন্য পেশোয়ার, লাহোর, মুলতান ও বেরা থেকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত বহুসংখ্যক লোক এনে নতুন এলাকায় ধর্মীয় শিক্ষা ও ইমামতি করার জন্য ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। কাশ্মীর এলাকায় তৈরী করা হয়েছিল বহু মসজিদ। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই কাঠ দিয়ে একটি করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

তৎকালে ভারতের এই এলাকাটির সাধারণ মানুষের ধর্ম বলতে তাদের রাজা-মহারাজাদের তোষণই ছিল প্রধান স্তম্ভ।

রাজা-মহারাজাদেরকেই এই এলাকার সাধারণ প্রজারা দেবতার জাগতিক প্রতিনিধি বলে বিশ্বাস করতো। আসলে এদের ধর্মবিশ্বাস ছিলো জীবনে বেঁচে থাকা আর পানাহার করার স্বাধীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অবরুদ্ধ, নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত এসব লোক যখন মুসলিম সৈন্যদেরকে বিজয়ী বেশে দেখতে পেল,

প্রত্যক্ষ করলো মুসলমানদের সাম্য-মৈত্রী-মানবিকতা ও ভেদাভেদহীন নীতি, তখন স্বেচ্ছায়, বিনা প্ররোচনা ও বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকেই তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। এসব অজ্ঞ-অনভিজ্ঞ নাগরিকদের হৃদয়ে ইসলামের বোধ-বিশ্বাস মজবুত করার নির্দেশনা দিয়ে সুলতান মাহমূদ জরুরী প্রয়োজনে গযনীতে ফিরে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু পরাজিত হিন্দু রাজা-মহারাজাদের জন্য সুলতানের এই ইসলাম প্রচার আয়োজন ছিল রাজত্ব হারানোর চেয়েও আরো বেশী বেদনাদায়ক। ভীমপাল কোন সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় না নিয়ে দুর্গম গ্রামাঞ্চলে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। তাকে যখন জানানো হলো, সুলতান মাহমূদ ভারত ছেড়ে গযনী চলে গেছেন, তখন রাজা ভীমপাল গোপন আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে দুর্গম পথে লাহোর পৌঁছলেন।

ভীমপালের লাহোর ফিরে আসার সংবাদ শুনে দীর্ঘদিন পর গোটা এলাকার রাজা-মহারাজারা এসে লাহোরে একত্রিত হলেন। শুধু রাজা-মহারাজারা নন, ভারতের বিভিন্ন খ্যাতিমান মন্দিরের খ্যাতিমান পুরোহিত পণ্ডিতগণ এসে হাজির হলেন।

ভীমপালের নেতৃত্বে এক বৈঠকে ভারতে ইসলামের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি রোধের নানা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হলো। সকল পুরোহিত পণ্ডিত অব্যাহত ব্যর্থতা ও পরাজয়ের জন্য শামরিক শাসক ও নেতাদের ব্যর্থতাকেই দায়ী করছিলেন। কোন কোন পুরোহিত সুলতান মাহমূদকে হত্যার জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার পরিকল্পনা পেশ করলেন। ক্ষীণ আওয়াজে এমনটিও উচ্চারিত হলো, সুলতান মাহমূদকে সিন্ধু নদের ওপারেই আটকে রাখতে হবে– পেশোয়ারে প্রবেশের সুযোগ দেয়া যাবে না। আর এখানে তার রেখে যাওয়া সৈন্যদেরকে ঘেরাও করে আহার-সামগ্রীর সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে ক্ষুৎপিপাসায় ধুকে-ধুকে মারার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু যে যতো যুৎসই প্রস্তাবই উত্থাপন করুক না কেন, রাজা-মহারাজা ও পুরোহিত-পণ্ডিতদের এই বৈঠকে স্থির কোন যৌথ সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হলো না। অনেকটা সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যেই শেষ হলো কনফারেন্স।

মূলত অনৈক্য ও সিদ্ধান্তহীনতার মূল কারণ ছিল প্রত্যেক রাজা-মহারাজা ও পুরোহিত পণ্ডিতের নিজ নিজ কর্তৃত্ব ও রাজত্ব অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা। এক পর্যায়ে লাহোরের প্রধান পুরোহিত কণ্ঠ চড়িয়ে বললেন, সবাই এখন

মুসলমানদের ভয়ে আতঙ্কিত। অথচ সংখ্যায় কিন্তু মুসলমানরা সব সময়ই সামান্য। মুসলমানরা এতোটা দূর থেকে এখানে এসে যুদ্ধ করছে। এখানকার প্রতিজন মানুষ, ছেলে-বুড়ো সবাই মুসলমানদের শত্রু। এখানকার মাটি-মানুষ সবই মুসলিম সৈন্যদের বৈরী। তারপরও মুসলমানরাই একের পর এক রাজ্য দখল করে নিচ্ছে। আমাদের সবাইকে এ বিষয়টি ভাবতে হবে। কেন এমন হচ্ছে? সুলতান মাহমূদ কি কোন দৈত্য? জিন? না দানব? আসলে সে আপনাদের মতোই একজন মানুষ। তথাপি আপনাদের সবাইকে পরাজিত করছে। এর প্রধান কারণ হলো সে তার ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে, সে তার ধর্মের পূজারী, ধর্মের প্রতি সে নিবেদিত। ধর্মের প্রতি এই নিবেদিতপ্রাণ হওয়াকেই মুসলমানরা বলে ঈমান। ধর্মে নিষ্ঠাই তাদের বিজয়ের প্রধান শক্তি। ধর্মের প্রতি আপনাদের এতোটা নিষ্ঠা নেই। ধর্মের চেয়ে আপনারা নিজেদের ক্ষমতা, মর্যাদা ও রাজত্ব নিয়ে বেশী ব্যস্ত।

প্রধান পুরোহিতের একথায় রাজা-মহারাজাদের মজলিসে নেমে এলো নীরবতা। পুরোহিত এই নীরবতা দেখে সবার দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন–

"হিন্দুস্তান হিন্দুদের দেশ, দেবদেবীদের দেশ। এটা আল্লাহু আকবার এর দেশ নয়। এটা হরেকৃষ্ণ হরিহরি মহাদেব এর দেশ। কিন্তু দেবদেবীদের দেশ হলে কি হবে, এদেশে এখন দেবদেবীদের কী ধরনের অবমাননা করা হচ্ছে, তা আপনারা দিব্যি দেখতে পাচ্ছেন। এই ধরিত্রী চিৎকার করে বলছে, সে তার উপরে বিচরণকারী এক মুসলমানের বোঝাও সহ্য করতে পারে না। আপনারা যদি ধরিত্রীর এই চিৎকার শুনতে না পান, অনুধাবন না করেন, তাহলে আমাদের ভবিষ্যত বংশধর ও নতুন প্রজন্ম মুসলমানদের গোলামে পরিণত হবে এবং শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাই ভবিষ্যত প্রজন্ম ও অনাগত বংশধরদেরকে এই অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে হবে।

আপনারা স্মরণ করুন, আমাদের পূর্বপুরুষরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের রোপিত ইসলামের বৃক্ষটিকে হিন্দুস্তান থেকে কিভাবে উপড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। অথচ সেই বৃক্ষ কিন্তু মহিরুহে পরিণত হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত আর অশোকের এই দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল বিন কাসিমের রোপিত ইসলামের শিকড়; কিন্তু আমাদের মহান পণ্ডিত ও ঋষিগণ হৃদয়ে ধর্মের

জপমালা নিয়ে ভগবানের নামে অসীম সাহসিকতা ও কৌশলের মাধ্যমে হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পড়া আযানের ধ্বনিকে মিটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যে পাপের শাস্তি আপনাদের প্রত্যেকেই ভোগ করতে হচ্ছে, তাহলো আপনারা সবাই সুলতান মাহমূদের এই যুদ্ধকে রাজ্যপাটের বিরুদ্ধে আক্রমণ মনে করছেন। এই ভুল ধারণা আপনাদের ত্যাগ করতে হবে। আপনাদের বুঝতে হবে, এই যুদ্ধ দু'টি শাসকগোষ্ঠীর লড়াই নয়, এই যুদ্ধ দু'টি ধর্মের লড়াই। দুই ধর্ম ও বিশ্বাসের এই লড়াইয়ে ক্রমাগতভাবে ইসলাম বিজয়ী হচ্ছে। মহারাজা ভীমপালের শুধু পরাজয় ঘটেনি। এখানে হিন্দুত্ববাদের পরাজয় ঘটেছে। পরাজয় ঘটেছে দেবদেবী ও ভগবানে বিশ্বাসীদের। কালাঞ্জরের গোটা এলাকায় হাজারো মৌলভী ও ইমামদের ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। গ্রামে গ্রামে তৈরী করা হয়েছে মসজিদ। ইসলাম যদি এসব মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে, তবে আর কোনদিন কারো পক্ষেই এদেশ থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করা সম্ভব হবে না।

"মাননীয় পণ্ডিত, এসব কথা আমাদের জন্য নতুন নয়, বললেন ভীমপাল। এখন আমাদের ভাবা উচিত, কালাঞ্জরের এলাকায় যেভাবে ইসলামের বীজ বপন করা হচ্ছে, তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করা। আমি স্বীকার করে নিচ্ছি, আমি যুদ্ধে সুলতান মাহমূদের কাছে পরাজিত হয়েছি, আমার সেনাবাহিনীও ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সেটিই শেষ কথা নয়। আমাদের আবারো চেষ্টা করতে হবে। একটি চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য হিন্দুস্তানের সকল রাজা-মহারাজার সহযোগিতা দরকার।"

"আপনি পরাজয় স্বীকার করেছেন। এটাও আপনাকে মেনে নিতে হবে যে, ভবিষ্যতেও আপনি আরো পরাজয়ের সম্মুখীন হবেন।" বললেন পুরোহিত। এবারের যুদ্ধে যদি চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনা না যায়, তবে প্রস্তুতির জন্য সময় নষ্ট করা হবে নিতান্তই সময়ের অপচয়। এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কালা রে যেভাবে সাধারণ প্রজাদের মুসলমান বানানো হয়েছে এবং তাদের হৃদয়ে ইসলামকে বদ্ধমূল করার চেষ্টা চলছে, তা প্রতিহত করা।"

"কী করবেন? এখন তো আর আপনার পক্ষে সেখানে গিয়ে ধর্মপ্রচার করা সম্ভব নয়।" পুরোহিতের উদ্দেশে বললেন কালাঞ্জরের রাজা নন্দরায়। কেননা, মাহমূদের সৈন্যরা সেখানে চৌকি স্থাপন করে শাসনকার্য চালাচ্ছে। মুসলিম

সৈন্যরা রাত-দিন টহল দেয়। আমি শুনেছি, মাহমূদ নাকি নির্দেশ দিয়েছে, কাউকে যদি হিন্দুধর্ম প্রচার করতে পাও, তবে তাকে সেখানেই হত্যা করবে। কালাঞ্জরে আমার দুর্গ ছাড়া আর কোথাও এখন আর হিন্দুধর্মের পূজা-অর্চনা নেই। দুর্গের বাইরে সবখানেই ইসলাম ধর্মের চর্চা, ইসলাম ধর্মের আলোচনা। আপনি যে সব ইসলাম প্রচারক ও ইসলামের কথা বলেছেন, তারা পুরোমাত্রায় মুসলিম সৈন্যদের সহযোগিতা পাচ্ছে।"

'তরবারী দিয়ে সব কাজ হয় না' বললেন রাজা ভীমপালের প্রধান উজির। "যাদু চালাও। ওরা যদি শক্তির জোরে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে থাকে, আমরা তরবারীর শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই আবার এসব লোককে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে পারি। আমরা এসব লোকের মনে ইসলাম সম্পর্কে সংশয়-সন্দেহ জন্মাতে পারি। এসব বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ, তাদের ডাকা হোক, তাদেরকে একাজ চালানোর ব্যবস্থা করা হোক। কালাঞ্জরের মাটি, মানুষ, ভূপ্রকৃতি, সুবিধাবাদী যাদুটোনার কারিশমা প্রদর্শনের জন্য খুবই উপযোগী। কালাঞ্জরের লোকদের মনে ভয়ানক আতঙ্ক সৃষ্টি করুন এবং অস্বাভাবিক দৃশ্যের অবতারণা করুন। যে অল্পসংখ্যক সৈন্য সুলতান মাহমূদ রেখে গেছে, তাদের মনেও আতঙ্ক সৃষ্টি করুন, সেই সাথে ওদেরকে রূপসৌন্দর্য ভোগবাদের ফাঁদে ফেলে বেকার করে দিন। গোপন ও অদৃশ্য কর্মকাণ্ডের দ্বারা যদি আমরা মুসলমানদের মোকাবেলায় এখনই কার্যক্রম শুরু না করি, তাহলে মুসলমানদের ঈমানী শক্তি বেড়ে যাবে, তখন ওদের মোকাবেলা করা আমাদের জন্য আরো কঠিন হবে।"

"হ্যাঁ, মানুষের সৃষ্টিগত দুর্বলতাগুলোতে কাজে লাগাতে হবে।" উজিরের কথাকে সমর্থন করলেন প্রধান পুরোহিত। প্রেম ও ভয় সকল মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান এবং এটি একটি প্রকৃতিপ্রদত্ত ও দুর্বলতা। ভালোবাসা ও প্রেমের আহ্বান মিথ্যা হলেও যে কোন মানুষের পক্ষেই তা তাৎক্ষণিক প্রত্যখ্যান করা কঠিন। মুসলিম সৈন্যদেরকে প্রেমের বিষ পান করিয়ে বিগড়ে দাও, তাহলে ইসলামের প্রচারক আর নওমুসলিম সবাই তোমাদের এই জালে আটকে যাবে।

রাজনৈতিক সমাধানের পথে যখন কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা ছাড়াই বৈঠক ভেঙে যেতে উপক্রম হয়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রধান পুরোহিতের চানক্য কৌশল সবাইকে আশ্বস্ত ও ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করল। এটা ছিল এমন

প্রস্তাব যাতে সবাই একমত পোষণ করল এবং এ প্রক্রিয়া জোরদার করার তাগিদ অনুভব করল।

১০১৪ সনের শেষের দিনগুলোতে দক্ষিণ কাশ্মীরে বিজিত এলাকাগুলোতে ইসলাম গ্রহণকারী হিন্দু নওমুসলিমদের বিভ্রান্ত এবং মুসলিম সৈন্যদেরকে বেকার করে দেয়ার জন্য শুরু হলো হিন্দু যোগী-সন্ন্যাসী ও পুরোহিতদের যাদু-টোনার আগ্রাসন। বলতে গেলে তখন হিন্দু পুরোহিতদের রাজত্ব ছিলো গোটা ভারত জুড়ে। যেসব গ্রামে কোন অস্বাভাবিক ঘটনার দৃশ্য কেউ দেখেনি, সেসব গ্রামে বাতাসে ভর করে প্রচারিত হচ্ছিলো যতোসব ভীতিকর কাহিনী। গুজবের পাল্লা এতোটাই ভারী ছিলো যে, অমুক গ্রামে পাহাড় থেকে আগুন বের হচ্ছে, মেঘবৃষ্টিহীন আকাশে বিজলী চমকাচ্ছে, অমুক গ্রামে পথচারীদের পথ আটকে দিয়েছে সুন্দর প্রেতাত্মা। লোকমুখে এসব কাহিনী শুনেই মানুষের অন্তরাত্মা ভয়ে কেঁপে উঠতো। ভয় এক সময় পরিণত হতো সামাজিক আতঙ্কে। এমন গুজবও প্রচার পেয়েছিলো যে, গযনী বাহিনীর লোকেরা ধরে নিয়ে জবাই করে মাংস খেয়ে ফেলছে।

সুলতান মাহমূদের সেনাচৌকির কমান্ডার যুবায়ের জামালীর মাটিতে ধসে যাওয়ার কাহিনী ছিল মারাত্মক ভয়ঙ্কর। এই ভয়ঙ্কর সংবাদটি সারওয়াগকে অবহিত করা জরুরী ছিল। কারণ, সারওয়াগ ছিলেন কালাঞ্জর অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশাসক। সকল ছোট ছোট সেনাচৌকি ছিলো তার অধীনে। ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এক সৈনিক ও একজন ইমাম আঞ্চলিক কমান্ডার সারওয়াগকে ব্যাপারটি সম্পর্কে অবহিত করতে দ্রুত আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টার টিলাযুগিয়ায় পৌঁছায়। টিলাযুগিয়ায় ছিলো তখনকার আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টার ও কমান্ডার সারওয়াগের অবস্থান। সারওয়াগ বিষয়টি জানার পর তিনি সাথে সাথেই সংবাদদাতাদের নিয়ে কালাঞ্জর রওনা হন।

সেনাকমান্ডার সারওয়াগের সাথে তার কয়েকজন দেহরক্ষী ছিল। সেই সাথে তাদের আসবাবপত্র ও রসদ বহন করার জন্য কয়েকটি খচ্চর ও উট কাফেলার সাথী হলো। তাদের কাফেলার আগে আগে দু'জন অশ্বারোহী পথিক যাচ্ছিল। তাদের বেশভূষা দেখে মনে হচ্ছিল, তারা সাধারণ কোন মুসাফির। অশ্বারোহী মুসাফির দু'জন সারওয়াগের কাফেলাকে দেখে আগে আগেই যাচ্ছিল।

ইমাম ও সংবাদবাহী সৈনিক যখন কালাঞ্জর থেকে সংবাদ নিয়ে টিলাযুগীয়াভে আসছিলেন, তখন তাদের পক্ষে দেখার অবকাশ হয়নি, এই দুই অশ্বারোহী তাদেরকেই অনুসরণ করে পিছু পিছু আসছিল। ইমাম ও সংবাদবাহী সৈনিক যখন বালনাথে প্রবেশ করেছিল, তখন অশ্বারোহীরা কোথায় যেন চলে গিয়েছিলো। এখন সারওয়াগ সিপাহী এবং ইমামকে নিয়ে যখন কালাঞ্জরের দিকে রওনা হলেন, তখন এরা তাদের আগে আগে চলতে শুরু করল।

সারওয়াগের কোন গাইডের দরকার ছিল না। কারণ, ইমাম ও সংবাদবাহী সৈনিক রাস্তা সম্পর্কে অবহিত ছিল। কাফেলা সাধারণ গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। পাহাড়ী পাথুরে জমিন, ঘাসের বিছানা, উঁচু-নিচু টিলা তাদের পিছনে থেকে যাচ্ছিল। কাশ্মীরের বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া তারা দেখতে পাচ্ছিলেন। ইমাম সেনাপতি সারওয়াগকে বলছিলেন, ওই যে বরফ ঢাকা উঁচু পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে, এটির পাদদেশে যে বসতি এলাকাটি রয়েছে, এটি এই অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং সেখানকার অধিবাসীদের সৌন্দর্য সারা ভারতে প্রবাদতুল্য।

উঁচু-নিচু টিলাময় পাহাড়ী এলাকায় যখন এই কাফেলা পৌঁছলো, তখন রাত হয়ে গেছে। বিরতিহীনভাবে তারা রাতেও কিছু পথ এগিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। কিছুপথ অগ্রসর হয়ে বিশ্রামের জন্য কাফেলা যাত্রা বিরতি করল। তখন ছিল হাল্কা ঠাণ্ডার সময়। পরদিন দিনের বেলা যখন কাফেলা রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন হঠাৎ একটি ঘোড়া খুব জোরে হ্রেষারব করে লাগাম ছিড়ে পালিয়ে গেলো। এটি ছিল একজন নিরাপত্তারক্ষীর ঘোড়া। আরোহী তখনও ঘোড়ার পিঠে বসতে পারেনি, এর আগেই অজানা আতঙ্কে চম্পট দিল ঘোড়া।

সবাই দেখতে পেল তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট লম্বা একটি সাপ ঘাসের উপর গড়াচ্ছে। জায়গাটি ছিল ঘন সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত। ছোট ছোট আগাছা জাতীয় গাছে থোকা থোকা ফুল ফুটে রয়েছে। প্রকৃতি যেন পরিকল্পিতভাবে জায়গাটিকে রং-বেরঙের বৃক্ষাদি লাগিয়ে অপরূপ সাজে সাজিয়েছে। ছোট ছোট টিলা আর উঁচু-নিচু খানা-খন্দকের মাঝে মাঝে সমতল জমিন। এ যেন কোন দক্ষ ভাস্কর্যের তৈরী মনোরম মনোসেন্ট।

সাপ দেখে সামান ও খাদ্যসামগ্রী বোঝাই উট ও ঘোড়া ছুটে পালাল। ঘোড়া ও খচ্চরগুলোকে পালাতে দেখে সবাই ওগুলোকে ধরতে পিছু পিছু

দৌড়াল, সাপ মারার অবকাশ কারো হলো না। জায়গাটি এমন যে, ঘোড়া আর খচ্চর সামানপত্র নিয়ে কোথায় পালিয়েছে আন্দাজ করাই কঠিন। সাপের ভয়ে পালানো কোন জন্তুকে আয়ত্ত্বে আনা কঠিন।

সবাই যখন ঘোড়ার খোঁজে টিলার আড়ালে হারিয়ে গেল, ঠিক এই সময়ে টিলার আড়াল থেকে অকুস্থলে দু'জন লোকের আগমন ঘটল। সাপটি তখনও ধীরে ধীরে ঘাসের উপর গড়াগড়ি করছে। এদের একজন এসে সাপটিকে একটু আড়ালে নিয়ে একটি থলের মধ্যে ভরে থলের মুখ বন্ধ করে ঘোড়ার জিনের সাথে থলেটি বেধে ফেলল। সেখানে আরো একটি ঘোড়া দাঁড়ানো ছিল।

সাপ পাকড়াওকারী লোকটি একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অপর গোড়াটির জীন ধরে বিপরীত দিকে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর তার সাথীও এসে অপর ঘোড়াটিতে সওয়ার হল। ধীরে ধীরে উভয়েই দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

সেদিন সারওয়াগের কাফেলার পুরো সময় ঘোড়া ও রসদবাহী খচ্চর ধরার পেছনেই কেটে গেল। হঠাৎ আগমনকারী দু'জনের একজন অপরনজনকে বলল–

"সামনে চল, এরা ফিরে যাবে না।"

"ফিরে যেতেও পারে। তবে এদের উপর নজর রাখতে হবে।" বলল অপরজন।

দিনের শেষ প্রহরে সারওয়াগের ছোট্ট কাফেলার অর্ধেক সওয়ার ও অর্ধেক পায়ে হেঁটে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। বহু চেষ্টার পর তারা তিন চারটি ঘোড়া আর মালবাহী দু'টি খচ্চর ও উটকে ধরতে পেরেছিল। সারওয়াগ দৃঢ়চেতা সেনাধ্যক্ষ। কোন বাধাই তাকে লক্ষচ্যুত করতে পারে না। তিনি কাফেলার সাথীদের বললেন, পায়ে হেঁটে যারই ক্লান্তি লাগে সওয়ার হবে। আমি এখন থেকে হেঁটেই যাবো। হিন্দুস্তানের এসব নাগ আমাদের মিশন ভণ্ডুল করে দিতে পারবে না।

এ পর্যায়ে তারা পাহাড়ী এলাকায় এসে পৌছলো। একদিকে বিশাল পাহাড়, আর একদিকে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের ঢাল। একটু পরপরই তাদের পথ মোড় নিচ্ছিল। কখনও তাদেরকে দু'পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করতে হচ্ছিল। তারা যতোই সামনে অগ্রসর হচ্ছিল, শীতের প্রকোপ ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কনকনে শীতের বাতাস। অবশ্য জায়গাটি এমন যে,

পানাহার সামগ্রী সাথে না থাকলেও তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরতে হতো না। জায়গাটিতে প্রচুর পানি আছে। জায়গায় জায়গায় পাহাড়ী ঝরনা বেয়ে স্ফটিকস্বচ্ছ পানি নিচে পড়ছে। নানা ধরনের ফলজ গাছে বাহারী ফল ঝুলছে। যে কয়টি জন্তু তাদের সাথে ছিল, এদের খাবারের অভাব ছিল না। এলাকাটি পশুর খাবার উপযোগী সবুজ ঘাসে ভরা।

এমন জায়গায় এসেই তাদের রাত হয়ে গেল। একটি পাহাড়ের ঢালে রাতের বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলল তারা। রাতের বেশীর ভাগ সময় কাটলো এলাকাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথাবার্তায়। তাদের তাঁবুর পাশেই বাধা ছিল জন্তু কয়টি। সকাল বেলায় আবারো রওনা হওয়ার জন্য ঘোড়ায় জীন আটকানো হলো এবং কাফেলা এগোতে শুরু করল।

অন্যদেরকে সওয়ার করে কাফেলার সরদার সারওয়াগ হেঁটেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবকে একটি ঘোড়ায় সওয়ার করালেন। দলনেতা পায়ে হেঁটে রওনা হওয়ায় সারওয়াগের নিরাপত্তা রক্ষীরাও পায়ে হেঁটেই যাচ্ছিল। হঠাৎ ইমাম সাহেবের ঘোড়া এদিক ওদিক লাফালাফি শুরু করল। যারা ঘোড়ায় চড়ে অভ্যস্ত, তারা ঘোড়ার এসব আচরণের অর্থ জানে। ঘোড়ার অবস্থা দেখে সারওয়াগ ইমামকে বললেন, জলদী ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে পড়ুন! ইমাম সাহেব ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ার সাথে সাথেই ঘোড়াটি তীব্র হ্রেষারব করে ছুটে পালাল। সাথে সাথে অন্য ঘোড়াগুলোও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে হ্রেষারব করতে লাগল।

হঠাৎ একজন বলে উঠল, সাপ! সাপ! এবার একই রং ও একই মাপের দু'টি সাপকে দেখা গেল। সবগুলো ঘোড়া নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে লাগাম ছিড়ে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। সবাই ঘোড়া ধরতে পিছু পিছু দৌড়াল। কারো আর সাপ মারার খেয়াল হলো না। দু'টি ঘোড়া পাহাড়ের ঢালু জায়গায় দৌড়াতে গিয়ে পা পিছলে নিচে প্রবাহমান ঝিলম নদীতে পড়ে গেল। সারওয়াগের দুই সৈনিক পাহাড়ের উঁচু ঢালু থেকে দেখল তাদের অতি জরুরী সফরসঙ্গী দু'টি ঘোড়া আতঙ্কিত হয়ে পালাতে গিয়ে পাহাড়ে পা পিছলে নদীতে পড়ে গেছে আর স্রোতস্বীনী ঝিলমের তীব্র স্রোত তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। নদী থেকে ঘোড়া দুটোর তীরে উঠে আসার কোন অবকাশই ছিল না।

পাহাড়ের ঢালে রাতযাপনকারী সারওয়াগের কাফেলা সকালবেলায় রওনা হওয়ার সময় যখন অবশিষ্ট সওয়ারী ঘোড়া দুটোকেও হারিয়ে বিষণ্নমনে সেখান

থেকে রওনা হয়ে গেল, কিছুক্ষণ পর ফেলে যাওয়া সেই জায়গাটিতে এলো সারওয়াগের কাফেলাকে আড়াল থেকে অনুসরণকারী দুই অশ্বারোহী। এরা এসে ঘাসের উপরে গড়াগড়িরত অবস্থায় সাপ দুটোকে ধরে থলের মধ্যে আটকিয়ে তাদের একটি ঘোড়ার জীনের সাথে সাপভর্তি থলেটি ঝুলিয়ে দিল।

কি সব অদ্ভুত ব্যাপার সম্মানিত সেনাপতি! এই এলাকা দিয়েই তো আমি দু'-তিন দিন আগে এই সৈনিককে নিয়ে আপনার কাছে পৌঁছেছি। তখন তো কোন সাপ আমার নজরে পড়েনি! এখন শীতের সময়। শীতের সময় সাধারণত সাপ গর্তে থাকে। সাপ শীত সহ্য করতে পারে না।

"ভেবে দেখুন ইমাম সাহেব! মনে হয় আমরা আসল পথ ভুলে অন্য পথে এসে পড়েছি। দেখুন না কোন জনবসতি কি চোখে পড়ছে? এমন জনমানবহীন এলাকায় রাস্তা ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।' ইমাম সাহেবের উদ্দেশে বললেন সেনাপতি সারওয়াগ।

সেনাপতি সারওয়াগের মনোবল এখনও চাঙ্গা। তিনি পায়ে হেঁটেই কাফেলাকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সবাইকে পায়ে হেঁটে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার জন্য উজ্জীবিত করছিলেন। সারওয়াগের প্রবল ধারণা জন্মালো, ইমাম সাহেব হয়তো আসল রাস্তা ভুলে অন্যপথে কাফেলাকে নিয়ে যাচ্ছেন। চলতে চলতে সন্ধ্যার আগে পথের একটি মোড়ে তারা দু'জন অশ্বারোহীকে দেখতে পেল। অশ্বারোহী দু'জন তাদের কাছাকাছি এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল এবং রাস্তার কিনারায় দু'হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। সারওয়াগ তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, উভয়েই মাথা নিচু করে সারওয়াগকে কুর্নিশ করল। সারওয়াগ ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি এদের ভাষা বোঝেন, এদের তুলুন এবং এদের কাছ থেকে পথের কথা জিজ্ঞেস করে নিন।

ইমাম সাহেব লোক দু'টিকে উঠতে বললেন। ইমাম সাহেবের কথায় তারা উঠলো বটে; কিন্তু একজন হাত জোড় করে ভিখারীর মতো করে বললো–

"আমরা আপনাদের গোলাম। আপনারা মুসলমান। আমরা আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করেছি।"

ইমাম সাহেব এদেরকে তাদের গন্তব্যের কথা জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা ঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছি তো?"

“না, আপনারা পথ ভুল করেছেন। বললো একজন। আমরা বহুদূর থেকে আপনাদের দেখে এসেছি। আমরা অবাক হচ্ছি, এ পথ দিয়ে আপনারা কী করে জীবন নিয়ে ফিরে এলেন! আমরা তো এই এলাকাটিকে মৃত্যুপুরী বলে থাকি। বাঘের মতো হিংস্র জন্তুও এই অঞ্চলে আসে না। এই এলাকাটি সাপের এলাকা। আপনারা যে দিকে যাচ্ছেন, এ পথে প্রতিটি গাছের ডালে ডালে একেকটি সাপকে ঝুলে থাকতে দেখবেন। আপনারা এ পথ ছেড়ে অন্য পথে চলুন। বলেই সে রাস্তার কথা বলতে শুরু করল। কিন্তু এ পথটি খুবই জটিল। ঘন ঘন মোড় নিতে হবে। এ পথে গেলে বারবার আপনাদের পথ হারানোর আশঙ্কা আছে। এজন্য আমরা আপনাদের সাথেই যাচ্ছি।

“ইমাম সাহেব পথিকের বক্তব্য সারওয়াগকে জানালে সারওয়াগ ওদেরকে সাথে নিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। আরো বললেন, এরা আমাদের পথ দেখিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দিলে এ কাজের জন্য আমরা তাদেরকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবো।”

“আগন্তুক দুই অশ্বারোহী সারওয়াগের কাফেলার গাইডের দায়িত্ব পেল।

চলতে চলতে সারওয়াগ ইমাম সাহেবের মাধ্যমে গাইডদের কাছে জানতে চাইলেন, তোমরা কি এই এলাকার বিস্ময়কর ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু জান?

জবাবে তারা বললো, “আমরা তো সেই জায়গা থেকেই পালিয়ে এসেছি। আমরা ভয়ে স্ত্রী-সন্তানসহ এলাকা ছেড়ে এদিকে এসে পড়েছি।” জবাব দিলো তাদের একজন।

“তোমরা কি কোন পাহাড় থেকে আগুন বেরোতে দেখেছো?”

“আমরা অনেক দূরে থাকি। আমরা সরাসরি আগুন দেখিনি। তবে অনেক দূর থেকে আগুনের শিখা দেখেছি। মনে হচ্ছিল যেন আসমান জ্বলছে। আমরা রাতের বেলায় আসমানে বিজলী চমকাতেও দেখেছি।... আমরা এমন আওয়াজও শুনেছি... কেউ নিজেদের বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করো না...। বললো সেই লোক।

“তোমরাও কি বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছো?”

“জি হ্যাঁ। আমরা ইসলামকে সত্যধর্ম বলে বিশ্বাস করি। এজন্য আমরা ওখান থেকে চলে এসেছি। আমরা আপনাদের ধর্ম কিছুতেই ত্যাগ করবো না।”

“গাইড দু'জনই একের পর এক সেইসব ঘটনা আরো ভয়াবহ রূপ দিয়ে সারওয়াগকে জানাল, যে ঘটনা সারওয়াগকে ইমাম ও সংবাদবাহী সিপাহী শুনিয়েছিল। এদের দু'জনই তাদের কথাবার্তায় আতঙ্কিত ভাব ফুটিয়ে তুলেছিল। ইমাম সাহেব ও সারওয়াগ তাদের অভয় দিচ্ছিলেন, এতো আতঙ্কের কিছু নেই। তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। গাইড দুজন অনুগত দাসের মতো কাফেলাকে পথ দেখিয়ে আগে আগে যাচ্ছিল।

দক্ষিণ কাশ্মীরে দেওকোট নামের একটি জনবসতি। দেবদারু আর চিলি কাঠের তৈরী বিশ-পঁচিশটি বাড়ি নিয়ে দেওকোট গ্রাম। গ্রামের সকল অধিবাসীই হিন্দু। এ গ্রামে দেবদারু কাঠের একটি ছোট্ট মন্দিরও আছে। মন্দিরের অনতিদূরে গযনী বাহিনীর একটি ছোট্ট চৌকি। চৌকিতে প্রায় জনাত্রিশেক সৈনিকের অবস্থান। আজমীর নামের এক লোক এই ছোট্ট সেনাচৌকির কমান্ডার। আজমীর মুলতানের অধিবাসী। এক সময় আজমীর ছিল কারামতী সম্প্রদায়ের লোক। মুলতান দখল করে সুলতান মাহমূদ যখন কারামতীদের ধর্মীয় ভণ্ডামীর মুখোশ উন্মোচন করে দেন, তখন বহু কারামতী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুন্নী মুসলমানে দীক্ষা নেয়। আজমীর ছিল সেই কারামতীদেরই একজন।

কমান্ডার আজমীর একদিন নিয়মিত সেনাটহলের উদ্দেশ্যে সাথীদের নিয়ে গ্রামে টহল দিচ্ছিল। সুলতান মাহমূদের নির্দেশে সেই গ্রামের মন্দিরটি অপসারণ করে মসজিদ তৈরী করা হয়েছিল। মসজিদে একজন ইমামও নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইমাম সেখানকার অধিবাসীদের কুরআন-হাদীস শিক্ষা দিতেন এবং লোকজনকে ইসলামের ইবাদত-বন্দেগীর রীতি-পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। এ গ্রামের লোকজনও ছিল অদ্ভুত ঘটনায় আতঙ্কিত। কারণ, তারাও গ্রামের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে আগুন জ্বলতে দেখেছিল এবং রাতের বেলায় বিজলীর আলোয় আকাশ উদ্ভাসিত হতে দেখেছিল।

এক রাতে এমনই বিজলী চমকানোর সময় ইমাম সাহেব ঘর থেকে বাইরে গেলে তিনজন বিবস্ত্র নারীকে দেখতে পান। তখন ছিল তীব্র বাতাস। বাতাসে বিবস্ত্র তরুণীদের চুলগুলো উড়ে তাদের চেহারা ঢেকে দিচ্ছিল। তরুণীরা সেই পাহাড়ের ঢালে দাঁড়ানো ছিল। রাত ছিল অন্ধকার। বিপরীত পাহাড় থেকে আলো দ্যুতি ছড়াচ্ছিল। সেই আলাতে আবছা আবছা দেখা

যাচ্ছিল পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণীদের। ঘটনাক্রমে ইমাম সাহেব সেদিন ঠিক এ সময়ে ঘরের বাইরে এসেছিলেন। তিনি দেখলেন, কিছুক্ষণ জ্যোতি ছড়িয়ে পাহাড়ী আলো বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর আবার একই জায়গা থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে আলোক রশ্মি। কিন্তু পরে আর তরুণীদের সেখানে দেখা যায়নি।

পরদিন ইমাম সাহেব চৌকিতে গিয়ে কমান্ডার আজমীরকে গতরাতে তার দেখা দৃশ্যের কথা জানালেন। ইমাম সাহেব আজমীরকে জানালেন, গ্রামের লোকজন বলাবলি করছে, ইসলাম যদি সত্য ধর্মই হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম সাহেব তাদেরকে অবশ্যই এ ধরনের অলৌকিক কোন কিছু দেখাবে। গ্রামের লোকেরা আরো বলাবলি করছে, ধর্মচ্যুতির কারণে তাদের উপর মুসিবত ধেয়ে আসছে। এজন্য তাদেরকে শাস্তি পেতে হবে।

আজমীর ইমামের কথা শুনে গ্রামে গিয়ে অধিবাসীদের আতঙ্ক দূর করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে অধিবাসীদের ভয় দূর হয়নি; বরং সে নিজেই কিছুটা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছে। কারণ, সে আলেম ছিল না। ইসলামের সহীহ আকীদা-বিশ্বাসের অকাট্য কোন দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান ছিল না। সে শুধু জানতো "কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বললে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে" এই নির্দেশের কথা।

গ্রাম প্রদক্ষিণ করে মসজিদে গিয়ে কমান্ডার আজমীর ইমাম সাহেবকে বললো, আমি একজন সৈনিক আর আপনি আলেম। আপনার ইলম এসব ঘটনার কী ব্যাখ্যা দেয়? আপনি এ সম্পর্কে লোকজনকে একটা বুঝ দিন। তা না হলে আমাদের সৈনিকরাও তো ইসলাম ছেড়ে দেবে।

আমি তরবারী দিয়ে লড়াই করতে পারি, মানুষ শাসন করতে পারি, যে কোন দুর্ভেদ্য দুর্গের প্রাচীর ডিঙাতে পারি, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ এবং নাদান একজন মানুষ। আপনার ও ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসের পাহারাদারী করার জন্য আমাকে এখানে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সুলতান নির্দেশ দিয়েছেন যেন মানুষের মন জয় করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু এখানে এমন সব ঘটনা ঘটছে যে, তাতে মানুষের মনের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে নানা সংশয়-সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সম্মানিত ইমাম, এ সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলুন, আল্লাহ না করুন শেষে আমি নিজেই পথভ্রষ্ট হয়ে না যাই।

বাস্তবে এসব অদ্ভুত ঘটনার বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা দেয়ার মতো প্রজ্ঞা ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও হিন্দুদের কঠিন চক্রান্ত সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ইমামের কাছে ছিল না।

ফলে যৌক্তিক কোন আশ্বাস বাণী ছাড়াই কমান্ডারসুলভ ভঙ্গিতে গ্রামবাসীকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে হুমকি ধমকি দিয়ে চৌকির কমান্ডার আজমীর নিজের চৌকিতে ফিরে এলো। আজমীর নিজেও বিভ্রান্তির শিকার। গ্রামের লোকেরা রাতের অন্ধকারে যে আওয়াজ শুনেছিল, নীরব ও একাকীত্বে আজমীর নিজেই সেই আওয়াজ শুনতে শুরু করল– "ইসলাম যদি সত্যিই সৃষ্টিকর্তার ধর্ম হয়ে থাকে, তবে এসব ঘটনার বিপরীতে কোন অলৌকিক ঘটনা দেখাও না!"

"আজমীরের সেনাচৌকির অবস্থানও ছিল একটি পাহাড়ের ঢালুতে। কাঠের তৈরী দু'তলা বিশিষ্ট একটি ঘরকে সেনাচৌকি বানানো হয়েছে। রাতের বেলায় উদ্বিগ্ন মনে চৌকির দুতলার জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল কমান্ডার আজমীর। রাত যেমন তীব্র ঠাণ্ডা, তেমনই ঘন অন্ধকার। দশ হাত দূরের কোন জিনিসও দেখা যাচ্ছিল না। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক গাছ গাছালীর নানা ফুলের সুবাসে মনোমুগ্ধকর একটি মনমাতানো পরিবেশ। নাম না জানা অচেনা ফুলের গন্ধে মোহিত চারদিক।

আজমীর ছিল নিবেদিতপ্রাণ মুসলমান। কিন্তু এখানে এসে সে ইসলামকে নিয়ে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখী। আজমীর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো, হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস নিতান্তই একটি বাতিল ধর্মবিশ্বাস। মূর্তিপূজা সর্বৈব একটি কুফরী কাজ। কিন্তু ইসলাম যে সত্য ধর্ম, এ বিষয়টি বাস্তবতার নিরীখে সংশয়ের শিকার নওমুসলিম আজমীরের কাছে প্রমাণ করার মতো কোন উপাদান ছিল না। সে জোর দিয়ে বলতে পারছিল না, ইসলমাই সত্য।

নিস্তব্ধ রাতের এই একাকীত্বে চিন্তা-ভাবনায় হঠাৎ ছেদ ঘটালো দূরের একটি পাহাড়ের ঢালের আলোকরশ্মি। ঘন অন্ধকার রাতেও রশ্মির আলোর ঝলক ছিল বেশ তীব্র। আলোটি কয়েকবার চমকালো আবার বন্ধ হয়ে গেলো। এ দৃশ্য দেখে কমান্ডার আজমীরের গায়ের পশম খাড়া হয়ে গেলো। সে ভাবতে লাগল, সকাল হলেই গ্রামের মানুষের মুখে শোনা যাবে– রাতে গ্রামের পাহাড়ে তারা আগুন জ্বলতে দেখেছে। অথবা বলবে, রাতের বেলায় অমুক পাহাড় আগুন উদ্গীরণ করেছে।"

অবস্থাদৃষ্টে কমান্ডার আজমীর এতোটাই পেরেশান হলো যে, সে সিজদায় পড়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাজড়ানো কণ্ঠে নিবেদন করল, হে পরওয়ারদেগার! তুমি তোমার পবিত্র নামের মর্যাদা রক্ষা করো। তুমি তোমার প্রিয় ধর্ম ইসলামের পবিত্রতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখো। তুমি আমার ঈমানের দ্যুতি দেখাও, আমি যাতে এসব অদ্ভুত আগুনের রহস্য উদঘাটন করতে পারি এই ক্ষমতা দাও।"

রাত শেষে ভোরের আলো যখন দিনের বার্তা ঘোষণা করলো, তখনও সেই রাতের ঘটনা কমাণ্ডার আজমীরের মনে পাথরের বোঝা হয়ে বিরাজ করছিল। সে দায়িত্ব অনুভব করছিল, এসব অস্বাভাবিক ঘটনার রহস্য উদঘাটন করে তার ধর্মের পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। কিন্তু এসব অলৌকিক ঘটনার রহস্য উদঘাটনের মতো ইলম ও প্রজ্ঞা কিছুই তার ছিল না। সূর্য যখন অনেকটা উপরে উঠে গেল, তখন একটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সে একাকীই বেরিয়ে পড়ল। সে চুপি চুপি গ্রামের মানুষের ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করল।

সে সময় কাশ্মীরের এই এলাকাটি ছিল ঘন গাছ গাছালীতে ভরা। ঘন বনজঙ্গলে প্রায়ই হিংস্র জীব-জন্তুকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেতো। মাঝেমধ্যে হরিণও পাওয়া যেতো। তীর-ধনুক আজমীরের সাথেই ছিল। একটি বর্শাও থাকতো তার সাথে সব সময়।

যেতে যেতে চৌকি থেকে অনেকটা দূরে একটি জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল সে। জঙ্গলের পাশ দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছিল পাহাড়ী নদী। হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো নারী-কণ্ঠের হাসির আওয়াজ। অতি সন্তর্পণে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকালো আজমীর। তার নজরে পড়ল নদীতে তিনটি রূপসী তরুণী জলকেলী করছে আর হাসাহাসি করছে। একজন অপরজনের গায়ে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। অদ্ভুত সুন্দর তরুণী তিনজন। কোমর থেকে তাদের উর্দ্ধাংশ সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন। নিম্নাঙ্গে যদিও একখণ্ড কাপড় আছে, কিন্তু তাও এতোটাই পাতলা যে, শরীরের পশমগুলো পর্যন্ত দিব্যি দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে।

তরুণীদের অস্বাভাবিক রূপসৌন্দর্যে বিস্মিত হলো না আজমীর। কারণ, আল্লাহ তাআলা প্রকৃতিগতভাবেই এই এলাকাটিকে দুনিয়ার মধ্যে সবেচেয়ে

সুন্দর করে বানিয়েছেন। এখানকার সব মানুষই সুন্দর। আজমীরকে যে বিষয়টি অবাক করলো, তা হলো, এখানকার ধারে কাছে কোন জনবসতি নেই। দূরের জনবসতি থেকে কেউ এখানে গোসল করতে আসে না। তাছাড়া তরুণীদের দেখে নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসী মনে করার কোনই যুক্তি নেই। এদের রূপ-সৌন্দর্যের সাথে আশপাশের গ্রামের তরুণীদের কোন তুলনাই হতে পারে না। এদেরকে গ্রাম্য তরুণী বলারও কোন অবকাশ নেই। আজমীরের মনে পড়ল, এই এলাকায় জনশ্রুতি আছে, অনেকেই নাকি গ্রাম থেকে দূরে পাহাড়ের ঢালে বা নির্জন স্থানে সুন্দরী নারীদের দেখতে পায়। লোকজনের ভাষায় এরা হয়তো প্রেতাত্মা, নয়তো স্বর্গের জ্বিন-পরী।

কমান্ডার আজমীর মুগ্ধ ও বিমোহিত হয়ে তরুণীদের দেখছিল। হঠাৎ এক তরুণী একদিকে তাকিয়ে আর্তচিৎকার করে দৌড় দিল। দেখাদেখি আরেক তরুণীও দৌড়ে পালাল। তৃতীয় তরুণীটি নদীর পাড়ে বসা ছিল। সে উঠে দৌড় দিতে গিয়ে নদীতে পড়ে গেল। সেখানে পানি ছিল হাঁটু পরিমাণ। ঠিক এমন সময় একটি বিশালকায় বন্য শূকর গর্জন করতে করতে পানির দিকে অগ্রসর হলো। তরুণী পানি থেকে সোজা হয়ে উঠে যেই ভয়ঙ্কর দাঁতাল বন্য শূকর দেখতে পেল, অমনি আর্তচিৎকার করে আবারো পানিতে গড়িয়ে পড়ল। বিশালদেহী বন্য শূকরটি এবার তরুণীকে ধরার জন্য পানিতে নেমে তরুণীর দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

আজমীরের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল এই তরুণী কোন প্রেতাত্মা কিংবা জ্বীন পরী নয়– নিতান্তই মর্তের মানুষ। কমান্ডার ঘোড়ার লাগাম টেনে অশ্বপৃষ্ঠে এড়ি দিল। তাড়া খেয়ে ঘোড়া দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেল। কমান্ডার আজমীর বর্শাটিকে ডান হাতে নিয়ে নিশানা নিল। লক্ষ্যভেদী আঘাত হানতে হবে। কারণ, বন্য শূকর লাফিয়ে লাফিয়ে নর্তন-কুর্দন করে তীব্র গর্জন করে তরুণীকে শিকার করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। তরুণীকে ধরে ফেলবে ফেলবে অবস্থায় কমান্ডার আজমীর প্রচণ্ড জোরে শূকরের দিকে বর্শা নিক্ষেপ করলে বর্শাটি তীরের মতো উড়ে গিয়ে শূকরের পাঁজরে আমূল বিদ্ধ হল। বিকট চিৎকার করে শূকরটি লাফিয়ে উঠে পানিতে উল্টে পড়ল। বন্য শূকরটি আবারো পানি থেকে উঠে ঠাঁয় কয়েকটি চক্কর দিয়ে পানিতে ঢলে পড়ল।

আজমীর এক লাফে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দৌড়ে নদী থেকে তরুণীকে তুলে আনল। দাঁতাল বন্য শূকরটি তখনও পানিতে পড়ে ধীরে ধীরে গোংড়াচ্ছে আর পা ছড়িয়ে দাপাদাপি করছে।

তরুণী বেহুঁশ। তার সাথী তরুণীরা কোথায় পালিয়েছে পাত্তা নেই। আজমীর সংজ্ঞাহীন তরুণীকে পাজাকোলা করে এনে ঘোড়ার পিঠে শুইয়ে দিল এবং নদীর তীরে পড়ে থাকা কাপড়গুলো এনে তরুণীর উলঙ্গ দেহটা ঢেকে দিয়ে চৌকির দিকে রওনা হলো। সে বেহুঁশ তরুণীটিকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছিল আর মনে মনে ভাবছিল এই তরুণীদের পরিচয় উদ্ধার করতে পারলে হয়তো অনেক গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হবে।

আজমীর ভেবে কূল পাচ্ছিল না, এতো সুন্দরী এই তিন তরুণী এখানে কোত্থেকে এসেছে! আর ওর সাথীরাই বা কোথায় হারিয়ে গেছে। এই নির্জন জঙ্গলের মধ্যে এসে এরা নদীতে ঝাপাঝাপিই বা করছিল কোন উদ্দেশ্যে? এরা কি একবারও ভাবেনি, জঙ্গলের ভেতর থেকে যে কোন সময় কোন হিংস্র জন্তু এসে তাদের জন্য বিপদ হতে পারে? আকাশ-পাতাল ভাবনার কোন কিনার হওয়ার আগেই সংজ্ঞাহীন তরুণীকে নিয়ে চৌকিতে পৌছে গেল কমান্ডার আজমীর।

সেনাচৌকিতে পৌঁছানোর পর তরুণী ক্ষীণ কণ্ঠে আওয়াজ করল। তরুণী নিজে থেকেই শয়ন থেকে উঠতে চেষ্টা করছিল। কমান্ডার আজমীর তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে দিল। তরুণীর জ্ঞান ফিরে এসেছে। কিন্তু নিজেকে এই অচেনা সেনাচৌকিতে দেখে শূকর দেখার চেয়ে আরো বেশী ঘাবড়ে যাওয়ার ভাব চোখে মুখে ফুটে উঠলো। অত্যধিক ভীত হওয়ার কারণে তার মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো। আজমীর স্থানীয় ভাষায় কথা বললে বুঝতে পারল তরুণী। আজমীর তাকে পরিধেয় কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করে নিতে বলল।

"আপনিই কি আমাকে জংলী দাঁতাল শূকরের কবল থেকে বাঁচিয়েছেন?" ধরা গলায় আজমীরের উদ্দেশে বলল তরুণী।

"আমি যদি সেখানে না থাকতাম এবং আমার হাতে যদি বর্শা না থাকতো, তাহলে তোমার পক্ষে জীবন বাঁচানোই মুশকিল ছিল। এতোক্ষণে বন্য শূকরের আঘাতে তোমার ক্ষত-বিক্ষত দেহ নদীর স্রোতে ভেসে যেতো। আমিই সেই হিংস্র শূকরটিকে হত্যা করেছি। এখন আর তোমার কোন ভয়

নেই। তুমি নিরাপদ। তুমি যেখানে যেতে চাও তোমাকে নিরাপদে সেখানেই পৌঁছে দেয়া হবে। আতঙ্কিত তরুণীকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে বলল কমান্ডার আজমীর।

কাপড় পরার জন্য তরুণী অপর একটি খালি কক্ষে চলে গেল। আজমীর এতোক্ষণ দেখছিল তরুণীকে। মানুষও এতো সুন্দর হতে পারে? এ যেনো কল্পনাকেও হার মানায়!

কাপড় পরে ফিরে এসে তরুণী আজমীরের কাছে জানতে চাইলো, "এখন আমার সাথে কী ধরনের আচরণ করা হবে?"

"যার আশঙ্কা তুমি করছো, এমনটি করতে চাইলে সেই নদীর তীরেই আমি করতে পারতাম।" বলল আজমীর।

আমি তোমার সম্পূর্ণ উলঙ্গ শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। এখানে কোন বদ মতলবে তোমাকে নিয়ে আসিনি। তোমার জীবন রক্ষার তাগিদেই তোমাকে এখানে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। এখন বল, কোথায় যেতে চাও তুমি? যেখানে যেতে চাও, সেখানেই তোমাকে রেখে আসবো।"

"আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি এই এলাকার কোন লোক নও। তোমার কথাবার্তা এই এলাকার মনে হয় না। তোমার চালচলনও এই অঞ্চলের মানুষের সাথে মিলে না। তাছাড়া তুমি কোন গরীব গ্রাম্য বাবার সন্তানও নও।"

"আমি যদি আপনাদের কোন প্রশ্নেরই জবাব না দিই, তাহলে আমার সাথে কী আচরণ করা হবে?"

"তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া ছেড়ে দেবো না।" তোমাকে পবিত্র আমানতের মতো সযত্নে এখানে রাখবো।" বললো আজমীর।

খিক্ খিক্ করে হেসে ফেলল তরুণী। হঠাৎ সে আজমীরের সাথে এভাবে কথা বলতে শুরু করল, আজমীর তার কতো দিনের চেনা-জানা লোক। সে স্বেচ্ছায় আজমীরের কাছে নিজেকে সঁপে দিচ্ছিল।

তরুণীর এই বিগলিত ও স্বেচ্ছা সমর্পণের মনোভাব দেখে আজমীর বললো, "আমি একজন মুসলমান। আমি আমার সুলতান ও দায়িত্বের সাথে গাদ্দারী করতে পারি না। তুমি ভাবাবেগ সম্পর্কে আমাকে একটা পাথর মনে করতে পার।"

তরুণী আজমীরকে তার মায়াজালে আবদ্ধ করার জন্য আরো কিছু কৌশল প্রয়োগ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে পারল, প্রকৃতপক্ষেই আজমীর একটা পাথর।

অবশেষে তরুণী আজমীরের উদ্দেশ্যে বলল, আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। আমি যেমনটি আপনাকে ভেবেছিলাম, আপনি মোটেও তেমন নন। এখন আমার কর্তব্য আমার সত্যিকার অবস্থা আপনাকে জানানো। এরপর আপনার যা ইচ্ছা আপনি করতে পারেন।...

"আমি সেই প্রেতাত্মাদের একজন, যারা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সুন্দরী তরুণীর বেশে গোচরীভূত হয়। কিন্তু আমি প্রেতাত্মা নই মানুষ। আমার সাথে আরো যে দু'জন তরুণী ছিল, তারাও মানুষ। কালাঞ্জর দুর্গ আমাদের ঠিকানা। আমাদের অস্থায়ী ঠিকানা যেখান থেকে আপনি আমাকে উঠিয়ে এনেছেন, সেখান থেকে কিছুটা দূরের পাহাড়ের উপর। আজ রাত আমাদের উপর দায়িত্ব ছিল বিপরীত পাশে অবস্থিত পাহাড়ের উপর থেকে বিজলী চমকানো এবং আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণ ঘটানো।

"বিজলী চমকানোর রহস্যটা আসলে কী?"

"আপনি ইচ্ছা করলে ওইসব লোকদের পাকড়াও করতে পারেন। অবশ্য সমস্যা হলো, ওরা এতোক্ষণে হয়তো আমাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে। ওরা যদি আমাকে জীবিত বা মৃত উদ্ধার করতে না পারে, তাহলে তাদের গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তারা এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারে। আপনি কি এদের পাকড়াও করার ব্যাপারে কিছু ভাবছেন?"

'যেখান থেকে আমি তোমাকে তুলে এনেছি, আমি তোমাকে সেখানে ছেড়ে দিয়ে আড়ালে বসে থাকবো। ওরা হয়তো তোমাকে খুঁজতে আসবে, তখন ওদের আমি পাকড়াও করবো।" বলল আজমীর।

তুমি যদি আমাকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করো, তাহলে মনে রাখবে তুমি সব সময় আমার তীরের নিশানার মধ্যেই থাকবে।"

"আমি আপনাকে ধোঁকা দেবো না। আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। আমি আপনাকে এর প্রতিদান দেবো।"

কমান্ডার আজমীর তরুণীকে যেখান থেকে তুলে এনেছিল, সেখানে পৌঁছে দিল। আজমীরের বর্শার আঘাতে নিহত বন্য শূকরটি মরে সেখানেই পড়ে আছে। অল্প পানি থাকায় স্রোত সেটিকে ভাসিয়ে নিতে পারেনি।

তরুণী ছাড়া পেয়ে নদীর তীর ধরে উজানের দিকে অগ্রসর হতে এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাদের লোকজনকে তালাশ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর নদীর অপর তীরে দু'জন পুরুষকে দেখতে পেল তরুণী। তারা তরুণীকে ডাকল। তরুণী তাদেরকে হাতের ইশারায় এ পাড়ে আসার জন্য ডাকল। উভয়ে পাহাড়ী নদীর হাঁটুসমান পানি ভেঙে এ পাড়ে এসে তরুণীকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোত্থেকে এসেছো, এতোক্ষণ কোথায় ছিলে?"

এরা যখন দাঁড়িয়ে পরস্পর কথা বলছিল, তখন নদীর তীরের ঘন ঝোঁপের আড়াল থেকে চারসঙ্গী সিপাহীসহ আজমীর ময়দানে বেরিয়ে এলো। তরুণীর পরিচিত পুরুষ দু'জন আজমীরকে দেখে ঘাবড়ে গেল। আজমীরের হাতে তাক করা তীর-ধনুক। সে হুমকির স্বরে ওদের বলল, "পালাতে চেষ্টা করো না, যেখানে আছো, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক।"

আজমীরের হুমকি ও তার সাথে সশস্ত্র সঙ্গীদের দেখে তরুণীর দলের লোকজন ঘাবড়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। ইতোমধ্যে আজমীরের সাথীরা তাদের ঘিরে ফেলল।

"আমাদেরকে তোমাদের আস্তানায় নিয়ে চল।" তরুণীর দলের লোক দুজনকে নির্দেশের স্বরে বলল আজমীর।

তারা আজমীরের কথার কিছুই বুঝতে পারেনি এমন হাবভাব দেখিয়ে কৌশলে নির্দেশটি এড়িয়ে যাওয়ার ফন্দী করল। কিন্তু আজমীর তাদের বলল, কোন ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিলে তোমাদের হত্যা করা হবে। যদি ভালো চাও, তবে আমার নির্দেশ মতো তোমাদের আস্তানায় নিয়ে যাও।

আজমীরের কাছে তাদের সব চক্রান্তের জাল ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তরুণীকে তাদের আঞ্চলিক ভাষায় গালমন্দ ও তিরস্কার করতে লাগল দুই পুরুষ। "হারামজাদী, তুই আমাদের সবকিছু প্রকাশ করে দিয়েছিস!"

ওদের কথাবার্তায় পাত্তা না দিয়ে আজমীর তরবারী কোষমুক্ত করে তাড়া দিয়ে বলল, বাঁচতে চাও তো আগে আগে আমাদের নিয়ে চলো।

আজমীরের নির্দেশে আগে আগে পথ দেখিয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আরো গহীন জঙ্গলের দিকে যেতে লাগল লোক দুজন। কিছুক্ষণ পর লোক দু'জন একটি টিলার উপরের দিকে চড়তে লাগল। ঘন গাছ গাছালী ও লতাগুল্মে আকীর্ণ জায়গাটিতে কোন জনমানুষের পা পড়েনি। অনেকক্ষণ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠার পরও পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছানো গেল না। অনেকটা উপরে এসে দেখা গেল এ জায়গাটায় পাহাড় দেয়ালের মতো খাড়া। এ জায়গায় পাহাড়ের উপর শুকনো কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে একটি ঝুপড়ী। ঝুপড়ীর কাছে বিশাল একটি শুকনো কাঠের স্তূপ। ঝুপড়ীর বাইরে লোকজনের কথাবার্তা শুনে ঝুপড়ী থেকে দুই তরুণী বেরিয়ে এলো। আজমীর উভয় তরুণীকে নদীতে জলকেলী করতে দেখেছিল। এরা বাইরে বেরিয়ে তাদের লোকজনকে ঘিরে রাখা সৈনিকদের দেখে ঘাবড়ে গেল।

কমান্ডার আজমীর ঝুপড়ীতে উঁকি দিয়ে দেখলো, ঝুপড়ীর ভেতরে একটি বিশালকায় কাঠের ফ্রেমে স্বচ্ছ আয়না। আরো আছে আয়নার চেয়েও আরো বেশী স্বচ্ছ বিশালাকার গ্লাস।

"এগুলো কী?" পুরুষ দু'জনকে জিজ্ঞেস করল আজমীর।

"এগুলো কিছু না। আমরা এমনিতেই এদিকে এসেছি।"

পুরুষ দুজনকে টালবাহানা করতে দেখে বন্য শূকরের আক্রমণ থেকে প্রাণে বাঁচানো তরুণীর দিকে তাকাল আজমীর। এই তরুণী এর আগেই জীবন বাঁচানোর জন্য আজমীরের প্রতি কৃতজ্ঞ। সেই সাথে একান্তে পেয়েও তার সাথে কোন পাশবিক আচরণ না করে তাকে আমানতের মতো পবিত্র জ্ঞানে নিরাপত্তা দেয়ায় সে আজমীরের কাছে ওয়াদা করেছিল, তার কাছে তাদের সব রহস্যই প্রকাশ করে দেবে। প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনেকটাই ইতোমধ্যে পূরণ করেছে সে। বাকীটুকু পূরণ করতে সঙ্গী পুরুষদের উদ্দেশ্যে তরুণী বলল, এখন আর টালবাহানা করা নিষ্ফল। কারণ, আমাদের অনেক কিছুই জেনে গেছে এরা।

তারা কমান্ডার আজমীরকে উপরে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেল। পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে চতুর্দিকে তাকিয়ে আজমীর দেখতে পেল, গাছগাছালীর উপর দিয়ে তার চৌকি দেখা যাচ্ছে। গাছের ফাঁক দিয়ে আজমীর নদীর তীরের যে জায়গাটায় গিয়েছিল, সেই জায়গাটাও আবছা মতো দেখতে পেল।

আজমীরকে জানানো হলো, ওই যে শুকনো কাঠের স্তূপ দেখা যাচ্ছে, খাড়া পাহাড়ের এই জায়গায় রাতের বেলায় এই শুকনো কাঠের স্তূপে আগুন জ্বালানো হবে। এই আগুন পাহাড়ের নিচের গ্রামবাসীর দৃষ্টির আড়ালে থাকবে। এরপর বিশাল এই আয়নাটি সমতল পাহাড়ের যে জায়গাটায় তারা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে রাখা হবে। জ্বলন্ত আগুনে ঢেলে দেয়া হবে তেল। তাতে আগুনের শিখা বহু উঁচুতে উঠে যাবে। জ্বলন্ত আগুনের ঝলক পড়বে আয়নার উপর। তখন আয়নাটিকে দু'-তিনবার বিরতি দিয়ে সেনাচৌকি ও গ্রামের দিকে ঘুরানো হবে। জ্বলন্ত আগুনের ঝলক আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়ে সেনাচৌকি ও গ্রামে প্রতিফলিত হবে। খুব অল্প সময়ে আয়নাটি ঘুরানোর কারণে আয়নায় প্রতিবিম্বিত আলোর ঝলকানীকে অজ্ঞাত লোকের কাছে বিজলীর ঝলক মনে হবে।

এদের কথার মর্ম উপলব্ধি করা আজমীরের পক্ষে মোটেও কঠিন ছিল না। কারণ, তরুণী তাকে আগেই জানিয়েছিল, আজ রাত তাদের পরিকল্পনা ছিল গ্রামের উপর বিজলী চমকানো এবং পাহাড়ে আগুন জ্বালানো। কয়েক দিন আগে অন্য পাহাড় থেকে গ্রামের উপর বিজলী চমকানোর বিষয়টিও এখন আজমীরের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

"এটা বুদ্ধির খেলা" বলল দু' পুরুষের একজন।

রাতের অন্ধকারে আগুনের আলো এই আয়নায় প্রতিবিম্বিত হলে আলোর ঝলক সৃষ্টি করে। আর প্রতিবিম্বিত আলোকে পাহাড়ের নিচে বসবাসকারী গ্রামের লোকজন দেখে মনে করে আসমানের বিজলী। পাহাড়ের উচ্চতা সম্পর্কে জ্ঞাত লোকেরাও এটা ভাবতে পারে না, এই আলোর ঝলকানী পাহাড়ের চূড়া থেকে এসেছে। রাতের অন্ধকারে আলোর ঝলক দেখিয়ে দিনের বেলায় আমাদের প্রশিক্ষিত লোকজন গ্রামের মানুষের মধ্যে এই আলোকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের অলৌকিক কাহিনী প্রচার করে। আর লোকদের মধ্যে এসব কাহিনী বাতাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে, জন্ম নেয় কল্পনা আর অবাস্তবতা মিলিয়ে ভৌতিক সব কল্পকাহিনীর গুজব।

আমাদের লোকেরা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার ও অলৌকিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে প্রচারণা চালায়, দেবদেবীদের ধর্ম ত্যাগ করার কারণে দেবতাগণ তোমাদের উপর রুষ্ট হয়েছেন। তোমরা আবার স্বধর্মে ফিরে

না এলে গযব নেমে আসবে। বিভিন্ন রকম বিপদাপদে পতিত হবে তোমরা। এসব থেকে বাঁচার একটাই উপায়, তওবা করে আবার স্বধর্মে ফিরে এসো এবং দেবদেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য বেশী করে পূজা-অর্চনা করো।

লোকজন নির্জন স্থানে সুন্দরী উলঙ্গ পরীর বেশে যাদের দেখে প্রেতাত্মা কিংবা পরী মনে করেছে, এ তিন তরুণীই ছিল কথিত পরী বা প্রেতাত্মা। এরা এই এলাকার অধিবাসী নয়। লাহোর ও বাটান্ডার রাজমহলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশিষ্ট তরুণী এরা।

আল্লাহ তাআলা কমান্ডার আজমীরের বিগলিত মোনাজাত কবুল করেছেন। সে তার ঈমানের দ্যুতি এখন নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছে। তার কাছে সব অদ্ভুত ও আসমানী গজবের কাণ্ডকাহিনীর অন্তরালে এসব যোগীদের ভণ্ডামীর ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন বিভ্রান্ত নওমুসলিম গ্রামবাসীকে এ ব্যাপারে অবহিত করার প্রয়োজন বোধ করল কমান্ডার আজমীর। দুই যোগী পুরুষ ও তিন তরুণীকে পাকড়াও করে সেনাচৌকিতে এনে কঠোর প্রহরায় রাখল আজমীর। সেই সাথে তাদের জিজ্ঞেস করল, আর কোন কোন জায়গায় তাদের লোকজন এমন কাণ্ডকারখানা ঘটাচ্ছে?

* * *

এদিকে সেনাপতি সরওয়াগের কাফেলা পথে পাওয়া দুই গাইডের দেখানো পথে অগ্রসর হচ্ছিল। ইমাম সাহেব কয়েকবার দুই গাইডকে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন, কী ব্যাপার! এতো সময় লাগছে কেন? এতো দিনে তো আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার কথা!

জবাবে দুই গাইড ইমামকে বোঝালো, অত্যধিক নিরাপত্তার কারণে তারা দীর্ঘপথে অগ্রসর হচ্ছে। কারণ, এ পথটি সবচেয়ে নিরাপদ ও সহজ।

আসলে গাইডদের নিয়ে যাওয়া পথ মোটেও সহজ ছিল না। গাইডদ্বয় কাফেলাকে বিভ্রান্ত করে অচেনা দুর্গম দীর্ঘ পথে নিয়ে যাচ্ছিল।

একদিন রাতের বেলা এক জায়গায় বিশ্রাম করার জন্য যাত্রাবিরতি করল কাফেলা। তখন গাইড দু'জন কাফেলার প্রধান সরওয়াগকে জানাল, "আগামীকাল দ্বিপ্রহরের আগেই তারা গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। বিরতিহীনভাবে

দুর্গম পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করার ফলে কাফেলার সবাই ছিল খুবই ক্লান্ত। যাত্রাবিরতি দিয়ে হাল্কা কিছু খাওয়া-দাওয়ার পর গা এলিয়ে দিতেই সবাই ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

সকালে যখন তাদের ঘুম ভাঙল, তখন উভয় গাইড উধাও। খোঁজাখুঁজি করে তাদের কোথাও পাওয়া গেল না। খোঁজাখুঁজি করাও সহজ ছিল না। চতুর্দিকে উঁচু পাহাড়। ঘন ঝোঁপ-ঝাড়ে ঢাকা পাহাড়। গাছ গাছালী ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। তারা কোথায় এসেছে, কোন দিকে যেতে হবে কিছুই জানে না তারা। যে পথে এসেছে এই পথে ফিরে যওয়া ছাড়া আর কোন পথ তাদের জানা নেই।

আফসোস! হিন্দুদের চক্রান্তের শিকার হয়েছি আমরা। এরা দু'জন জানতো, আপনি আমাদের এই এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নানা গল্প বলছিলেন, এরা এই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়েছে। ইমামের উদ্দেশ্যে বললেন সেনাপতি সরওয়াগ।

"আমরা যখন বালনাথ দুর্গের পাশ দিয়ে আসছিলাম, তখন আমি দু'জন অশ্বারোহীকে দূরে দেখতে পেয়েছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, ওরা হয়তো কোন পথিক। কে জানে ওরাই কি সেই পথিক কি-না!" বললো এক সিপাহী।

"প্রথম যখন আমরা সাপ দেখি, তখন আমি ওদের দেখেছিলাম, কিন্তু তাদের চেহারা দেখা যাচ্ছিল না।" বললো অপর এক সিপাহী।

"তোমাদের দেখা লোকেরা এরাই হোক বা অন্য কেউ হোক, তাতে কী আসে যায়?" বললেন সারওয়াগ। আসল কথা হলো, আমরা এক ভয়ানক প্রতারণার শিকার হয়েছি। এখন এখান থেকে কিভাবে বের হওয়া যায় চিন্তা কর। আর একটা কাজ কর, আমাদের পুটলীতে খাওয়ার মতো যা কিছু আছে সব ফেলে দাও। এতে ওরা বিষ মিশিয়ে রেখে যেতে পারে। সেনাপতির নির্দেশে খাবার যা কিছু ছিল বিষ সব ফেলে দেয়া হলো।

এবার শুরু হলো অজানা-অচেনা পথে কঠিন এক সফর। এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে সারা দিন কেটে গেল। রাতটা কোনমতে কেটে গেল বটে; কিন্তু অত্যধিক ঠাণ্ডায় কেউই স্বস্তি পেল না। পরদিনও এভাবেই অজানা অচেনা পথে ঘুরে ঘুরে কেটে গেল। পরদিন রাতে যে সময় সারওয়াগের কাফেলা ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য একটু উষ্ণ জায়গা খুঁজছিল, ঠিক সেই সময় প্রতারক দুই

হিন্দু গাইড লোহাকোট দুর্গে বসে দুর্গপতির কাছে তাদের কাজের বর্ণনা দিচ্ছিল, কিভাবে তারা সারওয়াগের কাফেলাকে অচেনা পাহাড়ী জায়গায় ফেলে এসেছে। সেখান থেকে ওদের বেরিয়ে যাওয়া মোটেও সহজ ব্যাপার নয়।

"তোমরা ওদের হত্যা করে এলে না কেন?" দুর্গপতি আফসোস করে বলল। সুলতান মাহমূদ কোন সাধারণ লোককে আঞ্চলিক কমান্ডারের দায়িত্ব দেয়নি। তোমরা খুবই মূল্যবান শিকার হাতে পেয়েছিলে। তোমাদের কাজে আমি খুবই খুশী। কিন্তু ওদের ইহলীলা সাঙ্গ করে আসতে পারলে বেশী খুশী হতাম।'

"কালাঞ্জর থেকে আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কোন মুসলমান সেনাকে যেন কেউ হত্যা না করে। আমরা জানি না এ নির্দেশ কেন দেয়া হয়েছে। নয়তো খুব সহজেই আমরা ওদের খাবারে বিষ মিশিয়ে দিতে পারতাম।

"কালাঞ্জরের মহারাজা ভেবেচিন্তেই বলেছেন, তিনি হয়তো সুলতান মাহমূদকে এই বার্তাই দিতে চান, চুক্তি অনুযায়ী এখানে তার সৈন্যরা নিরাপদেই আছে। তবে তারা নিজেরাই যদি অচেনা জায়গায় গিয়ে ঘুরে ঘুরে মারা যায়, তাতে আমাদের কি করার আছে?"

আসলেও তাই হলো। সারওয়াগকে তার কাফেলাসহ অচেনা পথে ঘুরে ঘুরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া থেকে কে রক্ষা করবে? তারা নিজেরাই তো ওখানে গিয়েছে। দুদিন একটানা ঘুরেও তারা না পেল কোন পথের সন্ধান, না পেল কোন জনবসতির চিহ্ন। দূরে কাছে কোথাও কোন জনমানবের চিহ্ন তাদের চোখে পড়ল না। পানাহারবিহীন এই নির্জন জঙ্গলে প্রায়ই তাদের চোখে পড়ে জোড়ায় জোড়ায় পাহাড়ী বাঘ। সিংহের গর্জনও কানে আসে। পৃথিবীর এতো সৌন্দর্যমণ্ডিত মায়াবী এই জমিন তাদের কাছে এখন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হলো।

খুবই কার্যকর একটা চাল দিয়েছে হিন্দু চক্রান্তকারীরা। সারওয়াগ ছিলেন এই এলাকার আঞ্চলিক সেনাপ্রধান। প্রধান সেনাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে নওমুসলিমদেরকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য তারা যে চক্রান্তের আয়োজন করেছিল, সারওয়াগের অনুপস্থিতিতে সেই কর্মকাণ্ড চালানোর প্রধান প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেল। হিন্দু যোগী-সন্ন্যাসী ও পুরোহিতরা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে খুবই দক্ষ ও নিপুণ। মন্দিরগুলোতে পুরোহিতরা পূজারীদের

বলতে লাগল, গোমা-তা যেমন পবিত্র, মুসলমানরা তেমনই অপবিত্র। মুসলমানদের হত্যা করে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা ধর্মের প্রধান কাজ। মন্দিরের পুরোহিতরা মুসলমান হত্যাকে ধর্মের সবচেয়ে বড় পুণ্যের কাজ বলে ঘোষণা করে। সেই দিনের পুরোহিত আর নব্য ভারতের হিন্দু নেতাদের নীতির আদর্শের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আজো ভারতকে মুসলমানশূন্য করার ব্যাপারে সকল হিন্দুই এক ও অভিন্ন মত পোষণ করে।

১০১৪ খৃস্টাব্দের একদিন। রাজা নন্দরায় কালাঞ্জর দুর্গে বসে দুষ্কৃতকারী দলপতির কাছ থেকে তাদের কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট শুনছিলেন। রাজা নন্দরায় দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা বিজিত এলাকাসমূহের নওমুসলিমদের বিভ্রান্ত করে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা এবং মুসলিম শাসকদের উৎখাত করার চক্রান্তের জাল বুনেছিলেন, তা মুসলিম সৈন্য ও শাসকদের কাছে ধরা পড়ে যায়। তারা যাদুটোনা এবং সুন্দরী নারীদেরকে প্রেতাত্মারূপে গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের কাছে হিন্দু দেবদেবীদের গযবের আলামত হিসেবে উপস্থাপন করতে পাহাড়ের উপর থেকে কৃত্রিম আলো ফেলে বিজলী তৈরী করে। দুষ্কৃতকারী দলের নেতা বলছিলো, আমাদের প্রশিক্ষিত দলের দুই পুরুষ সদস্য ও তিন কিশোরীকে মুসলিম সৈন্যরা আসবাবপত্রসহ পাকড়াও করেছে এবং তাদেরকে গ্রামে গ্রামে নিয়ে গিয়ে মানুষকে সবকিছু দেখিয়ে বলেছে, এরাই হলো তোমাদের দেখা আসমানী গজবের প্রতীকী প্রেতাত্মা আর এইসব আসবাব হলো আসমানী বিজলীর রসদ।

কমান্ডার আজমীর যে কয়জনকে গ্রেফতার করেছিল, তাদের জীবন ভিক্ষা এবং বিনা শাস্তিতে মুক্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কুচক্রী দলের অন্য সদস্যদেরও ঠিকানা-পরিচয় জেনে নিয়েছিল।

তরুণীকে ব্যবহার করে আজমীর তার পুরুষ ও অন্য সাথীদের যেভাবে পাকড়াও করে, ঠিক একই কৌশলে অন্যান্য কুচক্রীদেরও সে পাকড়াও করতে সমর্থ হয়।

একদিন আজমীর কয়েক গ্রামের লোকজনকে একত্রিত করে কুচক্রী দলকে তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে বলতে বাধ্য করল, এ পর্যন্ত দেবদেবীদের নামে তাদের কাছে যা প্রচার করা হয়েছে, তার সবই ছিলো শুধুই গুজব, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। গ্রামের অনেকেই অপকর্মকারীদের চিনে ফেলল। চক্রান্তকারীরা গ্রামের

লোকদের কাছে তাদের আসল পরিচয় প্রকাশ করে দেয়। সন্ধ্যার পর আজমীর কুচক্রীদেরকে রাতের বিজলী চমকানোর মহড়া দিতে এবং তরুণীদেরকে প্রেতাত্মারূপে অবির্ভূত হয়ে দেখাতে বাধ্য করে।

মহারাজা নন্দরায় যখন দেখতে পেলেন, তার চক্রান্ত ভন্ডুল হয়ে গেছে, তখন তিনি যেসব ইমাম ও প্রশিক্ষক নওমুসলিমদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছে এবং ইবাদত-বন্দেগীর তালিম দিচ্ছে, তাদের হত্যা করে লাশগুলো এমনভাবে গুম করার নির্দেশ দেন, যাতে এর কোন আলামত কেউ খুঁজে না পায়। যেসব ক্যাম্পে গযনী বাহিনীর সৈন্যরা অবস্থান করছে, তাদেরকে ক্যাম্প থেকে একজন দু'জন করে বিচ্ছিন্ন করে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলার নির্দেশ দেন রাজা নন্দরায়।

এক রাতে আজমীর তার ক্যাম্পের একটি কক্ষে একাকী বসে ছিল। তার পাশেই একটি কক্ষে চক্রান্তকারী পুরুষ ও তরণীদের আটকে রাখা হয়েছিল। ওদের কক্ষের সামনে কমান্ডার আজমীর প্রহরার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। বন্দীদের একথাও বলে দিয়েছিল সে আগামীকালই তোমাদের দলের পুরুষদের বালনাথ পাঠিয়ে দেয়া হবে। আঞ্চলিক কমান্ডার সেনাপতি সারওয়াগের হাতে তোদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। আর তরুণীদেরকে সেনাপ্রহরায় কালাঞ্জর পাঠিয়ে দেয়া হবে।

রাতের মধ্যভাগে এক সিপাহী কমান্ডার আজমীরকে এসে জানালো, এক বন্দী তরুণী আপনার সাথে কথা বলতে চায়।

কমান্ডার আজমীর তরুণীকে ডেকে পাঠাল। সে যে তরুণীকে নদী থেকে তুলে এনেছিল, সে-ই ছিল সাক্ষাত প্রত্যাশী।

"সম্মানিত কমান্ডার, আজ রাতেও কি আপনি আমাকে কাছে ডাকবেন না? অন্তত আজ রাতটি আপনার কাছে কাটাতে ইচ্ছে করছে আমার।"

তরুণীর কথায় হাসি পেল আজমীরের। সে বলল, আমি অনুভব করি, তুমি অস্বাভাবিক সুন্দরী। আল্লাহর কসম, তোমার মতো রূপসী নারী আমি জীবনে দ্বিতীয়টি দেখিনি। তোমার বিস্মিত হওয়ার বিষয়টিকে আমি বুঝি না এমন নয়। আমার মতো একজন যুবকের পক্ষে দীর্ঘদিন স্ত্রীসঙ্গবিহীন জীবন কাটানোর পর তোমার মতো রূপসীকে হাতের নাগালে পেয়ে একটুও আকৃষ্ট না হওয়ার ব্যাপারটি তোমাকে অবাক করেছে। অথচ তোমরা প্রত্যাশা কর, আমি

তোমাদের রূপের প্রতি আকৃষ্ট হই। কিন্তু তুমি যদি আমার মতো মুসলমান হতে, তোমার উপরে যদি আমার মতো এমন কঠিন দায়িত্ব ন্যস্ত থাকতো, তুমি যদি ঈমানের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হতে, তাহলে আর তোমার কাছে ব্যাপারটি অস্বাভাবিক মনে হতো না। তোমাদের দৃষ্টি মানুষের দেহের প্রতি, এটা তোমাদের ধর্মের শিক্ষা আর আমাদের দৃষ্টি থাকে আত্মার প্রতি। আত্মাকে কেন্দ্র করেই আমাদের ধর্মবিশ্বাস আবর্তিত। এটাই আমাদের ধর্মের শিক্ষা।"

"তোমার ভালোবাসা পেতে আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই?"

"কালনাগিনীর বিষ খুলে নিলেও সে কালনাগিনীই থাকে। তাকে যদি মধুও পান করাও, তবুও তার দেহে বিষই উৎপাদিত হবে এবং এক সময় ঠিক নাগিনীর মতোই ছোবল মারবে। কারণ, এটাই তার ধর্ম।..."

আমি এখানে প্রেমপ্রীতির খেলা আর বিয়ে-শাদী করে সুন্দরী নারী নিয়ে ফুর্তি করতে আসিনি। তোমার এই অপরূপ সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় দেহবল্লরীর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। এটা আমার ঈমানের শক্তি। এ কারণে আমার দৃষ্টি নিজের যৌবনের প্রতি যেমন পড়ে না, তদ্রূপ তোমার মতো রূপসীর দেহবল্লরীর প্রতিও আমি আকর্ষণ বোধ করি না। শোন সুন্দরী ! আমার ধর্ম আমাকে শিক্ষা দিয়েছে, শত্রুপক্ষের কোন অবলা নারী যদি তোমাদের হাতে বন্দী হয়, তখন তাদের অসহায়ত্বের সুযোগে তাদের রূপরসের স্বাদ নেয়া মহা অপরাধ। নারী বন্দীদেরকে তোমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে রাখবে।"

আজমীরের কথা শুনে তরুণীর চোখে পানি এসে গেল। সে আজমীরের চৌকিতে তার সাথে গা মিশিয়ে বসল। আজমীরের কাঁধে একটি হাত রেখে তরুণী এমনভাবে তার শরীরে গা এলিয়ে দিয়ে বসল যে, তার এলো চুলগুলো আজমীরের নাকে-মুখে স্পর্শ করছিল। বিগলিত কণ্ঠে তরুণী আজমীরকে বলল–

"আপনি আমাকে বন্য শূকরের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছেন। এখন আপনি আমাকে মুক্ত করে পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে আমার ঠিকানায় পৌঁছে দিতে চাচ্ছেন। এতোটা দিন আমাদের মতো তিনটি যুবতী মেয়ে সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার উপর আপনার দয়া-অনুগ্রহে কাটালাম, তারপরও আপনি আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তো দূরে থাক আমাদের রূপ যৌবনের প্রতি একটু গভীরভাবে তাকিয়েও দেখেননি। আপনি পাথর হয়ে রইলেন....।"

কথা বলতে বলতে নীরব হয়ে গেল তরুণী। এক পর্যায়ে দুহাতে আজমীরের চেহারা তার দিকে ঘুরালো। মমতা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আজমীরের প্রতি তার আত্মনিবেদনের ভাব তরুণীর চোখে-মুখে ফুটে উঠলো।

হঠাৎ তরুণী বললো, "আমি তাজা রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে আপনি কোন গভীর বেদনায় আক্রান্ত। আজমীর, আপনি কি আহত?"

আস্তে করে বামহাতটি উপরে উঠালো আজমীর। তার হাতে একটি ধারালো খঞ্জর। খঞ্জরের অগ্রভাগ রক্তমাখা। তরণী তার ডানপাশে বসে ছিল। সে দেখতে পায়নি, সে যখন আজমীরের গলা জড়িয়ে গায়ে গা এলিয়ে দিয়ে আজমীরের দেহে কামনার আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করছিল, এই প্রমোদনা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য অতি সন্তর্পণে আজমীর তার কোমরে রক্ষিত খঞ্জর কোষমুক্ত করে ধীরে খোলাপায়ের উপরিভাগে বিদ্ধ করল। তরুণী রক্তমাখা খ র দেখে বসা থেকে উঠে আজমীরের মুখোমুখি দাঁড়াল। তখন আজমীরের পায়ের ক্ষতস্থানের দিকে তার নজর পড়ল। ফিনকী দিয়ে সেখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। অবাক বিস্ময়ে সেদিকে কতোক্ষণ তাকিয়ে রইল তরুণী।

"এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই সুন্দরী।" আমি মানুষ, ফেরেশতা নই। আমি পুরোপুরি সক্ষম একজন যুবক। তোমার শরীরের স্পর্শ ও রেশমী চুলের ছোঁয়া আমাকে স্বীয় কর্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছিল। আমি শুধু সুলতানের চাকুরী করি না, আল্লাহর দরবারেও আমার কর্তব্য সম্পর্কে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। এ ভূখণ্ডে একজন সুলতান আর মহারাজাদের সংঘাত রাজ্য দখল নিয়ে নয়, এটি সত্য ও ন্যায় এবং অসত্য ও অন্যায় মতবাদের সংঘাত।

আমি সাময়িক একটু সুখ ভোগের জন্য আমার আজীবন লালিত স্বপ্ন ও আদর্শকে জলাঞ্জলী দিতে পারি না। তোমার রূপ-সৌন্দর্য ও সমর্পিত নিবেদন উপেক্ষা করে মনের মধ্যে চাপও সৃষ্টি করতে চাই না। এজন্য তোমার দিকে থেকে দৃষ্টি ফেরাতে নিজের পায়েই খঞ্জর বিদ্ধ করেছি।... ঠিক আছে তুমি এখন নিজের কক্ষে চলে যাও।...

তরুণী আজমীরের একটি হাত টেনে নিয়ে তার চোখে স্পর্শ করাল এবং তাতে চুমো খেয়ে নিজ কক্ষে চলে গেল।

পরদিন সকালে তিন তরুণীকে তিনটি ঘোড়ায় সওয়ার করে দশজন অশ্বারোহী সহযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে কমান্ডার আজমীর কালাঞ্জরের পথে রওনা

হয়ে গেল। তরুণীরা বারবার তাদের ঘোড়া আজমীরের ঘোড়ার পাশে নিয়ে আসছিল। কিন্তু আজমীর তাদের প্রতি মুচকি হাসি উপহার দেয়া ছাড়া কোন কথা বলেনি।

মধ্যরাতের পরে কালাঞ্জর দুর্গের প্রধান ফটকের সামনে পৌঁছলো আজমীরের কাফেলা। দুর্গের অনতিদূরে তরুণীদের নামিয়ে দিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে আসতে উদ্যত হলো আজমীর।

জীবন বাঁচানোর কৃতজ্ঞতায় আজমীরের কাছে নিজেকে সমর্পণকারী মেয়েটি আজমীরের পথ আগলে দাঁড়িয়ে বিনীত কণ্ঠে বললো, "আপনার উপকারের কোন প্রতিদান আমি দিতে পারিনি। আমার দেহ ছাড়া আপনাকে দেয়ার মতো আর কিছু ছিলো না আমার। এজন্য আজীবন একটা দুঃখবোধ আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে।"

"আমি কোন প্রতিদান চাই না। আমাকে আমার প্রভু উত্তম প্রতিদান দিবেন। তুমি তোমাদের রাজাকে গিয়ে বলো, যুদ্ধ হয় রণাঙ্গনে পুরুষে-পুরুষে। নারীকে দিয়ে কখনো যুদ্ধ জেতা যায় না।"

সহযোদ্ধাদের নিয়ে ফিরে আসার পথে আজমীরের মন ছিল ফুরফুরে। আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে নিজেকে সমর্পণ করার পর আল্লাহ তার আবেদন মঞ্জুর করেছেন। তার ঈমানের নূর সে প্রত্যক্ষ করেছে। সেই সাথে অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালন করতে পেরেছে সে।

এদিকে সেনাপতি সারওয়াগ অচেনা পাহাড়ের ঘূর্ণিপাকে ঘুরে ঘুরে হয়রান। তিন-চারদিন বিরতিহীন ঘুরে-ফিরেও পাহাড়ের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছার কোন পথ পায়নি তারা। এই এলাকায় যদি খাওয়ার উপযোগী সুমিষ্ট ফলজ গাছের সমারোহ এবং সুপেয় পানির প্রাচুর্যতা না থাকতো, তাহলে এতোদিনে তাদের পক্ষে জীবন বাঁচানোই অসম্ভব হয়ে যেতো।

লোহাকোট দুর্গের হিন্দু রাজাকে প্রথম এ খবরটি দেয়া হলো যে, বালনাথ দুর্গের মুসলিম দুর্গপতি এবং গযনী সুলতানের আঞ্চলিক প্রশাসক সেনাপতি সারওয়াগ একজন ইমাম ও কয়েকজন সৈন্য নিয়ে পাহাড়ের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাদেরকে হিন্দুরা বিভ্রান্ত করে পাহাড়ের মধ্যে এনে ছেড়ে দিয়েছে। লোহাকোট দুর্গের দুর্গপতি কালবিলম্ব না করে এ খবরটি রাজা নন্দরায়কে জানাল। রাজা নন্দরায় এ খবর শুনেই নির্দেশ দিলেন, ওদের সবাইকে পাকড়াও করে দুর্গে নিয়ে আসা হোক।

এক দিন পর পার্শ্ববর্তী একটি মুসলিম সেনাচৌকির এক সিপাহী কমান্ডার আজমীরের চৌকিতে এসে সেই চৌকির কমান্ডারের পক্ষ থেকে জানাল–

"আমি খবর পেয়েছি, কালাঞ্জর দুর্গের একটি সেনাদল আমাদের সেনাবাহিনীর একটি ছোট্ট কাফেলাকে গ্রেফতার করে কালাঞ্জর নিয়ে যাচ্ছে। আমার পক্ষে এটা জানা সম্ভব হয়নি যে, এই মুসলিম সৈন্যরা কারা এবং কোন চৌকির সৈনিক? আমি ওদের উদ্ধার করতে যাচ্ছি, কিন্তু আমার জনবল খুবই কম। যথাসম্ভব জনবল দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করুন।"

"সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তার চৌকির বাছাই করা দশজন সিপাহীকে নিয়ে আজমীর নিজেই রওনা হলো। পথ ছিল দুর্গম এবড়ো-থেবড়ো। তারপরও আজমীর ও সাথীরা চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে সংবাদ প্রেরণকারী চৌকির কমান্ডারের কাছে পৌঁছে গেল।

গযনী বাহিনীর কয়েকজন সদস্যক কালাঞ্জরের সৈন্যরা গ্রেফতার করার খবরটি দিয়েছিল স্থানীয় একজন অধিবাসী। সে জানালো, হিন্দুদের দলের সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ-ষাটজনের কম হবে না। আজমীর ও সংবাদদাতা কমান্ডার ত্রিশজন সিপাহী নিয়ে উদ্ধার অভিযানে রওনা হলো। সংবাদদাতা লোকটিই ছিল তাদের গাইড। বেশী দূর যেতে হলো না তাদের। ঘণ্টাখানিক অগ্রসর হওয়ার পর ময়দান পেরিয়ে একটি পাহাড়ী উপত্যকায় পৌঁছে তারা দেখতে পেল হিন্দুবাহিনীর বেষ্টনীতে গমনকারী কয়েকজন মুসলিম যোদ্ধাকে। দূর থেকেই তারা সেনাপতি সারওয়াগকে চিনতে পারল। সেই সাথে অন্য সিপাহীরাও ছিল তাদের পরিচিত।

কাছাকাছি গিয়ে আজমীর হিন্দুদের শাসিয়ে বলল, "বন্দীদের এখানেই ছেড়ে দিয়ে তোমরা চলে যাও।"

হিন্দুরা আজমীরের হুমকির কোন মৌখিক জবাব না দিয়ে মোকাবেলার প্রস্তুতিতে সারিবদ্ধ হয়ে গেল। সাথে সাথে আজমীরের নেতৃত্বে সহযোদ্ধারা হিন্দুদের উপর হামলে পড়লো। হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষের সবাই ছিল অশ্বারোহী। হিন্দুদের হাতে বন্দী সারওয়াগের সাথীদের সবাইকে ওরা পায়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করেছিল। শুরু হয়ে গেল দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ। অল্পক্ষণের মধ্যে বন্দীদেরকে মুক্ত করতে সক্ষম হলো আজমীরের দল। উভয় পক্ষের মধ্যেই হতাহতের ঘটনা ঘটলো।

এক পর্যায়ে হিন্দুবাহিনী পালিয়ে গেলে বন্দীদশা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত সারওয়াগ ও তার সাথীরা নিহত যোদ্ধাদের ঘোড়াগুলো ধরে সেগুলোতে সওয়ার হয়ে নিকটবর্তী মুসলিম সেনাচৌকির দিকে রওয়ানা হলো। কিন্তু এই দলের মধ্যে কমান্ডার আজমীরকে দেখা গেল না।

কমান্ডার আজমীরের ঘোড়া আহত হয়ে রণাঙ্গন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। আজমীর ঘোড়া না ছেড়ে এটিকে নিয়ে চৌকিতে ফেরার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পলায়নপর সাত-আটজন হিন্দু সৈন্য পেয়ে গেলো তাকে। ওরা আজমীরকে একাকী পেয়ে ঘেরাও করে ফেলল। ঘোড়াটি দুর্বল হয়ে পড়ায় তার পক্ষে পালানো সম্ভব ছিলো না। একাকী এতোজনের মোকাবেলা করাও সম্ভব ছিলো না তার। অগত্যা অসহায় আজমীরকে গ্রেফতারী বরণ করতে হলো। হিন্দুরা তাকে ঘোড়ার পিঠে বেধে কালাঞ্জর নিয়ে গেল। পথিমধ্যে আরো হিন্দু সৈন্য এদের সাথে মিলিত হলো। তারাও দু'জন মুসলিম সৈন্যকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছিল।

মুহূর্তের মধ্যে দুর্গে রটে গেল, কয়েকজন মুসলিম সৈন্যকে বন্দী করা হয়েছে। রাজমহলের ভেতরের রক্ষিতা ও নর্তকীদের কাছে চলে গেল মুসলিম সৈন্য গ্রেফতার করে আনার খবর। বন্য শূকরের আক্রমণ থেকে আজমীরের উদ্ধার করা নর্তকী এ খবর শুনে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে এলো। কারণ, মুসলমান সৈন্যদের বন্দীশালায় বেশ কিছুদিন কাটিয়েছে সে। মুসলমানদের উন্নত মানসিকতা, ধর্মনিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা ও সর্বোপরি আদর্শের পরাকাষ্ঠা সে গযনী বাহিনীর মধ্যে দেখেছে। এখন সেই গযনী বাহিনীর সৈনিককে হিন্দুদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার খবরে সে তাদের নিজ চোখে দেখার আগ্রহ দমাতে পারলো না। কমান্ডার আজমীরের বীরত্ব, হৃদ্যতা, মানবিকতা, উন্নত নৈতিকতার কারণে গোটা গযনী বাহিনীর প্রতিই সেই তরুণীর হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তির আসন সৃষ্টি হয়েছিল। ধর্মীয় চাপে মুসলমানদের প্রতি যতই হিংসা থাকুক না কেন, হৃদয়ের গভীরে শ্রদ্ধার আসনটিকে সে সরিয়ে দিতে পারছিলো না। তাই নিজ চোখে মুসলমান বন্দীদের দেখার জন্য যখন সে বন্দীদের কাছে পৌঁছল, আজমীরকে দেখে হতচকিয়ে গেল তরুণী, তখন মুহূর্তের মধ্যে সে সিদ্ধান্ত নিল, যে লোক হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে, তাকে বাঁচাতে আমি সম্ভাব্য সব কিছুই করবো। যেই ভাবনা সেই কাজ।

হিন্দু সৈনিকদের কমান্ডারকে হাতের ইশারায় একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে তরুণী তার কানে কানে আজমীরকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলো। সে কমান্ডারকে জানালো, এই মুসলিম সৈনিক কিভাবে তার জীবন বাঁচিয়েছিলো এবং এর প্রতিদানে নিজেকে পেশ করার পরও সে তা গ্রহণ করেনি। তরুণী কমান্ডারকে বললো, তুমি এ কাজ করলে তোমাকে প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশী পুরস্কার দেবো এবং তাকে এমনভাবে দুর্গের বাইরে পাঠাবো যে, কেউ ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারবে না।

তখনও পর্যন্ত বন্দীরদেরকে কোন সরকারী উচ্চ মহলের কাছে পেশ করা হয়নি। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেছে। বন্দীদেরকে তখন বন্দীশালায় রেখে দেয়ার কথা। হিন্দু কমান্ডারকে ছলে-বলে-কৌশলে আজমীরের মুক্তিদানে সম্মত করিয়ে তরুণী অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আজমীরকে একটি ঘন ঝোপ-ঝাড় ও গাছগালাছীর আড়ালে নিয়ে গেল। আজমীরকে এখানে বসিয়ে রেখে তরুণী দৌড়ে চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে কিছু কাপড় ও একটি ঘোড়া নিয়ে এলো। তাড়াতাড়ি আজমীরের গায়ে পরিয়ে দিল হিন্দু ঋষি-পুরোহিতদের কাপড় এবং তাকে একজন বয়স্ক পুরোহিতের পোশাকে সজ্জিত করে মাথায় বিশেষ পাগড়ী বেধে দিল এবং ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অগ্রসর হতে বলে নিজে আগে আগে চলল।

শাহী নর্তকী এগিয়ে গিয়ে প্রধান ফটকে প্রহরারত দায়িত্বশীল অফিসারকে বললো, "বাবাজি আমাদের কাছে এসেছিলেন। এখন জরুরী কাজে তাকে দুর্গের বাইরে অবস্থিত কাছের গ্রামে যেতে হচ্ছে। সেখানে দু'জন লোক মারা গেছে। তিনি পৌছুলে পরেই শুরু হবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। অন্দরমহল থেকে আমাকে দ্বার খুলিয়ে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে।"

দ্বাররক্ষী জানতো, এই তরুণী রাজমহলের নর্তকী। রাজপ্রাসাদ ও মহলে এই তরুণী প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কেও অবহিত দ্বাররক্ষী। তাই কোন ধরনের দ্বিধা-চিন্তা না করে দ্বার খুলে দিল সে। পুরোহিতবেশী আজমীর বিনা বাধায় ফটক পেরিয়ে গেল। তাকে বের করে দিয়ে পুনরায় বন্ধ করে দিল ফটক। আজমীর দুর্গ থেকে বেরিয়ে ঘোড়া না হাঁকিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো। দুর্গ থেকে অনেক দূরে গিয়ে সে পুরোহিতের বেশধারী জামা খুলে ফেলল এবং পেট মোটা করার জন্য জামার নিচে গুঁজে দেয়া কাপড়ও ছুঁড়ে ফেলে দিল। মাথার

বিশেষ পাগড়ীও ফেলে দিয়ে স্বাভাবিক হয়ে চৌকির উদ্দেশ্যে ঘোড়া হাঁকাল আজমীর।

একটানা ঘোড়া হাঁকিয়ে পরদিন অপরাহ্নে নিজের চৌকিতে পৌঁছল আজমীর। সেনাপতি সারওয়াগ ও তার যেসব সঙ্গী হিন্দুদের হাতে বন্দী হয়েছিল, তাবা মুক্ত হয়ে আজমীরের সেনাচৌকিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কারণ, সব কাছের চৌকির মধ্যে আজমীরের চৌকিই ছিল সবচেয়ে মজবুত ও নিরাপদ।

"আরে আজমীর যে! এ দু'দিন তুমি কোথায় ছিলে? এখন কোথেকে এলে? দুদিন পর আজমীরকে চৌকিতে ফিরতে দেখে জানতে চাইলেন সেনাপতি সারওয়াগ।

"আগে জরুরী কথা শুনুন।" বললো কমান্ডার আজমীর। আমার ঘোড়া অচল হয়ে গিয়ে আপনাদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম। আমার একাকীত্ব ও ঘোড়ার অচলাবস্থা আমাকে বন্দিত্ব বরণ করতে বাধ্য করে। একজনের সহায়তায় আমি কালাঞ্জর দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছি। এখানকার অবস্থা খুবই খারাপ। কালাঞ্জরের রাজা এখানকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রেখেছিল, আপনি তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আল্লাহর মেহেরবানী যে, তাদের এ চক্রান্ত ভণ্ডুল হয়ে গেছে। আপনাকে গ্রেফতার করে কালাঞ্জর নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাই প্রমাণ করে, এখানকার ছোট ছোট সব হিন্দু রাজারা আর আমাদের করদরাজা হিসেবে থাকতে রাজি নয়। এরা গোপনে সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছে। কালাঞ্জর দুর্গ থেকে আমি জানতে পেরেছি, কালাঞ্জর দুর্গে দু-তিনজন রাজার সকল সৈন্য একত্রিত হচ্ছে। লাহোরের মহারাজা ভীমপাল নিজে বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কালাঞ্জর দুর্গে আসছেন। সম্ভবত সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ড ভীমপালের হাতে থাকবে। মহারাজারা কালাঞ্জর দুর্গে একত্রিত হয়েই সুলতানকে কর দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে পয়গাম পাঠাবে। এরপর আমাদের ছোট ছোট চৌকিগুলো ধ্বংসের কাজ শুরু হবে।"

"এমনটা হওয়াই তো স্বাভাবিক।" বললেন সেনাপতি সারওয়াগ। যে কোন পরাজিত শক্তি প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করতেই পারে। হিন্দু এমন এক দ্বিমুখী জাতি যে, এরা পরাজয় অবশ্যম্ভাবী মনে হলে তোমার সামনে তরবারী

ফেলে দিয়ে পায়ে পড়ে, ভিক্ষুকের মতো প্রাণভিক্ষা চাইবে। তখন যদি ওদের মুক্তির বিনিময়ে বলো তোমাদের সকল কন্যা, জায়া, ভগ্নিকে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে, তাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না। কিন্তু কোনমতে তোমার তরবারীর কব্জামুক্ত হতে পারলেই বিষাক্ত সাপের মতো ছোবল মারবে। হিন্দুদের সাথে আমাদের যুদ্ধ রাজত্বের সীমা কিংবা ধন-সম্পদ নিয়ে নয়, আমাদের সাথে হিন্দুদের সংঘাতের একমাত্র কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস। এ যুদ্ধ যতদিন পর্যন্ত হিন্দুস্তানে একজন হিন্দু কিংবা মুসলমান থাকবে, ততোদিন পর্যন্তই অব্যাহত থাকবে। কিন্তু এখন দেখার বিষয় হচ্ছে, হিন্দুরা কখন আমাদের আক্রমণ করে।"

"আমি আপনাকে অনুরোধ করবো, হিন্দুদের আক্রমণ দেখার জন্য আমাদের নিষ্ক্রীয় বসে থাকা ঠিক হবে না। আজই একজন দূত গযনী সুলতানের কাছে এই আশঙ্কার সংবাদ দিয়ে পাঠানো দরকার। আমাদের উচিত হবে শত্রুদের শক্তি ও সামর্থের ব্যাপারে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর না তোলা। কারণ, যখন ওদের আক্রমণ শুরু হয়ে যাবে, তখন অল্প কজন লোক দিয়ে আপনি ওদের বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা কিভাবে করবেন? বললো কমান্ডার আজমীর।

আজমীরের প্রস্তাব খুবই যৌক্তিক মনে হলো সেনাপতি সারওয়াগের। তিনি তখনই মৌখিক পয়গাম দিয়ে গযনীর উদ্দেশ্যে দু'জন সৈনিক পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। তাদেরকে বলা হলো, পথিমধ্যে যথাসম্ভব কম বিশ্রাম নেবে এবং প্রয়োজন হলে প্রত্যেক চৌকি থেকে ঘোড়া বদল করে নেবে।

প্রত্যাশার চেয়েও কম সময়ে দূত গযনী পৌঁছে গেল। সুলতান মাহমূদ তাঁর সেনাবাহিনীর সকল সৈনিকের মধ্যেই এ বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন যে, কয়েক মিনিটের বিলম্ব অনেক ক্ষেত্রে গোটা বাহিনীর পরাজয়ের কারণ হতে পারে। সুলতানের এই শিক্ষার কারণে সংবাদবাহক প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত গযনী পৌঁছে গেল। সংবাদবাহক যখন সুলতানকে কাশ্মীরের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করছিল, তখন তার যবান চললেও মাথা দোল খাচ্ছিল আর যন্ত্রণায় তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। ক্ষুধা-পিপাসা এবং বিরতিহীন ক্লান্তিতে তার দেহ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল।

এ প্রসঙ্গে ইংরেজ ইতিহাস গবেষক স্যার হেনরী হোয়ার্থ ১৮৯৮ সালে লেখা এক নিবন্ধে ঐতিহাসিক ইবনে ইসপান্দেয়ার-এর সূত্রে লেখেন,

"কাশ্মীরের গোলযোগ ও সেনাপতি সারওয়াগের গ্রেফতারী এবং রাজা নন্দরায় ও ভীমপালের চক্রান্তের খবর শুনে সাথে সাথেই সুলতান সেনাবাহিনীকে অভিযানে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন। এর আগে কখনো অভিযানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশল সম্পর্কে সৈন্যদের অবহিত করা ছাড়া তাকে অভিযানের নির্দেশ দিতে দেখা যায়নি। এর কারণ সম্পর্কে বিশ্লেষকগণ বলেছেন, ইসলামের নীতি-আদর্শের প্রশ্নে সুলতান ছিলেন খুবই আপোসহীন ও আবেগপ্রবণ। তিনি তখন বলেন, দক্ষিণ কাশ্মীরের যে এলাকায় তিনি মৌখিকভাবে ইসলামী শাসন জারী করে এসেছিলেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই নির্দেশ মান্য করে স্থানীয় অধিবাসীদের সিংহভাগ ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং নওমুসলিমদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য তার নির্দেশে বহু মসজিদ-মক্তব স্থাপিত হয়েছিল। বহু সংখ্যক ইমাম ও শিক্ষক লাহোর বাটাভা ও অন্যান্য জায়গা থেকে কাশ্মীরে পাঠানো হয়। কিন্তু পরাজিত হিন্দু রাজারা বহুমুখী চক্রান্তের জাল বিস্তার করে নওমুসলিমদের বিভ্রান্ত করে ফেলেছে। শুধু তা-ই নয়, আঞ্চলিক প্রশাসক সেনাপতি সারওয়াগকে চক্রান্তকারীরা বন্দী করেছে। সেই সাথে সুলতানের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন সুলতান এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, স্বভাবজাত যুদ্ধ চিন্তা ও পরিকল্পনা করে নেয়ার অবকাশ তার হয়নি। স্বাভাবিক অবস্থায় নিজেকে ফিরিয়ে এনে তিনি ভাবতেই পারেননি, কোথায় কোন অবস্থায় কাদের সাথে মোকাবেলায় রওনা হচ্ছেন তিনি। ফলে তার বাহিনী কাশ্মীরে পৌছার আগেই সেখানে প্রচণ্ড শীত ও তুষারপাত শুরু হয়ে যাবে এদিকটি তিনি চিন্তা করেননি। তিনি ভাবতেই পারেননি, অত্যধিক ঠাণ্ডা আর তুষারপাত তার পরাজয়ের কারণ হতে পারে কিংবা অভিযানকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারে।

ঐতিহাসিক হায়দার কিরগানী 'তারিখে রাশেদী' গ্রন্থে লিখেছেন, "হতে পারে অতীতের অব্যাহত বিজয়ের মনোবল ও শত্রুদের চক্রান্তের ক্ষুব্ধতায় সুলতান অভিযানের সময়, ক্ষেত্র, অবস্থা ও প্রতিবন্ধকতার কথা বিবেচনা না করেই সৈন্যদের রওনা হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিংবা কাশ্মীরের প্রাকৃতিক অবস্থা, শীতকালে সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির ব্যাপারে তাঁর বাস্তব কোন ধারণা ছিল না। কাশ্মীরের পথঘাট সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ছিল অস্বচ্ছ।

বস্তুত পেশোয়ার থেকে আরো কিছু সৈন্য সাথে নিয়ে স্বভাবজাত দ্রুততার চেয়ে আরো বেশী ক্ষিপ্রতায় তিনি কাশ্মীরের সীমানায় পৌঁছেন। ১০১৫ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দশকে সুলতান তার সৈন্যদল নিয়ে কাশ্মীর পৌঁছেন। তখন পাহাড় ও সমতল সবজায়গা তুষারপাতের কারণে বরফে ঢাকা পড়ে গেল। সুলতানকে তাঁর গোয়েন্দা সূত্র খবর দিল, রাজা ভীমপাল ও নন্দরায় এখন কালাঞ্জর দুর্গে নয়, লোহাকোট দুর্গে অবস্থান করছে। কালাঞ্জর দুর্গ অবরোধ করে কালক্ষেপণ না করে লোহাকোট দুর্গ অবরোধের পরামর্শ দেয়া হলো। কারণ, লোহাকোট দুর্গ দখলে এসে গেলে কালাঞ্জর অবরোধ ছাড়াই দখলে এসে যাবে।

এদিকে লোহাকোট দুর্গে অবস্থানকারী মহারাজাদের কাছে খবর এলো, সুলতান মাহমূদ এসে গেছে। মহারাজা নন্দরায় চক্রান্ত ও দুষ্কৃতিকারী দলের প্রধানকে ডেকে বললেন, "তোমার সেই লোকদের নিয়ে এসো।" কিছুক্ষণের মধ্যে রাজা নন্দরায়ের সামনে দশ-বারোজন লোকের একটি দলকে এনে দাঁড় করানো হলো।

"তোমাদের কী করতে হবে তা কি তোমাদের জানা আছে?" সামনে দণ্ডায়মান লোকদের জিজ্ঞেস করলেন রাজা নন্দরায়।

"জি মহারাজ! আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। আমরা সুলতানের কাছে গিয়ে বলবো, আমরা এই এলাকার মুসলমান। এই অঞ্চলের পোশাক পরেই আমরা তার সামনে যাবো। আমরা তার কাছে আবেদন করবো, আমরা আপনার অভিযানে শরীক হতে চাই এবং আপনার সেনাদের গাইড দেয়ার প্রয়োজনেই আমরা এসেছি। কারণ, মৌসুমী তুষারপাত পথঘাট সবই তলিয়ে দিয়েছে। বহুল ব্যবহৃত পথের কোনই চিহ্ন নেই। এমন অবস্থায় লোহাকোট কোন পথে যাওয়া যাবে আমরা সেই পথ জানি। আমরা নিষ্ঠাবান মুসলমানের মতোই কথাবার্তা বলবো। তাদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য আমরা শুদ্ধ উচ্চারণে কলেমা ও নামায শিখে নিয়েছি।"

"সাবাস! যেভাবেই হোক তোমরা ওকে লোহাকোট নিয়ে আসবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লোহাকোট থেকে তাকে ব্যর্থ হয়েই ফিরতে হবে। ফিরে যাওয়ার পথে তোমরাই হবে তাদের পথপ্রদর্শক। তখন তোমরা তোমাদের আসল উস্তাদী দেখাবে।"

এই দশ-বারোজন লোক ছিল কট্টর হিন্দু। এরা ছিল প্রশিক্ষিত দুষ্কৃতিকারী। এরা সুলতান মাহমূদকে বিভ্রান্ত করার জন্য দাড়ি রেখেছিল। চালচলন, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদে তারা প্রত্যেকেই সাচ্চা মুসলমানরূপে নিজেদের উপস্থাপন করার সব কৌশল রপ্ত করেছিল।

লোহাকোট দুর্গের দিকে অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন সুলতান। পথের দুর্গমতা, অত্যধিক ঠাণ্ডা এবং তুষারপাতকে উপেক্ষা করলেন তিনি। কাশ্মীরে তাঁর যেসব সেনাচৌকি ছিল, তারা লোহাকোটে পৌঁছানোর জন্য অভিজ্ঞ গাইড বাছাই করে রেখেছিল। কারণ, সেই যুগের রীতি ছিল কোন সেনাবাহিনী যদি কোন অচেনা জায়গায় আক্রমণ চালাতো, তখন স্থানীয় লোকদের থেকে গাইড সংগ্রহ করতো।

লোহাকোটের দিকে অগ্রসর হলে পথিমধ্যে দশ-বারোজনের একটি কাফেলা এসে সুলতানের বাহিনীতে যোগ দিল। এই দলের লোকেরা সুলতানের সহযোগিতার ব্যাপারে খুবই উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছিল। তারা নিজেদেরকে নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে সুলতানের সামনে নিখুঁতভাবে পেশ করে। তারা এও বলে, আমরা দীর্ঘদিন এসব হিন্দুরাজাদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছি। আজ আমরা ওদের জুলুমের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। তাদের আবেগময় আবেদন আর মুসলমান হিসেবে নিখুঁত ভাবভঙ্গিমায় আশ্বস্ত হয়ে তাদের একেকজনকে গাইড হিসেবে প্রত্যেকটি সেনা ইউনিটে ভাগ করে দিলেন সুলতান। সেনাপতিদের বললেন, তাদের কথামতো অগ্রসর হতে।

লোহাকোট দুর্গ সম্পর্কে অনেক কাহিনীই শুনেছিলেন সুলতান। কিন্তু যখন লোহাকোর্ট দুর্গকে প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তার মনে হলো, তাকে লোহাকোট দুর্গ সম্পর্কে খুব কমই বলা হয়েছে।

সুলতান মাহমূদ ছিলেন দুর্গজয়ের উস্তাদ। কিন্তু লোহাকোট দুর্গ দেখে তিনি বিরাট এক ধাক্কা খেলেন। দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন কেন লোহাকোট দুর্গ অজেয় দুর্গ হিসেবে খ্যাত। দুর্গটি ছিল বিশাল এক পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এটি যেমন ছিল দুর্ভেদ্য, তদ্রূপ এর গঠনও ছিল মজবুত। সম্পূর্ণ পাথর ও মাটির মিশ্রণে বিশাল পুরুত্বে তৈরি ছিল দুর্গের প্রাচীর। তাছাড়া দুর্গের চারকোণে ছিল চারটি সুউচ্চ বুরুজ। এই বুরুজ থেকে যে কোন আক্রমণকারী দলকে সহজেই তীরের আঘাতে ঘায়েল করা সহজ ছিল।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল, প্রাকৃতিকভাবেই দুর্গের চতুর্দিকে ছিল গভীর খাদ। প্রতিটি ফটকের সামনের চত্বর ছিল অনেক ঢালু। ফটকগুলো বিশালকায় লোহার ডাণ্ডা দিয়ে তৈরি। হাতির কাঁধে শক্ত গাছের কাণ্ড রেখে এগুলোকে আঘাত করলেও ভাঙ্গা সম্ভব ছিল না।

সুলতান মাহমূদ দুর্গকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সকল সৈন্যকে এক জায়গায় একত্রিত করলেন। একটি অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে কাছের একটি টিলার উপরে দাঁড়িয়ে তিনি তার সৈন্যদের সাহস জোগানো এবং হিম্মত বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বললেন, হে আল্লাহর সৈনিকেরা! তোমরা গযনী সালাতানের জন্য নয়, আল্লাহ ও রাসূল সা. এর উদ্দেশ্যে যুদ্ধে এসেছো। আমরা এই এলাকার লোকজনকে ইসলামের দীক্ষা দিয়ে আল্লাহর নাফরমানী থেকে ফিরিয়ে এনেছিলাম। কিন্তু শুধু মুসলমান হওয়ার অপরাধে এখানকার বেঈমান রাজা-মহারাজারা এদের উপর নির্যাতনের তুফান চালাচ্ছে। আজকে তোমাদেরকে এই বেঈমানদের রক্তে ইসলামের প্রদীপ জ্বালাতে হবে।

"ওই যে দুর্গ তোমরা দেখছো, এই দুর্গ তোমাদের দেখে উপহাস করছে। এখানকার মৌসুমও তোমাদের ভ্রূকুটি করছে। তোমরা মরুময় পাথুরে ময়দানে লড়াই করে অভ্যস্ত। আজ এখানে প্রমাণ করে দাও, শীত ও বরফে যদি আসমান-জমিন সব কিছুও জমাট বেধে যায়, তারপরও মুসলমানের রক্ত জমে না। ঈমানের উষ্ণতা বরফের পাহাড়কেও গলিয়ে পানি করে দিতে পারে।

দেখো, আমরা বহুদূর থেকে এসেছি। আমরা এখানে এসেছি আল্লাহর পয়গাম তার বান্দাদের কাছে পৌছে দিতে। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে শপথ নাও, কঠিন দুর্ভেদ্য এ দুর্গে ইসলামের পতাকা না উড়িয়ে আমরা ফিরে যাবো না।"

সরাসরি সৈন্যদের সামনে এমন আবেগী ভাষণ সুলতান তেমন দিতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি কমান্ডারদের মাধ্যমে সৈনিকদের উজ্জীবিত করার পয়গাম দিতেন। কঠিন ও কঠোর ট্রেনিং দিয়ে সুলতান মাহমূদ তার প্রতিজন সৈন্যকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ত্যাগী, কষ্ট সহিষ্ণু ও সাহসী করে গড়ে তুলতেন। তাদেরকে আবেগী বক্তৃতা দিয়ে উজ্জীবিত করার তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু লোহাকোট দুর্গের অবস্থা ও তুষারপাতের বিরূপ পরিস্থিতি সুলতানের মনে যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনাকে এতোটাই দুঃসাধ্য করে তুলেছিল যে, কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদেও যার মধ্যে কখনো কোন ভাবান্তর দেখা যায়নি, রণাঙ্গনের

কঠিন পরিস্থিতিও যাকে পেরেশান, উদ্বিগ্ন ও আশাহত করতে পারেনি, সেই পাহাড়সম সাহসিকতার অধিকারী সুলতানের হৃদয়ে লোহাকোট দুর্গ জয় এতোটাই দুঃসাধ্য মনে হচ্ছিল যে, তার কণ্ঠের আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁকে বারবার থামতে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তিনি যথার্থ শব্দটি বলার জন্য স্মৃতিপট হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

যে কোন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ শুরুর আগে সুলতান দু'রাকাত নফল নামায পড়তেন। কিন্তু এদিন ঘোড়া থেকে নেমে তিনি তা করেননি। এমন কিছুও বলেননি যে, আমি জয়ের ইঙ্গিত পেয়েছি, বিজয় আমাদেরই হবে। অনেক রণাঙ্গনে তিনি এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ভাষণ শেষে তিনি তাঁর ঘোড়াকে টিলার উপর থেকে নিচে নামিয়ে আনলেন।

লোহাকোট দুর্গের চারপাশে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত হতে লাগলো। যে পাহাড়ের উপর দুর্গ অবস্থিত এর বাইরে উঁচু নীচু অসংখ্য টিলা। এসব টিলা ও সমতল সব জায়গাতেই প্রচুর গাছগাছালী। দুর্গের বাইরের ঢালুতেও প্রচুর বৃক্ষাদি ছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে দুর্গের ঢালের বৃক্ষাদি কেটে সাফ করা হয়েছে।

সুলতান মাহমূদ দুর্গের চতুর্দিক ঘুরে পর্যবেক্ষণ করলেন। দুর্গ প্রাচীর ও বুরুজের উপর থেকে হিন্দু সৈন্যরা তাঁকে হুমকি দিচ্ছিলো এবং নানা তিরস্কারসূচক বাক্য ছুঁড়ে দিচ্ছিলো। হিন্দু সৈন্যরা তাচ্ছিল্যের স্বরে বলছিল, "মাহমূদ! তোমার খোদা তোমার ভাগ্যে বরফের কবর লিখে রেখেছে।"

চতুর্দিকের টিলা ও পাহাড়ের উপর তীরন্দাজ নিযুক্ত করে সুলতান দুর্গপ্রাচীরে অবস্থানকারী সৈন্যদের উপর তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। তীরন্দাজদের তীরের সহায়তা নিয়ে প্রাচীর ভাঙায় পারদর্শী সৈন্যদেরকে তিনি দুর্গ প্রাচীরের নিচে সুড়ং খননের জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি জানতেন, কাশ্মীরের পাহাড়গুলো নিরেট পাথরের নয়, পাথুরে মাটির হয়ে থাকে। কাজেই এতে খননকাজ তেমন কঠিন হবে না। সুলতান মাহমূদ ভেবেছিলেন, কয়েক গজ সুড়ং খনন করতে পারলেই খননকারীরা দুর্গ প্রাচীরের উপরের তীর থেকে নিজেদের হেফাজত করতে পারবে এবং নির্বিঘ্নে খননকাজ চালাতে পারবে।

প্রাচীর ভাঙা ও সুড়ং খননকারী দল নির্দেশ পেয়েই খননকাজে এগিয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের তৎপরতা থেমে গেল। একজনের

পক্ষেও জীবন নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব হলো না। দুর্গ প্রাচীর থেকে বৃষ্টির মতো তীর এসে তাদের সবাইকে বিদ্ধ করলো। সুলতানের তীরন্দাজরা আশপাশের পাহাড় ও টিলার উপর থেকে যেসব তীর নিক্ষেপ করছিলো, বেশী দূরত্বের কারণে তা দিয়ে দুর্গ প্রাচীরের শত্রু তীরন্দাজদের দমানো সম্ভব হলো না।

কয়েক সৈনিক জীবনবাজী রেখে প্রধান ফটকে অগ্নিসংযোগ করার জন্য দাহ্য পদার্থ এবং ফটক ভাঙার জন্যে হাতুড়ী-শাবল নিয়ে ফটকের দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু ফটকের সামনের চত্বর ছিলো ঢালু এবং বরফে ঢাকা। মুসলিম সৈন্যরা ঢালু বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে পা পিছলে বরফের মধ্যে পড়তে লাগল আর উপর থেকে শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীরবিদ্ধ হয়ে গড়িয়ে নিচে পড়তে লাগল। তাদের মধ্যেও দু'-চারজন ছাড়া কারো পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব হলো না।

অন্যান্য ফটকেও অনুরূপ হামলা করার চেষ্টা হলো। একটি ফটকে কিছু জানবাজ আঘাত করতে শুরু করেছিল। কিন্তু দুর্গপ্রাচীরের উপর থেকে ফটক ভাঙচুরকারীদের উপর জ্বলন্ত কাঠ এবং আগুনের সলিতা নিক্ষেপ করলো শত্রুবাহিনী। তাদের সবার শরীরই ঝলসে গেলো।

ঐতিহাসিক উত্বী, গারদিজী, ইবনুল আছীর এবং দুজন ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ লিখেছেন, রাতের বেলায়ও সুলতানের সৈন্যরা দুর্গ প্রাচীরের নিচে সুড়ং খননের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু দিনের বেলায় সুলতান দেখতে পেলেন, দুর্গ প্রাচীরের নিচের খাড়িতে মুসলিম সৈন্যদের লাশের স্তূপ জমে গেছে। অবস্থা দেখে সুলতানের চেহারা রাগে-ক্ষোভে কালো হয়ে গেলো। তিনি পাগলের মতো দুর্গের চতুর্দিকে দৌড়াচ্ছিলেন আর সুড়ং খননের জন্য নির্দেশ দিচ্ছিলেন। সুলতানের নির্দেশে মুসলিম কমান্ডার ও সৈন্যরা অকাতরে তাদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছিল।

পরদিন সন্ধ্যার আগেই চতুর্দিকে প্রচন্ড অন্ধকার নেমে এলো। হিমশীতল রাতের অন্ধকারে শুরু হলো প্রবল তুষারপাত আর সেই সাথে ঝড়ো হাওয়া। তীব্র ঝড়ো হাওয়া আর প্রচণ্ড তুষারপাতে মানুষ তো দূরে থাক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গি ঘোড়াগুলোও টিকতে পারছিলো না। জীবন বাঁচানোর জন্য জঙ্গি ঘোড়াগুলো এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করতে শুরু করলো; কিন্তু আশ্রয় নেয়ার মতো কোথাও কোন আড়াল ছিলো না।

সমতল-অসমতল সব জায়গা বরফে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। কোনটা খাদ কোনটা টিলা বোঝা যাচ্ছিল না। তুষারপাত ও ঝড়ের গতি যেদিকে ছিল,

সেদিকে ছিল কাশ্মীরের বিখ্যাত ঝিলম নদী। প্রবল বাতাসের ধাক্কা অশ্বারোহী ও ভারবাহী সব জন্তু ওদিকেই হটতে বাধ্য হচ্ছিল। ঝিলম নদীর তীর ছিল সরু; কিন্তু উঁচু ও খাড়া। নদী ছিল অপ্রশস্ত, গভীর ও তীব্র স্রোতস্বিনী। নদী তীরের সবকিছু বরফে ঢাকা পড়ে গেল। বাতাসের ধাক্কায় অশ্বারোহী, আরোহীহীন জন্তু সবই নদী গর্ভে গড়িয়ে পড়ছিল। তীব্র স্রোত আর বরফঢাকা খাড়া তীর বেয়ে কারো পক্ষে উপরে উঠে আসার উপায় ছিল না। সেই রাতের অন্ধকারে কতো সিপাহী আর কতো ভারবাহী জন্তু ঝিলম নদীর স্রোতে ভেসে গিয়েছিল, তার প্রকৃত হিসেব রাখা সম্ভব ছিল না।

রাত শেষে যখন ভোরের সূর্য উচিত হল, তখন কারো পক্ষে বলার উপায় ছিলো না, এটিই গতকালের ঝিলম তীর আর লোহাকোট দুর্গের চারপাশ। হাজার হাজার মুসলিম যোদ্ধা বরফের নিচে তলিয়ে গেল। উঁচু বরফের আস্তরণ পড়ে গেল সবখানে। সুলতানকে বেঁচে থাকা কমান্ডারগণ বিনয়ের সাথে বললেন–টানা বিজয়ের নেশায় আমরা এই অভিযানকে সেইভাবে বিবেচনা করিনি। এটাই হয়তো আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো। এবার ক্ষান্ত হওয়া যাক। আল্লাহ চাহে তো আমরা আবার আসবো। যারা এখনও বেঁচে আছে, তাদের জীবন রক্ষার দিকটিই প্রাধান্য দেয়া হোক।

সুলতান মাহমূদ কমান্ডারদের পরামর্শ মেনে নিয়ে সৈন্যদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ব্যর্থতার দায়ও নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন তিনি। কিন্তু ফিরে যাওয়ারও পথ ছিলো না। সবকিছু বরফে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমন বেগতিক অবস্থায় পথিমধ্যে যোগ দেয়া গাইডেরা এগিয়ে এলো। তারা এই দুঃসময়ে সুলতানকে আশ্বাস দিলো, মাননীয় সুলতান ! দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, এখনো ফেরার একটি পথ পরিষ্কার আছে।

সেনাবাহিনী তখন বিক্ষিপ্ত। তারা প্রধান তিনটি অংশে বিভক্ত। পরিচয় গোপনকারী হিন্দু গাইডেরা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গাইডের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো।

তীব্র তুষারপাত রাতের বরফে তুফান আর সুড়ং খননের ব্যর্থ অভিযানে অর্ধেকের চেয়ে বেশী সৈন্য আগেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। বাকী অর্ধেকের কম সৈন্য তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পরিচয় গোপনকারী শত্রু গাইডের দেখানো পথে যখন গযনী ফিরতে রওনা হলো, এর পরিণতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক কারিশ্‌মা লিখেছেন–

"তীব্র তুষারপাত ও তুষার ঝড়ের পরদিন সুলতান মাহমূদ অবরোধ প্রত্যাহার করে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। কিন্তু ফেরার পথে হিন্দু পথপ্রদর্শকরা তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে এতোটাই বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয় যে, টানা এক সপ্তাহ গোটা বাহিনীকে তারা অচেনা-অজানা তুষার পথে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হত্যা করে। তীব্র ঠাণ্ডা, অপর্যাপ্ত পানাহার, ব্যর্থতার গ্লানি আর সহযোদ্ধা হারানোর শোকে এমনিতেই মুসলিম যোদ্ধারা ছিলো ক্লান্ত, হতোদ্যম ও মনোবলহারা। এমতাবস্থায় বরফে ঢাকা পিচ্ছিল পথে বেশিরভাগ সৈন্যকে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হচ্ছিল। যুদ্ধাস্ত্র ও জরুরী সামানপত্র কাঁধে করে বহন করতে হচ্ছিল তাদের। শত্রু পক্ষের গুপ্ত গাইড ঝিলম নদীর সংকীর্ণ তীর ধরে তাদের নিয়ে যাচ্ছিল। অগ্রসর হতে গিয়ে বারংবার পা পিছলে গভীর নদীর অতলে গড়িয়ে পড়ছিল মুসলিম যোদ্ধারা। তাছাড়া জায়গা জায়গায় ছিল বরফের ফাঁদ। দৃশ্যত সমতল দেখা গেলেও হালকা বরফের নিচে লুকিয়ে ছিল গভীর গর্ত। এসব ফাঁদে পা দিয়ে বহু যোদ্ধা বরফের চোরাবালিতে তলিয়ে যেতে থাকে। বহু ঘোড়া ও ভারবাহী জন্তুও বরফের চোরাবালিতে পড়ে জীবন ত্যাগ করতে থাকে। তীব্র ঠাণ্ডায় যেসব যোদ্ধা চলার শক্তি হারিয়ে বসে পড়তো, তার পক্ষে আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হতো না। এভাবে সুলতানের অসংখ্য যোদ্ধাকে জীবন দিতে হলো। অথচ এরা প্রত্যেকেই ছিল সুলতান মাহমূদের বাহিনীর চৌকস যোদ্ধা।

দুর্গজয় তো সম্ভব হলোই না, তদুপরি ব্যর্থতা মেনে নিয়ে ফিরতে গিয়ে শত্রু গাইডের পাল্লায় পড়ে শত শত যোদ্ধাকে কুরবানী দিতে হলো। বন্ধুবেশী শত্রু গাইডেরা এক দিন গোটা বাহিনীকে ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। বরফঢাকা পাহাড়ী পথে চক্কর খেয়ে সিংহভাগ সহযোদ্ধাকে হারিয়ে সুলতান মাহমূদ যখন টিলাযুগিয়ায় অবস্থিত সেনাপতি সারওয়াগের সেনাক্যাম্পে পৌঁছলেন, তখন তার সাথে মাত্র হাতে গোনা কয়েকশত যোদ্ধা। ব্যর্থ, ক্লান্ত, শোকাহত সুলতান কয়েকদিন সারওয়াগের ক্যাম্পে অবস্থান করে গযনী ফিরে এলেন।

লক্ষ্য যখন ক্ষমতা ও সিংহাসন

১০১৭ খৃস্টাব্দের ৩রা জুলাই মোতাবেক ৪০৮ হিজরী সনের ৫ সফর। স্বগোত্রীয় ঈমান বিক্রেতাদের সম্মিলিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে সুলতান মাহমূদকে এক ভয়ানক রক্তক্ষয়ী সংঘাতে লিপ্ত হতে হলো। এই সংঘাত ছিল সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টিকারী। যে সংঘাতের নেপথ্যে ছিল ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলিম কুচক্রীদের জোটবদ্ধ ষড়যন্ত্র।

১০১৫ সালে অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত হয়ে কাশ্মীর থেকে হাতেগোনা মুষ্টিমেয় সহযোদ্ধাকে নিয়ে পরাজিতের বেশে সুলতানের গযনী ফিরতে হয়েছিল। বিশাল এই ক্ষয়ক্ষতি সামলে উঠার জন্য এবং সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠনের জন্য টানা কয়েকটি বছর প্রয়োজন ছিল সুলতানের। কারণ, কাশ্মীরের লোহাকোট দুর্গের ব্যর্থতা প্রাকৃতিক বৈরীতা এবং চক্রান্তকারী হিন্দু গাইডের চক্রান্তে সুলতান মাহমূদের সামরিক শক্তি একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তখন সাধারণ কোন যুদ্ধের মোকাবেলা করার সামর্থও তার বাহিনীর ছিলো না। রাজধানী গযনীর নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত সৈনিক এবং সীমান্তের অস্থায়ী চৌকিগুলোতে প্রহরারত যোদ্ধারা ছাড়া তাঁর কেন্দ্রীয় কমান্ড প্রায় জনবলশূন্য হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় বহিরাক্রমণ প্রতিহত করার সামর্থ তাঁর থাকলেও প্রতিআক্রমণ করার মতো জনবল সেনাবাহিনীতে ছিলো না।

হিন্দুদের পক্ষ থেকে আক্রমণের তেমন আশঙ্কা তাঁর ছিলো না। কারণ, তখনো পর্যন্ত হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছিল। কাশ্মীরের লোহাকোট দুর্গে পরাজয় মেনে নিয়ে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে টিলাযুগিয়া ক্যাম্পে কয়েক দিন অবস্থান করলেও রাজা ভীমপাল ও নন্দরায় তাঁর উপর আক্রমণের সাহস পায়নি। অথচ এ সময় বিপুল সংখ্যাধিক্যে প্রবল হিন্দুবাহিনী আক্রমণ করলে হয়তো তাদের হাতে সুলতানকে বন্দিত্ব বরণ, নয়তো শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে হতো। কিন্তু হিন্দু রাজা-মহারাজারা তাঁকে আহত বাঘের মতোই ভয়ানক ভেবে তাঁর কাছ থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ দূরত্বে রেখেছেন।

এমতাবস্থায় চিহ্নিত শত্রু হিন্দুদের পক্ষ থেকে কোন ঝুঁকির আশঙ্কা না থাকলেও স্বগোত্রীয় মুসলিম ক্ষমতালিপ্সু প্রতিবেশী ক্ষুদ্র শাসকদের পক্ষ থেকে ঝুঁকির আশঙ্কা প্রবল হতে থাকলো। অধিকাংশ প্রতিবেশী মুসলিম শাসক এককভাবে কিংবা যৌথভাবে সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াই করে এক বা একাধিকবার পরাজিত হয়েছিল। স্বগোত্রীয় এসব ক্ষমতালিপ্সুদের প্রতিবারই সুলতান ক্ষমা করে দিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রত্যাশায় ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু মসনদ ও ক্ষমতার পূজারী, নীতি-আদর্শবিচ্যুত এসব শাসক সুলতানের শক্তিশালী অবস্থানকে সব সময় তাদের বিপদ জ্ঞান করতো। তারা শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে সব সময়ই সুলতানের ধ্বংস কামনা করতো। সুলতানকে হীনবল ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে পরস্পর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে লিপ্ত থাকতো। কুচক্রী প্রতিবেশীদের জন্য সুলতানের এই বিপর্যয় মহাসুযোগ সৃষ্টি করে দিল। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে উঠে-পড়ে লেগে গেল তারা।

কাশ্মীরের ব্যর্থ অভিযান শেষে সুলতান মাহমূদ যখন গযনীতে ফিরে এলেন, তখন তাঁর অবস্থা অনেকটাই ডোরকাটা ঘুড়ির মতো। বাতাসের দয়ার উপর ভর করে ঘুড়ি যেমন উড়তে থাকে, সে জানে না জমিনে পড়বে না কোন গাছের ডালে পড়ে ফেটে যাবে। সুলতান মাহমূদের সাথে কাশ্মীর অভিযান শেষে যে সামান্যসংখ্যক সৈন্য ছিলো, তারা শোক-মিছিলের আবহে রাজধানীতে ফিরছিলো। গযনীর যেসব লোক সেনাবাহিনীর আগমনবার্তা পেয়ে রাস্তায় তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য জড়ো হয়েছিলো, সৈন্যদের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে তাদের মুখে আর কোন শব্দ উচ্চারিত হলো না। বিজয়োল্লাসের তাকবীর ধ্বনি তাদের বুকের পাঁজরে যেন আটকে গিয়েছিল। যেসব নারী দরজা-জানালায় দাঁড়িয়ে সেনাবাহিনীর প্রত্যাবর্তন দেখছিলো, সৈন্যদের বিপর্যস্ত দৃশ্য দেখে তারা দাঁতে আঙুল কামড়ে ধরলো।

সুলতান মাহমূদ রাজধানীর অধিবাসীদের এমন শোকাবহ নীরবতা দেখে ঘোড়া থামিয়ে তাঁর প্রধান সেনাপতি আলতানতাশকে ডেকে পাঠালেন।

"আলতানতাশ! কী হয়েছে, রাজধানীর উৎসুক সব মানুষ নীরব হয়ে গেলো কেন? সৈন্যদের মৃত্যুতে ওদের স্লোগান হারিয়ে গেলো কেন? তাদের বলো, জাতির প্রয়োজনেই সৈন্য বেঁচে থাকে। এজন্য তোমাদের সবার মরে

গেলে চলবে না। তোমাদের শ্লোগান্ বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তোমরা শ্লোগান দাও, 'ইসলাম জিন্দাবাদ" "সালতানাতে গযনী জিন্দাবাদ"। তোমরা আহত সৈন্যদের উজ্জীবিত করো। তোমাদের উৎসাহ ও প্রাণোচ্ছলতা তাদেরকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। যারা শাহাদাত বরণ করেছে, তারা তাদের জীবন জাতির সেবায় দান করে গেছে। তাদের কুরবানীর মর্যাদা আমাদের রক্ষা করতে হবে।"

সেনাপতি আলতানতাশ উচ্চ আওয়াজে সুলতানের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন। মাঝে মাঝে গযনীর আকাশ-বাতাস 'সালতানাতে গযনী জিন্দাবাদ, ইসলাম জিন্দাবাদ, ইসলামের সৈনিকেরা জিন্দাবাদ, মূর্তি ধ্বংসকারী সুলতান জিন্দাবাদ, ইত্যাকার শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠলো।

সুলতান মাহমূদ আবারো সেনাপতির উদ্দেশে বললেন, "মহিলাদের বলো, 'ইসলাম তোমাদের কাছে তোমাদের ভাই-বেটাদের কুরবানী দাবী করছে। আপনজন হারানোর শোকে মাতম করলে চলবে না। তোমাদেরকে ইসলামের প্রয়োজনে স্বামী-সন্তান, ভাই-পুত্রদেরকেও কুরবানী দিতে হবে।"

সেনাপতি আলতানতাশ সুলতানের একথাগুলোও উচ্চ-আওয়াজে পুনরাবৃত্তি করলেন। একথা শুনে যেসব নারী তাদের সংগৃহীত ফুল লুকিয়ে ফেলেছিলো, আহত সৈনিকদের উপর তা ছিটিয়ে দিতে শুরু করলো। সেই সাথে নারীদের কণ্ঠ থেকে ভেসে এলো, "কোন অসুবিধা নেই, ইসলামের প্রয়োজনে আমাদের ভাই-পুত্র-স্বামীদের তোমরা নিয়ে যাও।"

সুলতান মাহমূদ রাজধানীবাসীর মনোবল বাড়িয়ে দিয়ে শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন বটে; কিন্তু তাঁর নিজের মনের গভীরে ব্যর্থতা ও হতাশার যে কাঁটা বিদ্ধ হয়েছিলো তা তিনি কিছুতেই সরাতে পারছিলেন না। কাশ্মীর যুদ্ধের সকল ব্যর্থতা তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি বাহিনীর বেঁচে থাকা সেনাপতি এবং গযনীতে অবস্থানকারী সেনাকমান্ডারদের ডেকে বললেন, "জয়-পরাজয় মূলত আল্লাহর হাতে। কিন্তু লোহাকোট অভিযানের যাবতীয় ব্যর্থতার দায় আমার। আমি এর সকল দায়-দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিচ্ছি। কারণ, আমি সেখানকার মৌসুমী প্রভাবকে মোটেও বিবেচনায় নিইনি। স্থানীয় সংবাদ প্রেরকদের কাছ থেকে ওখানকার অবস্থা যাচাই করিনি। সর্বোপরি হিন্দু প্রতারকদের ধোঁকায় আমি প্রতারিত হয়েছি।

জাতির এই কলঙ্ক, এই ক্ষয়ক্ষতিকে বিজয়ে রূপান্তরিত করে দেখানোর দায়-দায়িত্ব এখন আমি কাঁধে তুলে নিচ্ছি।

রাজা হিসেবে রাজ্য শাসন করা আমার কাজ নয়। আমার কাজ ইসলামের বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়া। তোমরা আমার একটি কথা খুব মনে রেখো। তা হচ্ছে, এখন যদি কেউ তোমাদেরকে পরাজয়ের জন্য তিরস্কার করে, তবে সেই তিরস্কারকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে তাকে আশ্বস্ত করো, তোমাদের সমর্থন-সহযোগিতা থাকলে গযনী বাহিনী অচিরেই পরাজয়ের গ্লানি মুছে দেবে।

ব্যর্থতার পুরো দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নেয়ার পরও স্বস্তি পাচ্ছিলেন না সুলতান মাহমূদ। ক্রমেই তার মন অত্যন্ত অস্থিরতায় পেরেশান হয়ে উঠছিলো। মনের অস্বস্তি অস্থিরতা ও পেরেশানী থেকে মুক্তি পেতে অবশেষে তিনি তার শায়খ আবুল হাসান খারকানীর সাক্ষাতে রওনা হলেন।

গযনী থেকে একদিন ও অর্ধেক রাতের দূরত্বে অবস্থান করতেন খারকানী। অল্প কজন নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে স্বীয় মুর্শিদের কাছে পৌছলেন সুলতান মাহমূদ।

বিমর্ষ, ভগ্নহৃদয় ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত সুলতানকে দেখে খারকানী বললেন, "অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, সুলতান পরাজিত হয়ে এসেছেন। কিন্তু তাই বলে তার চোখে পানি কেন?"

"অপমান আর ব্যর্থতার গ্লানি মুর্শিদ" বললেন সুলতান। আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি। আমি হাজার হাজার সহযোদ্ধাকে কাশ্মীরের বরফের নিচে রেখে এসেছি, এদের রূহ আমাকে রাতে ঘুমোতে দেয় না। ওরা যেন আমাকে কানে কানে বলে যায়, "একি করলেন সুলতান? কোন অপরাধে আমাদের কাশ্মীরে এনে বরফ চাপা দিলেন? আমরা তো মর্দে-ময়দান ছিলাম, আমরা তো আপনার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বেঈমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম।"

"বিভ্রান্তি। মানসিক অপরাধবোধ থেকে এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন আপনি। যে যোদ্ধারা সহযোদ্ধাদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ শাহাদত বরণকারীদের আত্মা তাদেরকে বিভ্রান্ত করে না, কোন ধরনের পেরেশানী সৃষ্টি করে না। দেখবেন, এই শহীদদের আত্মা জীবন্ত সৈনিকে রূপান্তরিত হবে। আল্লাহর নামে এখন থেকে আপনারা যেখানেই লড়াই

করবেন, এসব ক্লহ আপনাদের শক্তি জোগাবে। আপনার মতো একজন দৃঢ়চেতা লড়াকু রণনায়কের পথে এ ধরনের বিভ্রান্তি প্রতিবন্ধক হতে পারে না। এসব নিতান্তই আবেগাশ্রয়ী বিষয় সুলতান। হতোদ্যম হবেন না। হিন্দুস্তানের অসংখ্য মজলুম আপনার পথ চেয়ে আছে, শত শত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া মসজিদ আপনার আগমন অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।"

"আমি মারাত্মক ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিলাম। প্রথমত মৌসুম আমাকে ধোঁকা দেয়, দ্বিতীয়ত প্রশিক্ষিত কুচক্রী হিন্দুরা মুসলমান সেজে আমাকে গাইড হিসিবে ধোঁকায় ফেলে।"

"হিন্দুদের এসব ধোঁকাবাজী কোন নতুন বিষয় নয় সুলতান!" বললেন খারকানী। ইসলামের গোড়া থেকেই কুফরীশক্তি মুসলমানদের ধোঁকা দিচ্ছে। ভবিষ্যতেও এই ধোঁকাবাজী অব্যাহত থাকবে। আপনার কাজ হলো ভবিষ্যতে যাতে এমন ধোঁকার শিকার হতে না হয়, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা। ভারতের আগেই হয়তো আপনাকে নিজ ভূমিতে স্বগোত্রীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

ইহুদী ও খৃস্টশক্তি সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের মৈত্রী ও ঐক্যের শিকড় কেটে দিচ্ছে। যে খলীফা ছিলেন মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক, সেই খলীফাই এখন ক্ষমতা ও মসনদের লিপ্সায় অন্ধ। মুসলিম উম্মাহর কেন্দ্রীয় শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আপনি যদি ইসলামের স্বার্থে যুদ্ধ-জিহাদে আগ্রহী হয়ে থাকেন। তাহলে সুলতানীর উষ্ণতা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন। চেনা-অচেনা শত্রুদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুন। স্বজাতি ও স্বদেশের জনগোষ্ঠীকে ভীতসন্ত্রস্ত না করে সামরিক শক্তি দিয়ে শত্রুদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিন। তাজ ও তরবারী সহাবস্থান করতে পারে না। ভালোবাসা হয় তরবারীর সাথে থাকবে, নয়তো তখতের সাথে। যে তরবারী তাজ ও তক্তের হেফাযতের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেই তরবারী ঘৃণ্য। মাত্র একটি পরাজয়ে হতোদ্যম হয়ে যাবেন না সুলতান! উঠে সে-ই, যে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। এই হোঁচট খাওয়ার পর পুনরায় গা ঝাড়া দিয়ে আবার সেই শক্তি নিয়ে দাঁড়ান, যে অবস্থায় আপনি পড়ে গিয়েছিলেন। নিজের ভুলত্রুটি নিজের কাঁধে নিন, এ ব্যাপারে জাতিকে ভুল তথ্য পরিবেশ করবেন না।"

"আপনি বলেছেন, ইহুদী ও খৃস্টানরা আমাদের শিকড় কাটছে? এটা বলে আপনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন?" খারকানীর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন সুলতান।

"ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু ইহুদী জাতি।" বললেন শায়খ আবুল হাসান খারকানী। ইহুদিরা মসজিদে আকসাকে তাদের ইবাদতখানা মনে করে। ইহুদীরা চেষ্টা করছে, ফিলিস্তিনকে তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রে পরিণত করে কাবাকে দখল করে নিতে এবং মুসলমানদের একক ইবাদতগাহকে ধ্বংস করে দিতে। ইহুদীরা মুখোমুখী সংঘর্ষের জাতি নয়। এরা কখনো মুখোমুখী সংঘর্ষে জড়াতে চায় না। ওদের হাতে আছে অঢেল সম্পদ। এই সম্পদ ব্যবহার করে তারা মুসলমানদের শিকড় কাটছে। হিন্দুদের মতো ইহুদীরাও মুসলিমদের ক্ষতিসাধনে কন্যা-জায়াদের ব্যবহার করে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃস্টানদেরও সহায়তা দিচ্ছে ইহুদীরা। যে কারামতী জনগোষ্ঠীর স্বরূপ আপনি উন্মোচন করে সাধারণ মানুষকে ওদের ধোঁকাবাজী পরিহার করে সঠিক ইসলামে দীক্ষা নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, কুফরী মিশ্রিত কথিত মুসলিম নামের এই গোষ্ঠীর জন্মদাতা ইহুদী পণ্ডিতেরা। আপনার বিরুদ্ধে যেসব মুসলিম শাসক অব্যাহত চক্রান্তে লিপ্ত, পর্দার অন্তরালে তাদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে ইহুদীরা। আপনাকে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে রাখার নেপথ্যে ইহুদীরা জড়িত...।

অচিরেই হয়তো নিজ ভূমিতেই স্বগোত্রীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আপনাকে লড়াই করতে হবে। প্রতিবেশী প্রতিপক্ষগুলোকে পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন।

মহান আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন এবং সব সময় সতর্ক থাকুন। নিজ দেশের জনগণকে আপনার সাথে রাখুন। সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠনের চেষ্টা ত্বরান্বিত করুন এবং খাওয়ারিজমের প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ রাখুন। আমি শুনতে পেরেছি, খাওয়ারিজমে ইতোমধ্যে ইহুদীদের কারসাজী জোরে-শোরে চলছে।"

সেই সময় খাওয়ারিজম ছিল একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। জুরজানিয়া ছিল খাওয়ারিজমের রাজধানী। বুখারা ছিল খাওয়ারিজমের একটি প্রদেশ। খাওয়ারিজম রাষ্ট্রে মামুনী খান্দানের রাজত্ব ছিল। অনেক পূর্ব থেকেই খাওয়ারিজম ছিল মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র। ৯৯৫ খৃস্টাব্দে আবু আলী মামুন বিন মুহাম্মদ ইবন আলী খাওয়ারিজমে হামলা করে বাদশা আবু আব্দুল্লাহকে বন্দী করেন এবং গোটা খাওয়ারিজম রাষ্ট্রই দখল করেন নেন। দু'বছর নিজ কব্জায় রাখার পর ৯৯৭ সালে আবু আলী মামুন নিহত হন। কিন্তু হত্যাকারী আবু

আলী মামুনের খান্দানের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারেনি। পিতার নিহত হওয়ার পর আবু আলী মামুনের পুত্র আবুল হাসান আলী মামুন মসনদে আসীন হন। বারো বছর রাজত্ব করার পর ১০০৯ সালে অপরিণত বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর তিন বছর আগে সুলতান মাহমূদের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করতে তিনি সুলতানের ছোট বোনকে বিবাহ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সুলতানের বোন খাওয়ারিজম ত্যাগ করে সুলতানের কাছে চলে এসেছিলেন।

আবুল হাসান আলী মামুনের ইন্তেকালের পর তার ছোট ভাই আবুল আব্বাস মামুন ক্ষমতাসীন হন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর। আবুল আব্বাসের ছিল দুই স্ত্রী। খাওয়ারিজম রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আবুল হারেস বিন মুহাম্মদ। আবুল আব্বাসের পিতা আবু আলী মামুনের সময় থেকেই তিনি মন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন। এই বয়স্ক মন্ত্রীর গভীর হৃদ্যতা ছিলো মামুনী খান্দানের সাথে। আবুল হারেস ছিলেন সত্যিকারের একজন মুসলমান। মুসলমানদের প্রতি তার হৃদয়ে ছিলো অকৃত্রিম ভালোবাসা। বয়সে প্রবীণ ও ঋজু এই লোকটির কোলে-পিঠেই বড় হয়েছিলেন মামুনের দুই ছেলে। তাই তিনি পিতার মতোই তাদেরকে কল্যাণজনক পরামর্শ দিতেন এবং যে কোন অকল্যাণ ও অপ্রীতিকর কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে বলতেন। খাওয়ারিজম রাষ্ট্রের বুখারা প্রদেশের গভর্নর আলাফতোগীন ছিলেন মধ্যবয়সী ও অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ চতুর একজন শাসক। এই লোকটিকে আলহারেস পছন্দ করতেন না। দৃশ্যত আলাফতোগীন খাওয়ারিজম রাষ্ট্রের এবং মামুনী খান্দানের আনুগত্য করলেও তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ছিলো সন্দেহজনক।

আবুল আব্বাস ক্ষমতাসীন হওয়ার পর একদিন নির্ভরযোগ্য বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ মন্ত্রী আলহারেসকে একান্তে ডেকে পাঠালেন। আবুল আব্বাস একান্তে আল হারেস এর সাথে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, প্রজাদের অবস্থা তথা প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করছিলেন। মতবিনিময়ের এক পর্যায়ে আলহারেসের উদ্দেশে আবুল আব্বাস বললেন–

"আমার পিতা নিহত হয়েছেন, বড় ভাইও মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি খুবই একাকীত্ব অনুভব করছি। এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় মনের মধ্যে একটি গোপন কথা কাঁটার মতো কষ্ট দিচ্ছে। আপনি কি এই রহস্যের কিনারা করতে পারবেন?"

"যে সব রহস্যের জাল এই বুড়োর চোখ ভেদ করতে পারবে, এমনটি আর কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। মামুনী খান্দানের অতীত-বর্তমান কোনকিছুই আমার কাছে গোপন নয়। তোমার মনের মধ্যে যদি কোন গোপন কাঁটা বিদ্ধ হয়ে থাকে, তা আমাকে দেখাও, হয়তো আমি সেটিকে অপসারণ করতে পারবো।" বললেন বয়োজ্যেষ্ঠ মন্ত্রী আল হারেস।

"আপনি তো জানেন, ভাইয়ের মৃত্যুর পর বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন এখানে এসেছিলেন। তিনি তখন আমাকে একান্তে বলেছিলেন, আপনার বড় ভাইয়ের মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আপনাকে খাওয়ারিজমের নতুন বাদশা হিসেবে মোবারকবাদ দিচ্ছি। সেই সাথে আজ আপনার কাছে একটি গোপন রহস্য উন্মোচন করে দেয়া কর্তব্য মনে করছি। আপনি জানেন, আপনার পিতাকে হত্যা করা হয়েছিলো। হত্যাকারীদেরও আপনি জানেন। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না, আপনার ভাইও কিন্তু হত্যার শিকার হয়েছেন। তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি।

এ খবর শুনে আমি খুব একটা পেরেশান হইনি। কারণ, আমাদের শত্রুদের আমি জানি। কিন্তু আলাফতোগীন আমাকে বললেন, "ভাইকে এমন এক ধরনের বিষ খাওয়ানো হয়েছিল, যার প্রতিক্রিয়া ছিলো পেটের পীড়ার মতো। ধীরে ধীরে তার শরীরে এই বিষক্রিয়া চলতে থাকে; কিন্তু ডাক্তারের পক্ষে পেটের পীড়া ছাড়া ওই বিষক্রিয়াকে সনাক্ত করা সম্ভব ছিলো না।"

"এমনটি অসম্ভব কিছু নয়। শত্রুরা অনেক কিছুই তো করতে পারে।" বললেন উজীর আবুল হারেস। আপনাদের শত্রুরা আপনাদের সামরিক শক্তিমত্তার ভয়ে ভীত। তাই তারা এ ধরনের চক্রান্তের আশ্রয় নিতেই পারে।"

কিন্তু ব্যাপারটি শুধু এতেই শেষ নয় সম্মানিত উজীর। বললেন নতুন শাসক আবুল আব্বাস। আলাফতোগীন আমাকে সংশয়হীনভাবে বলেছেন, ভাইকে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন সুলতান মাহমূদ। আর সেই বিষ খাইয়েছে সুলতানের বোন এবং আমার ভাবী স্বয়ং। এই বিষ প্রয়োগের কারণ হিসেবে বলেছেন, সুলতান মাহমূদ ভাইকে তার অধীনতা মেনে নিতে বলেছিলেন; কিন্তু ভাই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এখন আমি কি আলাফতোগীনের কথা বিশ্বাস করবো?"

"না, তুমি বিশ্বাস করবে না।" বললেন বয়স্ক আলহারেস। আলাফতোগীনের কথা বলেই আমি এটিকে ঠিক মনে করি না। এ ছাড়াও আমি এটিকে সত্য মনে করি না এজন্য যে, সুলতান মাহমূদ রক্তে-মাংসে একজন মর্দে মুজাহিদ। তাঁকে বিষ প্রয়োগ করার কথা বিশ্বাস করা যায়; কিন্তু তিনি কাউকে বিষ প্রয়োগ করাবেন এটা বিশ্বাস করা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁকে চিনি। তিনি যদি রাজত্ব এবং রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধিতে আগ্রহী হতেন, তাহলে বেঁচে থাকার সর্বময় চেষ্টা থাকতো তাঁর সব কাজে। কিন্তু তাঁর কাজকর্ম দেখলে তুমিও বলবে, দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে রাজত্ব করা তাঁর শখ নয়। তুমি তো জানো, কতোবার তিনি গযনী থেকে কতো দূরে হিন্দুস্তানে গিয়ে যুদ্ধ করেছেন। এখনও তিনি গযনী থেকে শত শত মাইল দূরে হিন্দুস্তানের সবচেয়ে দুর্গম এলাকায় যুদ্ধ করতে গেছেন। তিনি ইসলামের সৈনিক, ইসলামের প্রচার-প্রসারে লিপ্ত একজন ধর্মপ্রচারক। তিনি একজন সফল মূর্তি ধ্বংসকারী।"

"নতুন বাদশা আবুল আব্বাস আর বয়োজ্যেষ্ঠ উজির যখন পরস্পর এসব কথাবার্তা বলছিলেন, সুলতান মাহমূদ তখন দক্ষিণ কাশ্মীরের লোহাকোট দুর্গ অবরোধ করে বৈরী মওসুম ও দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীরের ফাঁদে আটকে গেছেন। তীব্র তুষারপাতে চাপা পড়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে তার সহযোদ্ধারা।

তুমি তো দেখতে পাচ্ছো, কতোবার স্বেচ্ছায় মৃত্যুফাঁদে পা দিয়েছেন সুলতান। বললেন হারেস। হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজাদের সামরিকশক্তি কোন মামুলী ব্যাপার নয়। হিন্দুস্তানের রাজশক্তির বিরুদ্ধে বর্তমান মুসলিম জগতের মধ্যে শুধু সুলতান মাহমূদই টক্কর দিতে পারেন এবং তিনি তা দিচ্ছেনও। এ ধরনের লড়াকু যোদ্ধারা কখনো কাউকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন না।"

"আমি নিহত হতে চাই না।" বললেন আবুল আব্বাস। যে আমাকে জীবিত রাখতে চাইবে এবং নিজেও জীবিত থাকতে চায়, আমি তাকে মিত্র বানাতে চাই। আপনি আমাকে পরামর্শ দিন, আমি কি তুর্কিস্তানের খানদেরকে মিত্র বানাবো, না সুলতান মাহমূদকে মিত্র বানাবো?

সুলতান মাহমূদকেই আমার সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী মনে হয়। সুলতান মাহমূদ সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস যা-ই থাকুক না কেন, যেভাবে তিনি শক্তির

জোরে শত্রুদের পদানত করে তাদের এলাকা গযনী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেছে, একদিন হয়তো আমাকেও বলে বসতে পারে আমার আনুগত্য স্বীকার করে নাও। তাছাড়া আমার চতুর্পার্শ্বের শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আমার দরকার একজন শক্তিশালী মিত্র।"

সেই শক্তি ও মিত্রের দাবী পূরণ করার ক্ষমতা একমাত্র সুলতান মাহমূদেরই রয়েছে।" বললেন উজীর আল হারেস।

"আমার মনের কথাগুলো আজ আপনার কাছে বলতে চাই সম্মানিত উজীর।" বললেন আবুল আব্বাস। শুধু কথা আর অঙ্গীকারের দ্বারা বন্ধুত্বের সম্পর্ক ততোটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আমার মনে মিত্রতা দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী করার একটা চমৎকার কৌশল এসেছে। আমি সুলতান মাহমূদের বিধবা বোনকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবো। সে আমার বড় ভাইয়ের বিধবা। তাকে তখনই আমার খুব ভালো লাগতো। বয়সে সে হয়তো আমার চেয়ে এক অর্ধ বছরের বড় হবে; কিন্তু সুলতান মাহমূদ কি আমার সাথে তাঁর বোনের বিয়ের ব্যাপারে রাজী হবেন?"

"স্মিত হেসে আবুল হারেস বললেন, "এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারবো না। তবে আপনি কি এই ঝুঁকির ব্যাপারটি ভাবেন না? আপনার ভাইকে যদি সে বিষ দিতে পারে, তবে আপনাকেও সে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে পারে।"

"না, নাহিদা আমাকে বিষ দিতে পারে না।" আকাশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে স্বগতোক্তির মতো করে বললেন আবুল আব্বাস। না, লাবণী আমাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে পারবে না। কিছুটা উচ্চৈঃস্বরেই উচ্চারণ করলেন আব্বাস। আবুল হারেসের দিকে তাকিয়ে বললেন, লাবণী জানতো আমি তাকে কতোটা ভালোবাসি। আমি ছিলাম তার স্বামীর ছোট ভাই, দেবর।

সে আমাকে খুবই ভালোবাসতো। আদর করে আমাকে শাহজাদা ডাকতো।... সত্য কথা বলতে কি, ভাইয়ের মৃত্যুর পর আমার মনে হয়েছে, আমি ভাইয়ের শূন্যতাকে সহ্য করতে পেরেছি; কিন্তু লাবণীর চলে যাওয়াকে সহ্য করতে পারছি না।"

"আপনি কি নাহিদার ভালোবাসার টানে তাকে বিয়ে করতে চান, নাকি সুলতানের সাথে বন্ধুত্ব ও মিত্রতা মজবুত করার জন্য?"

"উভয়টিই আমার লক্ষ্য।" উজিরের জিজ্ঞাসার জবাবে বললেন আবুল আব্বাস। তবে নাহিদার প্রতি আমার ভালোবাস হয়তো প্রাধান্য পাবে। আসল কথা হলো, নাহিদাও আমাকে ভালবাসতো। কিন্তু তার ও আমার এই ভালোবাসার মধ্যে কোন কদর্যতা ছিলো না। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিলো অনেকটা ভাই-বোনের মতো অথবা গুণবতী ভাবী আর স্নেহশীল দেবরের মধ্যে যেমনটি হয়ে থাকে।

অবশ্য এখন অবস্থা অনেকটাই বদলে গেছে। তখন নাহিদার সাথে আমার এতোটাই গভীর হৃদ্যতা ছিলো যে, আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী আলনূরী এ ব্যাপারে আমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট ছিল। আল নূরীর পিতা আবু ইসহাককে আপনি জানেন। তিনি আমাদের সেনাবাহিনীর একজন শীর্ষ কমান্ডার এবং সেনাপতি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আল নূরী নাকি তার কাছে আমার ব্যাপারে নালিশ করেছে। আমি শ্বশুর সাহেবকে বলেছি, আলনূরী আমাকে ও আমার ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে নিয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করেছে। ভবিষ্যতে যেন সে আর এমন দুঃসাহস না করে। আমার এই কথা বলার পর তার চেহারার যে অবস্থা আমি দেখলাম, তা মোটেও ভালো মনে হলো না।"

"সুলতান মাহমূদকে হিন্দুস্তান থেকে ফিরে আসতে দাও। তোমার এই প্রস্তাবে যেমন তোমার প্রেম-ভালোবাসা রয়েছে, তদ্রূপ এতে কৌশলী রাজনীতিও রয়েছে। এ ব্যাপারে তুমি আরো চিন্তা করো, আমিও ব্যাপারটি নিয়ে আরো ভাবি। বললেন উজির।

আবুল আব্বাস আর তার প্রধান উজির আবুল হারেস যখন সুলতান মাহমূদের সাথে মৈত্রী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন নিয়ে মতবিনিময় করছিলেন, সুলতান মাহমূদ তখন কাশ্মীরের বৈরী পরিবেশে ব্যর্থতার গ্লানিতে বিপর্যস্ত হচ্ছিলেন। তার অজেয় বাহিনীর সৈন্যরা ঝিলম নদীর শীতল পানিতে ভেসে যাচ্ছিল আর তুষারপাতে বরফের নিচে তলিয়ে যাচ্ছিল।

এ ঘটনার প্রায় ছয় মাস পর উজির আবুল হারেস একদিন বাদশা আবুল আব্বাসকে একান্তে বললেন, গযনী থেকে বিস্ময়কর খবর এসেছে! সুলতান মাহমূদ কাশ্মীর থেকে এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে এসেছেন যে, তার সাথে এক-দশমাংশ সৈন্যও ফিরে আসেনি। যারা ফিরে এসেছে এদের অধিকাংশই মারাত্মকভাবে আহত। এবারের ফিরে আসায় মাহমূদের সাথে

হিন্দুস্তানের সোনা দানা বোঝাই জঙ্গী হাতি যেমন ছিলো না, কোন হিন্দু বন্দীও ছিলো না। তাঁর গোটা সামরিক শক্তিই সেখানে ধ্বংস হয়ে গেছে।"

"এরপরও আমি তাঁর বোনকে বিয়ে করতে চাই।" বললেন আবুল আব্বাস। আপনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আপনার মতো অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু আপনি মনে হয় আমার কথা সমর্থন করবেন। আমি যদি দুঃসময়ে সুলতান মাহমূদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াই, সে নিশ্চয়ই আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ও হিতাকাঙ্ক্ষী থাকবে। কখনো যদি আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তখন সে নিশ্চয়ই আমাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে।

আপনি বলুন তার কাছে আমার প্রস্তাব পাঠানোর উপযুক্ত সময় কোনটি হতে পারে? আমাকে কি নিজে যেতে হবে?"

"এখনই উপযুক্ত সময়।" বললেন, আবুল হারেস। তার এই শোচনীয় পরাজয়ে সহমর্মিতা জানানো দরকার। তা ছাড়া কূটনৈতিক রীতি রক্ষায় এটাও বলা যেতে পারে যে, আমরা তার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এ ক্ষেত্রে তোমার যাওয়া জরুরী নয়। আমিই যাবো এবং বিয়ের প্রস্তাবও তাকে দিয়ে আসবো।

কয়েক দিন পর খাওয়ারিজমের প্রবীণ উজীর আবুল হারেস দু'জন দূত এবং কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীসহ কয়েকটি উপঢৌকন বোঝাই উট নিয়ে গযনী পৌঁছলেন। সুলতান মাহমূদের কাছে খবর গেলো, খাওয়ারিজমের বাদশা আবুল আব্বাসের উজির সুলতানের সাথে দেখা করতে এসেছেন। খবর শুনে তাৎক্ষণিকভাবেই উজিরকে সুলতানের কাছে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়া হলো।

খাওয়ারিজমের বাদশা শাহ্ আবুল আব্বাস মামুন সুলতানে আলী মাকাম এর খেদমতে কিছু উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। সেই সাথে কাশ্মীর অভিযানে আপনার অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি ও পরাজয়ের জন্যে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। শাহে খাওয়ারিজম আরো বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা সুলতানকে এতোগুলো বিস্ময়কর বিজয়ে পর একটি মাত্র ব্যর্থতা দিয়েছেন, এটিও ধারাবাহিক সাফল্যেরই অংশ। আল্লাহ্ তাআলা গযনী সুলতানকে যে মনোবল ও সাহস দিয়েছেন, আশা করি পরাজয় তাকে কাবু করতে পারবে না। শাহ্ বলেছেন, আমি প্রয়োজনে যে কোন ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত। কেননা, বিপদেই তো ভাই ভাইয়ের কাজে লাগে।"

আমাদের এখানকার রীতি ও শিষ্টাচার এটাকে সমর্থন করে না যে, একজন মুসলমান বাদশাহর সম্মানিত উজির সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবে। আপনি আমার পাশের আসনে বসুন।" আবুল আব্বাসকে সম্মানের সাথে কথাগুলো বললেন সুলতান।

সুলতানের আবদারে প্রবীণ কূটনীতিক ও মন্ত্রী আবুল হারেস আসনে বসলেন। অতঃপর সুলতান মাহমূদ বললেন, "আমি খাওয়ারিজম বাদশাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমি যখন আমার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আমার এই দুঃসময়ের সুযোগে স্বার্থসিদ্ধির আশঙ্কা করছি, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর হাত বাড়িয়েছেন। তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবেন, নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য বন্ধুর আমার খুব প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে আমি সাহায্য-সহযোগিতা চাই না।"

খাওয়ারিজমের অভ্যন্তরীণ অবস্থার ব্যাপারে আমারও প্রবল আগ্রহ আছে। আবুল আব্বাস একেবারেই তরুণ। সাগর উপকূলে বুখারায় কী ঘটছে, এসব ব্যাপার কি সে বোঝে? সে কি জানে গভর্নর আলাফতোগীনের দৃষ্টিভঙ্গী কী?"

"সে না জানলেও এসব ব্যাপার আমার অজানা নয় সুলতান।" বললেন, উজীর আবুল হারেস। গভর্নর আলফতোগীনের কর্মকাণ্ড আমার কাছেও সন্দেহজনক মনে হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রতি আমাদের আস্থা আছে।

আমি যতোটুকু জানি, তাতে বলতে পারি, সেনাদের উপর আপনাদের বেশী আস্থা রাখা মোটেও ঠিক নয়। বললেন সুলতান। সেনাবাহিনীতে সাধারণ সৈনিকদের নীতি নির্ধারণে কোন ভূমিকা থাকে না। মূলত সেনাপতি ও ডেপুটি সেনাপতিরাই সেনাবাহিনীর মূলশক্তি। তারাই নীতি নির্ধারণ করে, সাধারণ সৈনিকরা হয় তাদের ঘুটি। এদেরকে ব্যবহার করা হয় মাত্র। অনেক সময় সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে শাসক হওয়ার নেশা চাপে আর তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বলির পাঠায় পরিণত হয় সাধারণ সৈনিকরা। দুর্নামটাও এসে পড়ে সাধারণ সৈনিকদের উপর। জনসাধারণের যতো ক্ষোভ-নিন্দা সব পড়ে সাধারণ সৈনিকদের উপর। শাস্তিও পেতে হয় তাদেরই। কর্মকর্তারা থাকে পর্দার আড়ালে, জনতার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আপনাকে সেনাকর্মকর্তাদের প্রতি কড়া নজর রাখতে হবে।"

নানা বিষয় নিয়ে দীর্ঘ সময় উজীর ও সুলতান মতবিনিময় করছিলেন। উজীর আবুল হারেস ছিলেন অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী লোক। তিনি কথায় কথায় বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে ফেললেন।

"সম্মানিত সুলতান! আবুল আব্বাস আপনাকে সহযোগিতার প্রস্তাব করেছেন ঠিকই; কিন্তু সত্যিকার অর্থে তিনিই আপনার সাহায্য প্রত্যাশী। অবশ্য এখনই তার কোন সাহায্যের প্রয়োজনই নেই। তিনি আপনার সাথে দৃঢ় মৈত্রী গড়ে তুলতে আগ্রহী। তিনি এমন একজন শাসকের সাথে মৈত্রী গড়ে তুলতে চান, যে তাকে কখনো ধোঁকা দেবে না। আর এমন ব্যক্তি আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। স্থায়ী ও অটুট মৈত্রী বন্ধনের জন্য তিনি আপনার বোন, তার মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করতে চান। সুলতান যেন তার এই আবেদন গ্রহণ করেন একান্তভাবে তিনি তা কামনা করেন।"

"বিয়ের ফয়সালা আমার বোন নিজে করবেন। বললেন সুলতান। প্রশাসনিক স্বার্থ রক্ষার জন্য আমি বোনকে ব্যবহার করতে মোটেও রাজি নই। আমি তাকে পরামর্শ দিতে পারি, খাওয়ারিজম ও গযনীর সম্পর্কের গুরুত্ব বোঝাতে পারি; কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত তার উপর চাপিয়ে দিতে পারি না। কারণ, বিয়ের বিষয়টি একান্তই তার মনের ব্যাপার। আপনাকে এর জবাব পেতে হলে কিছুদিন সময় দিতে হবে।"

"খাওয়ারিজমের মসনদে আসীন হওয়ার আগ পর্যন্ত আবুল আব্বাসকে একজন সুন্দর মনের মানুষ হিসেবেই আমি জানতাম।" সুলতানকে বললো তার বিধবা বোন। "তখন সে ছিল নিতান্তই বালক। এখন সে যুবক। সেই সাথে মসনদে আসীন বাদশা। এ পর্যায়ে তাকে পর্যবেক্ষণ বা তার সম্পর্কে কিছু বলা মুশকিল। নিশ্চয়ই এখন তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে।"

"তার এই পয়গামের জবাব তুমি দেবে। আমি তার প্রতিনিধিকে জানিয়ে দিয়েছি, আমি বোনের উপর এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবো না।"

"সে কথা হয়তো ঠিকই আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে আপনার পরামর্শ আমার দরকার আছে। আপনি যদি মনে করেন, খাওয়ারিজমের বাদশাকে আমি বিয়ে করলে গযনীর কোন উপকার হবে, তাহলে তাকে আমি বিয়ে করতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করবো না। কোন বাদশাকে বিয়ে করে তার প্রাসাদের রওনক বাড়ানোর আগ্রহ আমার নেই।

তদ্রূপ কোন শাহের বউ হয়ে সম্রাজ্ঞী সাজার অভিলাষও আমার হয় না। যে ভাইয়ের প্রতিটি দিবানিশি কাটে অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে জিহাদরত অবস্থায়, তার বোন কোন শাহের রাজপ্রাসাদে রাজরাণী হয়ে বিলাস-ব্যসনে বিভোর হতে পারে না। আমাকে আপনি পরিষ্কার করে বলুন, খাওয়ারিজম শাহের তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে তার সাথে আমার বিয়ে হলে এখানকার মুসলিম ও গযনী সালতানাতের কোন কল্যাণ হবে কি? যদি তা হয়, তবে যে কোন দিন আমি আবুল আব্বাসকে বিয়ে করতে সম্মত আছি।"

"খাওয়ারিজমের সৈন্যদেরকে জিহাদে ব্যবহার করার সুযোগ আছে।" বললেন সুলতান মাহমূদ। ছোট ছোট মুসলিম রাজ্যের শাসক এবং মুসলিম রাজা-বাদশাহরা পরস্পর বিরোধে লিপ্ত। কোন শক্তিশালী প্রতিপক্ষের আক্রমণ আশঙ্কা ঘনীভূত হলেই কেবল মুসলিম বাদশাহরা কয়েকজন মিলে মৈত্রী গড়ে তোলে। ইসলামের স্বার্থে এরা কখনো কোন জোট বা মৈত্রী গড়তে আগ্রহী নয়।

মুসলিম শাসকরা পরস্পর বিরোধে লিপ্ত। এই সংঘর্ষ আর বিরোধকে অতি সংগোপনে ইন্ধন জোগাচ্ছে ইহুদী-নাসারা গোষ্ঠী। আমি পরস্পর বিচ্ছিন্ন মুসলিম শাসকদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই। খাওয়ারিজম একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। কিন্তু আমি খবর পাচ্ছি, খাওয়ারিজমের ভেতরে ভেতরে চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। মনে হয় আবুল আব্বাস এ ব্যাপারে মোটেও অবগত নয়। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন আবুল আব্বাসকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারে। এমনও হতে পারে, আমি যখন আমার সৈন্যঘাটতি পূরণে ব্যস্ত, এই সুযোগে খাওয়ারিজমের সৈন্যরা গযনী আক্রমণ করে বসবে। আমি যে কোন অবস্থায় ওদের প্রতিরোধ করতে পারবো; কিন্তু আমার সৈন্য সংখ্যা নিতান্তই কম। তা ছাড়া এটা তো হবে স্রেফ গৃহযুদ্ধ। দু'টি মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধে ইসলামের শক্তি ক্ষয় হবে আর এই সুবিধা নেবে অমুসলিমরা। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এখন গযনীর সাথে যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধে সবচেয়ে উপকৃত হবে হিন্দুস্তানের পৌত্তলিক শাসকরা।"

"আপনি যদি মনে করেন, আবুল আব্বাসের স্ত্রী হয়ে আমি তাকে আলাফতোগীনের কুমন্ত্রণা ও চক্রান্ত থেকে রক্ষা করতে পারবো, তাহলে এই বিয়েতে আমার কোন আপত্তি নেই।" বললো নাহিদ।

"এটি তুমিই ভালো বলতে পারবে। আচ্ছা, তুমি যখন তার ভাইয়ের স্ত্রী ছিলে, তখন তার উপর তোমার কেমন প্রভাব ছিলো? তখন কি তার সাথে তোমার কোন জানাশোনা ছিলো?" বললেন সুলতান।

"তখন ছিলো আমার একনিষ্ঠ ভক্ত।" বললো নাহিদ।

ওকে আমি খুবই আদর করতাম। সে আমার স্নেহ-মমতার জন্যে উদগ্রীব ছিলো। কারণ, অনেক আগেই তার মাতৃবিয়োগ ঘটে। এরপর তার পিতা নিহত হন। ছোট্ট আবুল আব্বাসকে মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের শূন্যতা অনুভব করতে দিইনি আমি। সে বেশির ভাগ সময় আমার কাছেই থাকতো। শাহজাদা ছিলো সে। কিন্তু শাহজাদা হলেও মানবিক মায়ামমতার ঘাটতি শান-শওকত দিয়ে পূরণ হয় না। সে আমাকে মা ও বড় বোনের মতোই শ্রদ্ধা করতো। প্রথমে সে বিয়ে করলো। কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার অপর এক স্ত্রীকে ঘরে তুললো। কিন্তু তবুও মনের প্রশান্তির জন্য প্রাণ খুলে দুঃখ-সুখের কথা বলতে সে আমার কাছেই ছুটে আসতো। কিন্তু তার ভাইয়ের ইন্তেকালের চার মাস পর যখন আমি তাদের প্রাসাদ ছেড়ে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, ভাইজান, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, পরিণত একটি যুবক হয়েও সে তখন শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদছিলো। তার ভাইয়ের মৃত্যুতেও সে এতোটা কান্নাকাটি করেনি।"

"তাহলে তুমি তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজের কব্জায় নিয়ে আসতে পারবে। তার হৃদয়ে শুধু গযনী সালতানাতের নয়– ইসলামের মমতা তৈরী করতে হবে। আমার সালতানাতকে ঝুঁকিমুক্ত করার চেয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে গজিয়ে ওঠা হিংস্র শয়তানগুলোকে কাবু করাই আমার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।"

"তার মন-দেমাগ যদি বাদশাহীর তখ্‌তে বসে বিগড়ে না গিয়ে থাকে, তাহলে আশা করি, আমি তাকে পথে আনতে পারবো। বললো নাহিদ। আপনার সদিচ্ছা পূরণে এবং ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমি আমার আবেগ-অনুভূতি কুরবানী দিতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করবো না। আমি খাওয়ারিজমের সেনাবাহিনীর দৃষ্টি কাফেরদের প্রতি ঘুরিয়ে দেবো। আমি আপনার সাথে রণাঙ্গনে জিহাদে যেতে পারবো না বটে; কিন্তু আপনার জিহাদে শক্তিবৃদ্ধিতে জীবন তো দিতে পারবো।"

"নাহিদের কথাবার্তা শুনে সেদিনই প্রচুর উপহার-উপঢৌকন দিয়ে সুলতান মাহমূদ আবুল আব্বাস মামুনের কাছে পয়গাম পাঠালেন, পূর্ব প্রস্তাব ঠিক থাকলে সে সুলতানের ছোট বোন নাহিদের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

এক মাসের মধ্যে আবুল আব্বাস ও নাহিদের বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু এ বিয়ে তো বিয়ে নয়, এই বিয়ে সুলতানের জন্য ভয়াবহ এক টর্নেডোতে রূপান্তরিত হলো, যে টর্নেডো গোটা মুসলিম বিশ্বকেই নাড়িয়ে দিল। শুধু ডাঙায় নয়– সুলতান মাহমূদকে এর মূল্য দিতে সমুদ্রেও যুদ্ধ করতে হলো। উভয় পক্ষের হাজারো নৌকা জলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো। ভয়াবহ এই যুদ্ধে আগে চালানো হলো অতিসূক্ষ্ম চক্রান্তের খেলা। যে কূটনৈতিক চক্রান্তের ঘুটি উভয়পক্ষই চেলে ছিল বিয়ের আসরে।

বিয়ে হয়ে গেল। অনেকটা সাদামাটাভাবেই সুলতান তার আদরের ছোট বোন নাহিদকে খাওয়ারিজমের তরুণ বাদশা আবুল আব্বাসের বন্ধনে তুলে দিলেন। আবুল আব্বাস খুশী মনে নতুন বউ নিয়ে বাড়ীতে ফিরে বিশাল আকারে ওলীমার আয়োজন করলেন।

খাওয়ারিজ শাহের এই তৃতীয় বিয়েতে রাজধানী জুরজানিয়াকে এমন আলোকসজ্জায় সাজানো হলো যে, রাতের রাজধানীও দিনের মতোই আলো ঝলমলে রূপ পরিগ্রহ করলো। প্রতিবেশী সব মুসলিম শাসকদের দাওয়াত করা হলো। হাজার হাজার মেহমানের পদভারে স্পন্দিত রাজধানী।

সুলতান মাহমূদের পক্ষ থেকে সুলতানের পরিবর্তে তাঁর সেনাবাহিনীর দুই প্রবীণ সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ এবং সেনাপতি আলতানতাশ প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তাদের সাথে ছিলো আরো কয়েকশত সৈনিক। এদের ছাড়াও ছিলেন গোয়েন্দা প্রধান ও নাশকতা প্রতিরোধ ইউনিটের চিফ কমান্ডার।

বিশাল এই আয়োজনে খাওয়ারিজ রাষ্ট্রের অন্যতম প্রদেশ বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন হাজির হলেন বিশেষ জাঁকজমক নিয়ে। আবুল আব্বাসের সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অফিসার ও সেনাপতিরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত। বুখারা অঞ্চলের সেনাপতি খমরতাশ আর সেনাবাহিনীর অন্যতম প্রভাবশালী সেনাপতি আবুল আব্বাসের দ্বিতীয় শ্বশুর সেনাপতি আবু ইসহাক গর্বিত ভাবভঙ্গি নিয়ে অনুষ্ঠানে সমাসীন। ঘটনাক্রমে খাওয়ারিজমের এই তিন

মহারথি পাশাপাশি আসনে উপবিষ্ট এবং প্রত্যেকের চেহারাতেই আনন্দ-উচ্ছ্বাসের বদলে চাপা উত্তেজনা ও ক্ষোভ পরিস্ফুট। দৃশ্যত তারা সবাই সুলতান মাহমূদের দুই প্রতিনিধির সাথে হাসিমুখেই হাত মেলালেন; কিন্তু কুশল বিনিময়ের পরই তারা সুলতানের প্রতিনিধিদের থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে আসন নিলেন। তাদের পাশেই গ্রাম্য বেশে আগে থেকেই বসা ছিলেন সুলতান মাহমূদের বিশেষ ইউনিটের দুই দক্ষ পরিচালক। এদেরকে বিশেষ দিক-নির্দেশনা ও দায়িত্ব দিয়ে বিশেষ উদ্দেশ্যে বিয়ে অনুষ্ঠানে পাঠিয়েছিলেন সুলতান মাহমূদ।

"তোমরা মনে করো না, আমার বোনকে বিয়ে করে আবুল আব্বাস আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে গেছে।" বললেন সুলতান মাহমূদ। হতে পারে আবুল আব্বাস আমার সাথে সত্যিকার অর্থেই সুসম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী; কিন্তু তোমরাই তো খবর দিয়েছো, ওখানকার প্রশাসনও সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে অগ্নুৎপাতের জন্য লাভা তৈরী হচ্ছে। চক্রান্ত ও প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের কানাঘুষা চলছে। সেখানে গিয়ে তোমরা নিজেদেরকে আলতানতাশ ও আলতাঈ এর সফরসঙ্গী হিসেবে পরিচয় দেবে না, বরং তোমরা থাকবে সাধারণ বেশে। পরিচয় দেবে সমরকন্দের ব্যবসায়ী হিসেবে। সেখানে বহু লোকের সমাগম হবে, খেলতামাশা, আতশবাজী হবে। এসব খেলতামাশার প্রতি তোমরা মনোযোগী হবে না। তোমাদের দৃষ্টি থাকবে পর্দার অন্তরালে অতি সংগোপনে যে চক্রান্তের খেলা শুরু হয়েছে, সেদিকে। তিনজন লোকের পেছনে তোমরা ছায়ার মতো লেগে থাকবে। তাদের কথা সরাসরি শুনতে না পারলেও তাদের চালচলন, ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে চেষ্টা করবে তারা আসলে কী করতে চাচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

তিনজনের মধ্যে একজন হলো, বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন, দ্বিতীয়জন আবুল আব্বাসের দ্বিতীয় শ্বশুর সেনাপতি আবু ইসহাক, তৃতীয়জন বুখারা অঞ্চলের সেনাপতি খমরতাশ।

এই দুজনকে এর চেয়ে বেশী সতর্ক ও জ্ঞান দেয়ার কোনই প্রয়োজন ছিলো না। কারণ এরা উভয়েই দুটি গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা শাখার প্রধান। তারাই খাওয়ারিজমের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কথা তাদের গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। এই দুই ব্যক্তি যখন জুরজানিয়ার

বিয়ে অনুষ্ঠানে হাজির হলেন, তাদের দেখে কারো বোঝার উপায় ছিলো না, এরা সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা শাখার প্রধান এবং মাটির নিচের ঘটনাবলীও এরা দিব্যচোখে দেখতে পারে। তারা একনজর তাকালেই যে কারো ভেতরের মনোভাবও বুঝতে পারে। তারা উভয়েই ব্যবসায়ীদের মতো ঢিলেঢালা পোশাকে সজ্জিত ছিলো।

উভয়েই আলাফতোগীন, খমরতাশ ও আবু ইসহাকের পিছনের সারিতে গিয়ে বসলেন। রাতের প্রজ্জ্বলিত মশালের আলোয় ঘোড়দৌড় শুরু হবে হবে অবস্থা। বিশাল মাঠের চতুর্দিকে শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। এক পাশে বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে বাদশা, নতুন রাণী এবং রাষ্ট্রীয় অতিথিদের আসন। তরবারী প্রতিযোগিতা, মল্লযুদ্ধ ছাড়া নানা ধরনের সামরিক কলা-কৌশল প্রদর্শনীর আয়োজন সম্পন্ন।

হঠাৎ তীব্র ও উচ্চ রণসঙ্গীত বাজিয়ে জানানো হলো নব বরবেশী বাদশা আবুল আব্বাস ও নতুন রাণীবেশী নাহিদার আগমনীবার্তা। আবুল আব্বাস নববধূ নাহিদাকে নিয়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন। নাহিদা দীর্ঘাঙ্গি, সুন্দরী যুবতী। তার প্রতিটি পদক্ষেপে রাজকীয় গাম্ভীর্যতা ও অবয়বে দীপ্তিময় আভা। যুবক বাদশা আবুল আব্বাসও অপূর্বসাজে সজ্জিত।

দৃঢ় পদক্ষেপে নাহিদাকে নিয়ে তিনি রাজকীয় আসনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। সেনাবাহিনীর বাদক দল আকাশ-বাতাস মুখরিত করে আগুন ঝরানো বাজনা দিচ্ছে। চতুর্দিকে লাখো জনতার কণ্ঠে হর্ষধ্বনি। মহামান্য বাদশা আবুল আব্বাস দীর্ঘজীবী হোক, সুখময় হোক তাদের নতুন দাম্পত্য, দীর্ঘতর হোক মামুনী শাসন। আবুল আব্বাস ও নাহিদার পিছনে পিছনে আবুল আব্বাসের প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীও রাণীর পোশাকে সজ্জিত হয়ে আসছিলো। তবে তাদের চেহারায় তেমন কোন জৌলুস ছিলো না, ছিলো না কোন আনন্দ-ফুর্তি আবেগ ও উচ্ছ্বাসের চিহ্ন।

সুলতান মাহমূদ তাঁর বোনের বিনিময়ে শুধু খাওয়ারিজম শাহকে নয়- গোটা খাওয়ারিজম সালতানাতকেই খরিদ করতে চাচ্ছে। বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বললো আবুল আব্বাসের দ্বিতীয় শ্বশুর এবং সেনাবাহিনীর অন্যতম সেনাপতি আবু ইসহাক।

আবু ইসহাকের এ কথায় পিছনের দিকে তাকালেন বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন। তাদের পেছনেই সুলতান মাহমূদের দুই শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তা ব্যবসায়ী বেশে বসে পরস্পর কথা বলছে।

"আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?" স্মিত হেসে পিছনের দুজনকে জিজ্ঞেস করলেন গভর্নর আলাফতোগীন।

উভয়েই স্মিতহাস্যে আলাফতোগীনের প্রত্যুত্তরে মাথা দোলালেন। তারা উভয়েই মাথা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিলেন আলাফতোগীনের ভাষা তারা বুঝতে পারছেন না। অথচ তাদের মাতৃভাষাই ছিলো ফারসী। আলাফতোগীন ফারসী ভাষাতেই তাদের পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। আলাফতোগীন, খমরতাশ ও আবু ইসহাক প্রত্যেকেই নানাভাবে তাদের পরিচয় জানার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু দুই গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিপুণতার সাথেই তাদের বোঝাতে সক্ষম হলেন, তাদের কোন কথাই তারা বুঝতে পারছেন না। এক পর্যায়ে তাদের একজন বললেন, 'ফিরকতাগ'। ফিরকতাগ জুরজানিয়া থেকে পূর্বদিকে অনেক দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ী এলাকার নাম। ওখানকার ভাষা ছিলো ভিন্ন।

"এরা আমাদের ভাষা বোঝে না"। দুসঙ্গীকে বললেন বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন। আমি ওদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। ঠিক আছে...। আবু ইসহাক! আপনি কি যেনো বলতে চাচ্ছিলেন?"

"বলছিলাম, এ বিয়ে শুধু আবুল আব্বাস আর নাহিদার মধ্যে হয়নি। এই সম্পর্কের মাধ্যমে গোটা খাওয়ারিজমকেই বোনের বিনিময়ে খরিদ করতে চাচ্ছে সুলতান মাহমূদ। এখান থেকে সুলতান মাহমূদ আর তার বোন আবুল আব্বাসকে আঙুলের ফাঁকে ঘোরাবে, আঙুলের ইশরায় নাচাবে। সে বুঝতেই পারবে না 'খাওয়ারিজমের উপর গযনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আপনি কি এমন ন্যাক্কারজনক অধীনতা মেনে নেবেন আলাফতোগীন?"

"আরে, সেই সময়টা আসতে দাও না"। বললেন আলাফতোগীন। খাওয়ারিজমের মাটিতে কোন গযনী সৈন্যের পা পড়লে ওদের চিহ্নও কেউ খুঁজে পাবে না।"

"আগে থেকেই এজন্য প্রস্তুতি নেয়া দরকার।" বললেন সেনাপতি খমরতাশ।

“সেনাবাহিনী আপনার নিয়ন্ত্রণে। সৈন্যদেরকে আপনি নিজের আয়ত্তে রাখুন।”

“দেখো, এসব কথা কি এখানে আলোচনা করা ঠিক হবে?” উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন সেনাপতি আবু ইসহাক।

“চিন্তার কারণ নেই। আমাদের সবচেয়ে কাছে বসা লোক দু'জন আমাদের ভাষা বোঝে না।” বললেন সেনাপতি খমরতাশ।

“ওরা আমাদের ভাষা না বুঝুক, ডানে-বামে কথা চলে যেতে পারে। সতর্কতার বিকল্প নেই।” বললেন আলাফতোগীন।

আচ্ছা আবু ইসহাক! আবুল আব্বাসের উপর আপনার মেয়ের কি কোন প্রভাব আছে?”

“আছে বৈকি। কিন্তু এখন কতটুকু থাকবে সেটাই চিন্তার বিষয়। মাহমূদের বোন নাহিদা খুবই চালাক। মনে হয় এখন আর আমার মেয়ে তার প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে না।

“তাদের পিছনে বসে সুলতান মাহমূদের দুই গোয়েন্দা কর্মকর্তা তাদের কথাবার্তা শুনছিলো। আলাফতোগীন ও তার সাথীরা যখনই তাদের দিকে তাকাতো, তখনই তারা উভয়কেই ময়দানের খেলা দেখায় মগ্ন দেখতে পেতো। তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে লাখো দর্শক জনতার হৈ চৈ আর উল্লাস ধ্বনিতে গোটা এলাকা সরগরম। এরই মধ্যে সুলতান মাহমূদের দুই গোয়েন্দা গভর্নর আলাফতোগীন ও তার সাথীদের কর্থাবার্তা শোনার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু তারা বেশীক্ষণ আর সেই বিষয়ে আলাপ করলো না। প্রসঙ্গ বদল করে অতি সাধারণ মজলিসী কথাবার্তা বলতে শুরু করলো। কিন্তু প্রাথমিক *কথাবার্তা শুনেই সুলতানের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বুঝতে পেরেছিলো এরা এই বিয়েতে মোটেই খুশী হতে পারেনি*। ভয়ঙ্কর কোন চক্রান্তের আয়োজনে তারা ব্যস্ত। অচিরেই তারা বাদশা আবুল আব্বাসের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেবে।

মাঝরাত পর্যন্ত চললো আবুল আব্বাসের বিবাহোত্তর জাকজমকপূর্ণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। মাঝরাতের পর অনুষ্ঠান শেষে সবাই যার যার মতো ঘরের পথ ধরলো। দূরের অতিথিরা তাদের জন্য নির্দিষ্ট অতিথিশালায় ঘুমোতে গেলো।

সবাই যার যার মতো শয়নকক্ষে চলে গেলেও বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন, প্রবীণ সেনাপতি আবু ইসহাক ও সেনাপতি খমরতাশ একই কক্ষে সমবেত হলেন। মধ্যরাতের পর হঠাৎ ভেতর থেকে তাদের কক্ষের দরজা খুলে একজন বোরকা পরিহিতা মহিলা প্রবেশ করলো। ঘরে প্রবেশ করেই মহিলা তার চেহারার নেকাব খুলে ফেললো। এই মহিলা আর কেউ নয়, আবুল আব্বাসের দ্বিতীয়া স্ত্রী সেনাপতি আবু ইসহাকের কন্যা আলজৌরী।

গতরাতের সব কথাই আমি জানতে পেরেছি। একটি আসনে বসতে বসতে বললো আলজৌরী। নাহিদার বাসর রাতের জন্য যে সেবিকাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো, তাকে আমি আগেই হাত করে নিয়েছিলাম। সে আমার কথামতো বাসর রাতে আবুল আব্বাস ও নাহিদার কথাবার্তা শোনার জন্য দরজার সাথে কান লাগিয়ে রেখেছিলো। সে রাতে তার দায়িত্ব ছিলো আবুল আব্বাসের দরজার পাশে থাকা। ফলে তাকে দরজায় কান লাগিয়ে বসে থাকতে দেখেও কারো কিছু বলার ছিলো না।

সেবিকা বুদ্ধি করে কক্ষের একটি জানালার একটি পাল্লা ঈষৎ খুলে রেখেছিলো। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবুল আব্বাস নিজেই সেবিকাকে ডেকে ভেতরে নিয়ে নেয়। সেবিকার উপস্থিতিতেই নাহিদা ও আবুল আব্বাসের কথাবার্তা চলতে থাকে। সেবিকার মুখে যা শুনলাম, তা আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি। নাহিদা আবুল আব্বাসের ঘরে শুধু বউ হয়েই আসেনি– সে একটি কঠিন উদ্দেশ্য এবং ফাঁদ হয়ে এসেছে।

আবুল আব্বাসও তাকে শুধু বউ মনে করে না। আবুল আব্বাসের কথাবার্তা থেকে অনুমিত হচ্ছে, সে নাহিদার প্রেমে অন্ধ এবং নাহিদাকেই সে মনে করে মনের সম্রাজ্ঞী।

সে যুগের রাজকীয় সংস্কৃতি এবং রাজ-রাজাদের একান্ত সেবিকাদের জন্য তাদের বাসর ঘরের একান্ত কথাবার্তা শোনার বিষয়টি বর্তমানের আলোকে উদ্ভট মনে হলেও সে যুগে তা মোটেও অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো না। সেবিকা আলজৌরীর টোপ গিলে আলজৌরীকে আবুল আব্বাস ও নাহিদার যেসব অন্তরঙ্গ কথাবার্তা পাচার করেছিলো, তা ছিলো অনেকটা এরকম–

আবুল আব্বাসের উদ্দেশে নাহিদা বললো, "আবুল আব্বাস! একজন তৃতীয় স্ত্রীর প্রয়োজনে যদি তুমি আমাকে বিয়ে করে থাকো, তাহলে খোলাখুলি

আমাকে সেই কথা বলে ফেলো। তোমার প্রেমকে হৃদয়ের মণিকোঠায় ধারণ করে আমি অনুতাপের কান্না কেঁদে নেবো।"

"না না নাহিদা! তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিলো। নয়তো স্ত্রী হিসেবে নারীর অভাব আমার ছিলো না। কেননা, তুমি আমার ভাইয়ের স্ত্রী থাকা অবস্থাতেও তো আমাকে প্রাণাধিক স্নেহ করতে।"

"তখন ঠিকই তোমাকে ভালোবাসতাম। তবে সেই স্নেহ-ভালোবাসা ছিলো ভিন্ন। মূর্তি সংহারী এক মুজাহিদের বোনের মধ্যে চারিত্রিক স্খলন থাকতে পারে না। স্বামীকে সে ধোঁকা দিতে পারে না। তখন তোমার চলাফেরা ও কথাবার্তা সবকিছুই আমার ভালো লাগতো। সেটি ছিলো একজন গুণমুগ্ধ ভাবীর দেবরের প্রতি পবিত্র মমত্ববোধ, যার মধ্যে কোন পঙ্কিলতা ছিলো না।"

"তাহলে আমি কি এটাই বুঝবো যে, আমাকে তোমার খুব ভালো লাগতো বলেই তুমি আমাকে বিয়ে করেছো?" নাহিদার উদ্দেশ্যে বললো আবুল আব্বাস।

"না, আমি শুধু এজন্য তোমার সাথে বিয়েতে রাজী হইনি। বললো নাহিদা। তোমার যেমন স্ত্রীর অভাব ছিলো না, বিয়ের প্রশ্নে আমারও পুরুষের ঘাটতি ছিলো না। গযনী সালাতানাতে শত শত বীর বাহাদুর সুশ্রী যুবক আমাকে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলো। তোমাকে বিয়ে করার মধ্যে আমার ভালোবাসা ছাড়া আরো উদ্দেশ্য আছে। আমি শুধু তোমার জন্য ভালোবাসাই নিয়ে আসিনি, এনেছি একটি পবিত্র পয়গাম। এ পয়গাম কোন জাগতিক পয়গাম নয় কিংবা আমার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কোন রাজকীয় বার্তাও নয়। এ পয়গাম আল্লাহর দেয়া পয়গাম।

আবুল আব্বাস! তুমি কি এ ব্যাপারে আমার সাথে একমত হবে না যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গযনীকে মূর্তি সংহারীদের শহর বলে জানবে? একথা কি তুমি অস্বীকার করতে পারবে যে, সালতানাতে গযনী প্রতিবেশী মুসলিম রাজন্যবর্গের জন্য কাঁটা হয়ে বিরাজ করছে? তারা সবাই মিলে ইসলামের এই আলোকিত অধ্যায়কে কালিমাযুক্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে?"

"তোমার এই কথাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।" বললো আবুল আব্বাস। তুমি যা বলছো তার সবই সত্য। কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য তো আরো অনেক সময় পাওয়া যাবে। আজকের শুভ রাতে তুমি

এসব জটিল বিষয়ের অবতারণা করছো কেন? তুমি কি আমার প্রেম-ভালোবাসা, আবেগ-উচ্ছ্বাস সবকিছুকে আজ রাতেই রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিতে চাও?”

“হ্যাঁ, তুমি যদি তাই মনে করো, তবে আজ রাতেই আমি তোমাকে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিতে চাই। কারণ, বিয়ের প্রথম রজনীটি যে কোন মানুষের জন্য খুবই পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ। সে কথা তুমি জানো আবুল আব্বাস! বাসর রাত তোমার জন্য নতুন কিছু ন। আমার জন্যও এ রাতটি জীবনের প্রথম নয়। আমি তোমার প্রেম-ভালোবাসা, আবেগ-উচ্ছ্বাস কিছুতেই নষ্ট হতে দেবো না। আমাকে পেয়ে যদি তোমার জীবনের স্বপ্নগুলো আরো রঙিন হয়ে থাকে, তাহলে সেই রঙিন স্বপ্নগুলোকে আমি স্বযত্নে আরো বর্ণিল করে তুলবো। আমার মনের গহীনে পুষে রাখা জটিল কথাগুলো আমাকে বলতে দাও আর তোমার স্বপ্নগুলো আমাকে বুঝবার অবকাশ দাও। এখনও তো রাত অনেক রয়ে গেছে। জীবনে আরো কতো রাত আসবে। আমি তোমার প্রতিটি রাতকেই মোহনীয় করে তুলবো। কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে আমার কটি কথা শুনে নাও।

আজকের যে রাতে আমরা সুখসাগরে সাঁতার দিতে যাচ্ছি, এ রাতটি গযনীর হাজারো কন্যা-জায়া-জননীর জন্য বিষাদে ভরা। গযনীর হাজারো যুবতী আজকের এ রাতেও তাদের প্রাণপ্রিয় স্বামীদের বিরহ যাতনা নিয়ে নির্ঘুম নিষ্পেষণে অতিবাহিত করছে, যাদের স্বামীরা আর কোন দিন তাদের কাছে ফিরে আসবে না। আল্লাহর সেই সৈনিকেরা আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিতে আল্লাহু আকবার স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে হিন্দুস্তান গিয়েছিলো। সেখানে গিয়ে তারা সম্পূর্ণ বৈরী আবহাওয়া ও প্রতিকূল পরিবেশে আটকে পড়ে। যেখান থেকে তাদের অনেকের পক্ষেই ফিরে আসা সম্ভবপর হয়নি। যাওয়ার আগে তারা শপথ করে গিয়েছিলো, তারা যেখানেই যাবে, সেখানে মসজিদ আবাদ করবে, আল্লাহর জমিন থেকে মূর্তিপূজাকে উৎখাত করবে। তারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে দিয়েছে। আমি আজ রাতের সকল প্রেম-ভালোবাসা, সুখ ও আনন্দকে তাদের পবিত্র ত্যাগের জন্য উৎসর্গ করছি...।

আবুল আব্বাস! এদের বিপরীতে তুমি সেইসব ক্ষমতালিপ্সু রাজন্যবর্গের রাজসিকতার দিকে তাকিয়ে দেখ, যাদের ক্ষমতালিপ্সার জন্য প্রতিটি মুসলিম

জনপদ মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে। প্রতিটি মুসলিম রাজ্যেই বিরাজ করছে গৃহযুদ্ধ। আজকের এই পবিত্র রাতে যদি তুমি আমার কথা ধৈর্য সহকারে শোন, তাহলে মুসলিম রাজ্যগুলোতে ভাইয়ের তরবারী ভাইয়ের মাথা দ্বিখণ্ডিত করতে থাকবে। ভাইয়ের ধনুক থেকে ছোঁড়া তীরে ভাইয়ের বুক ঝাঁঝরা হতেই থাকবে। আজকের এই পবিত্র রাতে আমার সেইসব মা-বোন ও তরুণী স্ত্রীদের কথা মনে পড়ছে, যাদের সকল সুখ-আহ্লাদ, স্বপ্ন-সাধনা ক্ষমতালোভী রাজন্যবর্গের অন্যায় বিদ্বেষের আগুনে জ্বলেপুড়ে ভষ্ম হয়ে গেছে। আবুল আব্বাস! তুমি একজন টগবগে যুবক। আমিও যুবতী। এসো, ক্ষণিকের জন্য আমরা বাসর রাতের রঙিন স্বপ্ন ও যৌবনের উচ্ছ্বাস পাশে রেখে কয়েকটি জরুরী কথা আলোচনা করি।

আবুল আব্বাস! তুমি কি আমাকে বলবে, খাওয়ারিজম শাহ্ কেন আজো গযনী আক্রমণ করেনি? তোমার জান্নাতবাসী পিতা কেন হত্যার শিকার হয়েছিলেন? তুমি কি জানো, গযনী আক্রমণ করার জন্য তাকে উস্কানী দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তিনি কিছুতেই গযনী আক্রমণ করতে সম্মত হননি। ফলে তাকে হত্যা করা হলো। তোমার বড় ভাই পিতার অকাল মৃত্যুতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। দিন দিন তার দেমাগ খারাপ হতে লাগলো। আমাকে বিয়ে করার প্রথম রাতেই আমি তাকেও এসব কথাবার্তাই বলেছিলাম। তিনি আমার প্রতিটি কথা হৃদয়ের মণিকোঠায় গেঁথে নিয়েছিলেন।"

"আচ্ছা নাহিদা! তুমি কি একথা জানতে যে, ভাইয়াকে নাকি তোমার ভাই মাহমূদ বিষ পান করিয়েছিলো? সুলতান মাহমূদের অধীনতা সে মেনে নেয়নি বলেই নাকি তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে?"

"তুমি কি একথায় বিশ্বাস করো?" জিজ্ঞেস করলো নাহিদা।

"ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু আমার মধ্যে সংশয় ঠিকই তৈরী হয়েছিলো।" বললো আবুল আব্বাস।

"এখানে সংশয়-সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যে সমরনায়ক শত্রুবাহিনীর সংখ্যার তুলনায় এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-পঞ্চমাংশ সৈন্য নিয়ে সব সময় শত্রুদের প্রবল সামরিক শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে

সক্ষম, তার মতো বীর বাহাদুর কাউকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে পারে না। এটা কাপুরুষের কাজ, বীর পুরুষের নয়।

আমার ভাইয়ের যদি প্রয়োজন হতো তোমার ভাইকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার, তাহলে তিনি জুরজানিয়া এসে এখানকার প্রতিটি ইট বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারতেন এবং তোমার ভাইকে কয়েদ করে জিন্দানখানায় ভরে রাখা তাঁর পক্ষে মোটেও কঠিন ব্যাপার ছিলো না। আমি তোমাকে বলছিলাম, আমাকে বিয়ে করে আনার পর আমি যখন দেখতে পেলাম, এখানে গযনী সালতানাতের বিরুদ্ধে রণপ্রস্তুতি চলছে, কতিপয় কুচক্রী তোমার ভাইকে গযনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ানোর উস্কানী দিচ্ছে, তখন তোমার ভাইকে আমি এ ভয়াবহতা ও ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে বোঝালাম। তিনি আমার কথায় আশ্বস্ত হলেন এবং কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে পা দিতে রাজী হলেন না।

অবশ্য আমারও এ ব্যাপারে সন্দেহ হতো, তোমার ভাইকে এমন কোন বিষ হয়তো খাওয়ানো হয়েছে, যা খুব ধীরে ধীরে শরীরের ভেতরে বিষক্রিয়া ঘটিয়েছে। ফলে দিন দিন তার অসুখ বেড়েই যাচ্ছিল। যদি সত্যিই তাকে বিষ খাওয়ানো হয়ে থাকে, তবে সেই কুচক্রীরাই তাকে বিষ খাইয়েছে, যারা খাওয়ারিজম ও গযনীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধানোর চেষ্টা করছিল।

"তোমার মতে কারা সেই কুচক্রী? কে এই বিষ প্রয়োগের সাথে জড়িত?" নাহিদার প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো আবুল আব্বাস।

"মূল কাজটি মুসলমানরাই করেছে। কিন্তু ওদের পিছনে হাত রয়েছে ইহুদী ও ফিরিঙ্গীদের" বললো নাহিদা। ইহুদী ও খৃস্টান চক্রান্তকারীদের সম্মিলিত চক্রান্তের ফসলই মুসলিম দেশসমূহের মধ্যকার গৃহযুদ্ধ। তাছাড়া কারামতি উপজাতিদেরও এতে হাত আছে। কারণ, আমার ভাই কারামতিদের শীর্ষনেতাকে খতম করে ওদের আখড়া গুড়িয়ে দিয়েছিলেন।"

"নাহিদা! আমি অকালে নিহত হতে চাই না।" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো আবুল আব্বাস।

"এমনটি বলো না। বরং বলো, আমি আল্লাহর পথে নিহত হতে চাই।" বললো নাহিদা।

"দেখছো না, আমার ভাই বারবার হিন্দুস্তানের প্রতিকূল পরিবেশে গিয়ে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে চায়। আমিও এটিই চাই এবং আল্লাহ ও তাই

ভালোবাসেন। তুমি আমার ভাইয়ের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রণাঙ্গন চষে বেড়াও। আল্লাহর পথে তোমাকে উৎসর্গ হতে দেখলে আমি আমার সকল সুখ-স্বপ্ন কুরবান করে দিতেও প্রস্তুত। যদি তুমি এতোটা না-ই পারো, অন্তত গযনী সালতানাতের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা না চালিয়ে গযনীর সাথে মৈত্রী সম্পর্ক শক্তিশালী করো।"

"ঠিকই বলেছো নাহিদা। এ মুহূর্তে সুলতানের একজন শক্তিশালী মিত্র দরকার। কারণ, তাঁর সামরিক শক্তি খুবই দুর্বল হয়ে গেছে।" বললো আবুল আব্বাস।

"তোমার কথা পুরোপুরি ঠিক নয়। গযনীর শক্তি এতোটা দুর্বল হয়ে যায়নি, যতোটা তোমরা মনে করছো।" বললো নাহিদা। এখনো যথেষ্ট সৈন্য রয়েছে গযনীতে। তাছাড়া হিন্দুস্তানী সৈন্যদের ব্যারাক সম্পূর্ণ অব্যবহৃত। তাদেরকে কখনো হিন্দুস্তানের কোন যুদ্ধে ব্যবহার করা হয় না। তাদেরকে এদিকে ব্যবহার করার জন্য রিজার্ভ রাখা হয়েছে।

গযনী সুলতানের অধীনে ওরা খুবই সুখে আছে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে মুসলমান হচ্ছে। হাজার হাজার গযনীবাসী স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছে। এরপরও যে সামান্য ঘাটতি আছে, তাকে পুষিয়ে নেয়ার মতো আত্মশক্তি ও মনোবল গযনী সেনাদের রয়েছে। কাজেই গযনী সালাতানাতকে কোন বহিঃশত্রুর আগ্রাসন থেকে রক্ষার জন্য সুলতান মাহমূদের কোন সামরিক শক্তির সাথে মৈত্রী গড়ে তোলা জরুরী এই ভুল ধারণা মনের ভেতর থেকে দূর করে দাও। সুলতানের চেয়ে বরং তোমার একজন শক্তিশালী মিত্রের খুব প্রয়োজন।"

"তোমার ভাইয়ের সাথে আমি মৈত্রী স্থাপন করবো ঠিক; কিন্তু তার অধীনতা মেনে নেবো না। সে যদি খুৎবায় তার নাম উচ্চারণের প্রস্তাব করে, তবে তো আমি কখনোই তা মেনে নেবো না। নাহিদা! তোমাকে আজ একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, তোমার প্রতি ভালোবাসা ছাড়াও আমার তোমাকে বিয়ে করার অন্যতম উদ্দেশ্যে তোমার ভাইয়ের সাথে মজবুত মৈত্রী গড়ে তোলা। কারণ, ভেতরে বাইরে আমি চরম শত্রুবেষ্টিত। এমতাবস্থায় তার মতো একজন শক্তিশালী মিত্রের আমার খুবই প্রয়োজন। আমি আশা করি, তিনি বন্ধুত্বের হক পুরোপুরিই আদায় করবেন।"

"তাঁর কাছ থেকে বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর অধিকার আদায় করার দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি আবুল আব্বাস। কিন্তু মৈত্রী বড় কথা নয়। মৈত্রী তখনই অর্থবহ হবে, যখন যে কোন দুর্যোগ ও বহিরাক্রমণে খাওয়ারিজম ও গযনীর সৈন্যরা একত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবে।"

"এমনটিই হবে নাহিদা, এমনটিই হবে।" বললেন আবুল আব্বাস।

এরপর আবুল আব্বাস নাহিদাকে বুকে জড়িয়ে আবেগপূর্ণ কথাবার্তা ও আচরণ করতে শুরু করলেন। সেবিকা আলজৌরীকে জানাল, সে মনে করেছিল, যে নারী বাসর রাতে রসকষহীন জীবনমৃত্যু যুদ্ধ-জিহাদের মতো নীরস ওয়াজ নিয়ে মেতে উঠেছিলো, সেই নারীর মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা, আবেগ-সোহাগের বালাই থাকতে পারে না। কিন্তু এক পর্যায়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের কথায় বিরতি দিয়ে নাহিদাও আবুল আব্বাসের কামোদ্দীপক বাসনায় এভাবে সাড়া দিলো যে, তার প্রতিটি শব্দ ও বাক্য ছিল উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনায় ভরপুর। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে আবুল আব্বাসকে কামনার উচ্ছ্বসিত আবেগ ও কামোদ্দীপক উত্তেজনাপূর্ণ কথায় নেশাগ্রস্ত করে ফেললো। ত্রিশের কোঠায় পা দেয়া নাহিদা যেনো সতেরো বছরের তরুণীতে রূপান্তরিত হলো। তার প্রতিটি হাসি ও কথায় যেন টপকে পড়ছিলো মোহনীয় মধুময় সুধা। এমনই যাদুমাখা ছিলো নাহিদার প্রতিটি কথা, যেন তা কঠিন সীসাকেও মোমের মতো গলিয়ে দিতে সক্ষম ছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে আবুল আব্বাসকে শান্ত-সুবোধ শিশুর মতোই প্রেমের অক্টোপাসে বেঁধে ফেলেছিলো নাহিদা। নাহিদার এই দুর্দান্ত তৎপরতার কাছে মনে হলো আবুল আব্বাস নিতান্তই আনাড়ী বালক।

বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন সেবিকাকে দেয়ার জন্য আলজৌরীর হাতে দুটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। আলজৌরীকে বললেন, তুমি সেবিকাকে বাগে রেখে ওর কাছ থেকে আবুল আব্বাস ও নাহিদার মধ্যকার সব কথাই জানতে চেষ্টা করবে। গুরুত্বহীন কথা হলেও তা শুনতে অবহেলা করবে না।"

আলজৌরী এরপর কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। আলজৌরী চলে যাওয়ার পর আলাফতোগীন আবু ইসহাক ও খমরতাশকে বললেন, "আমি আগেই তোমাদের বলেছিলাম, এই বিয়ের মধ্যে গভীর উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। কোন উদ্দেশ্য ছাড়া মাহমূদ তার আদরের বোনটিকে আবুল আব্বাসের তৃতীয় স্ত্রী করে দুইটি সতীনের সংসারে পাঠায়নি।"

"এই মৈত্রী কিছুতেই হতে দেয়া যাবে না।" বললেন আবু ইসহাক। খাওয়ারিজম শাহ আবুল আব্বাস একটা নারীলোভী তরুণ। একের পর এক নারীসঙ্গ লাভের লিপ্সা তাকে অন্ধ বানিয়ে ফেলেছে। আমরা তার বিশ্বস্ত প্রধান মন্ত্রী আবুল হারেসকে আমাদের পক্ষে নিয়ে নেবো।"

"আরে সাবধান! আবুল হারেস খুবই ভয়ঙ্কর লোক।" বললেন আলাফতোগীন। আবুল হারেসের সাথে এসব নিয়ে কোন কথাই বলা যাবে না। সে মামুনী খান্দানের পোষা লোক। মামুনী খান্দানের প্রতি পরম বিশ্বস্ত। যা কিছু করার আমাদেরকেই করতে হবে। আবুল আব্বাস যদি এই নারীর অন্ধভক্তে পরিণত হয়, তবে তাকে বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। আবুল আব্বাস রাজনীতিতে এখনো বালক। সে এখনো বুঝতেই পারছে না, মাহমূদ তার বোনের বিনিময়ে খাওয়ারিজম কিনে নিতে চায়।"

"সেনাবাহিনীকে আমাদের হাতে রাখতে হবে।" বললেন সেনাপতি খমরতাশ। সৈন্যদের অধিকাংশই কিন্তু খাওয়ারিজম শাহের প্রতি বিশ্বস্ত। রাজধানী জুরজানিয়ায় সেনাবাহিনী কম। অধিকাংশ সৈন্য আমার অধীনস্ত রাজ্য বুখারা ও দক্ষিণাঞ্চল হাজারাশিপে অবস্থান করছে। এসব সৈন্যকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে।

এ ব্যাপারে তোমরা আমাকে একটু সময় দাও। একটা না একটা পথ আমি ঠিকই বের করে ফেলব। গৃহযুদ্ধের জন্য সৈন্যদের প্রস্তুত করতে অভিজ্ঞ লোকের দরকার। বললেন আলাফতোগীন।

খাওয়ারিজমের রাজধানী জুরজানিয়া থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে সাগরের তীরবর্তী হাজারাশীপে ছিলো সে দেশের সবচেয়ে বড় সেনা শিবির। দীর্ঘদিন ধরেই খাওয়ারিজম রাষ্ট্রের অধিকাংশ সৈন্য সেখানে অলস সময় কাটাচ্ছিল। তখন চতুর্দিকেই ছিল যুদ্ধের ঘনঘটা। কিন্তু খাওয়ারিজম কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধে না জড়ানোর কারণে এসব সৈনিক দীর্ঘদিন যুদ্ধ থেকে দূরে ছিল। সেনাবাহিনীর কমান্ডার ও সিপাহীরা দিনে-রাতে গল্প-গুজব, আড্ডা, খেল-তামাশা করে বেকার সময় অতিবাহিত করছিল। যুদ্ধ না থাকায় তাদের চর্চা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারটিও হয়ে পড়েছিল গৌণ। অধিকাংশ সৈনিক ছিলো ধর্মে-কর্মে উদাসীন, আরাম-আয়েশে আসক্ত। কমান্ডারদের সিংহভাগ গা ভাসিয়ে দিয়েছিল বিলাসিতায়।

হঠাৎ একদিন দীর্ঘ শশ্রুমণ্ডিত আপাদমস্তক সবুজ জুব্বায় ঢাকা এক দরবেশরূপী ফকীর হাজারাশীপ সেনা ব্যারাকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। দরবেশরূপী লোকটির মাথায় সবুজ কাপড়ের পাগড়ী। পাগড়ীতে হাজার দানার দীর্ঘ তসবীহ জড়ানো। তার গলায়ও ঝুলছিলো রং-বেরঙের হাজার দানার দীর্ঘ তসবীহ। তার এক হাতে একটি লাঠি আর অপর হাতে একটি কিতাব। দরবেশরূপী ফকির উচ্চ আওয়াজে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জপতে জপতে দৃঢ়পায়ে হাঁটছিলো আর থেকে থেকে তার হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করছিলো।

হাজারাশীপে অবস্থানকারী সৈন্যরা এ ধরনের কোন ফকির-দরবেশ কখনো দেখেনি। বিস্ময়কর এই লোকটির পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-অনুষ্ঠান দেখে ব্যারাকের বাইরে থাকা কিছু সংখ্যক সৈনিক তাকে অবাক বিস্ময়ে দেখছিল। দেখতে দেখতে একটা ভিড় লেগে গেল এবং দরবেশকে ঘিরে বহু উৎসুক সৈনিক জমা হয়ে গেল। দরবেশ সৈন্যদের ভিড়ে দাঁড়াল এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললো, "সাগরতীর ডুবে যাবে, পাহাড় ফেটে যাবে... আসমান থেকে আগুন ঝরবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'

এ কথা বলে দরবেশ তাকে ঘিরে দাঁড়ানো সৈনিকদের কারো প্রতি না তাকিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করলো। বিকট আওয়াজে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে দরবেশ যখন প্রচণ্ড শক্তিতে তার লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করলো, অভূতপূর্ব এই ঘটনায় অভিভূত হয়ে সৈন্যরা তার পথ ছেড়ে দিল।

দরবেশের এসব কর্মকাণ্ডে সম্মোহিত হয়ে কিছু সৈনিক তার পিছু পিছু চলতে লাগল। এক সৈনিক দরবেশের হাতে একটি রৌপ্যমুদ্রা গুঁজে দিলে অন্যেরাও দরবেশকে টাকা-পয়সা দেয়ার জন্য পকেট হাতড়াচ্ছিল। কিন্তু গুঁজে দেয়া রৌপ্যমুদ্রাটিকে দরবেশ মুখে পুড়ে দাঁতে কামড়ে থেতলে আকাশে ছুঁড়ে মারলো।

মুদ্রার প্রতি দরবেশের এই অনাসক্তি দেখে সবাই যার যার টাকা আবার পকেটেই রেখে দিল। কিন্তু উপস্থিত সবাই দরবেশের এই কাণ্ডে সম্মোহিত হয়ে গেল। কারণ, তারা ভেবেছিল লোকটি হয়তো কোন অভাবী ফকির।

এমন সময় দু'জন লোক খুব দ্রুত পায়ে দরবেশের পথে এসে থামল। তারা সৈন্যদের নিবৃত্ত করতে বললো, সাবধান, দয়া করে আপনারা কেউ পীর

বাবাকে কষ্ট দেবেন না। তাকে কেউ কোন টাকা-পয়সা দিতে চেষ্টা করবেন না। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরিয়ে পড়লে তা কখনো বিফলে যাবে না। তাকে কেউ বিরক্ত করবেন না। তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। তিনি হয়তো গায়েবী নিদর্শন দিতে এসেছেন।

পনেরো-ষোল বছর আগে তাকে একবার দেখা গিয়েছিল। আপনাদের হয়তো মনে আছে, পনেরো বছর আগে সমরকন্দে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। সেই ভূমিকম্পের দু'দিন আগে সমরকন্দের অলি-গলিতে তাকে ঘুরতে দেখা গেছে।

তখনও তিনি এভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র জিকির করতে করতে বলছিলেন–'সমরকন্দের জমিন গোনাহ্গারদের বোঝা আর সহ্য করতে পারছে না।' সব ভেঙে যাবে, ধুলোয় মিশে যাবে।' কিন্তু তখন তার কথা কেউ বুঝতে পারেনি। দু'দিন পর বাবাজী শহর থেকে উধাও হয়ে গেলেন। তার উধাও হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গোটা সমরকন্দ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিলো। শহরের সকল সরাইখানা ও পানশালা মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল।"

দুজনের আরেকজন বললো, 'পনেরো বছর পর হঠাৎ আজ এখানে তাকে দেখা যাচ্ছে। এখনো তিনি সেই দিনের মতোই জিকির ও ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। আল্লাহ মালুম, তিনি যা বলছেন তা হবেই হবে। জানা নেই, কোন পাহাড় ভেঙে পড়ে কিংবা কোন জায়গায় আকাশ থেকে আগুন ঝরে। কিন্তু এটা ঠিক বিপর্যয় একটা ধেয়ে আসছে, বিপদ একটা না একটা ঘটবেই। এই দরবেশ বাবার কথা মিথ্যা হবার নয়।"

একথা শোনামাত্র উপস্থিত সৈন্যদের চেহারা ভয়ে-আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেল। তাদের একজন সাহস করে বললো, "এই দরবেশের কাছ থেকে কি জানার কোন উপায় নেই, বিপদ কোন দিক থেকে আসবে এবং কেন আসবে? এই বিপদ ঠেকানোর কোন পথ আছে কি না?"

আতঙ্কগ্রস্ত সৈন্যরা ভয়াবহ বিপদের কথা শুনে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে পরস্পর অবস্থার ভয়াবহতা আরো ছড়িয়ে দিল এবং কোন বাক্য ব্যয় না করেই নিজ নিজ ব্যারাকে ফিরে এলো। কিছুক্ষণের মধ্যে বাতাসের সাথে এই খবর গোটা সেনা শিবিরে ছড়িয়ে পড়ল। এক দরবেশ পনেরো বছর আগের

সমরকন্দের মতো ভয়াবহ বিপর্যয় ও ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখে মুখে এই দুর্যোগের খবর আরো ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ হয়ে গোটা শিবিরে ছড়িয়ে পড়লো। শিবির জুড়ে এই ফকিরের ভবিষদ্বাণীই হয়ে উঠলো আলোচনার একমাত্র বিষয়। প্রত্যেকের মুখেই একই কথা, এই ফকীরের কাছ থেকে এই বিপদ থেকে মুক্তির বিষয়টি কিভাবে জানা যায়? কেন, কোনদিক থেকে আসবে এই বিপদ?

পরদিন সেনা শিবিরে এ খবর ছড়িয়ে পড়লো, গতকালের ভবিষ্যদ্বাণী করা দরবেশকে আজকে সমুদ্রতীরের একটি জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করতে দেখা গেছে। খবর শোনামাত্র কয়েকজন উৎসাহী সৈনিক সমুদ্র তীরের দিকে রওনা হলো। সৈন্যরা সাগর তীরে গিয়ে দেখতে পেলো, সেখানে একটি ছোট্ট তাঁবু খাটানো রয়েছে। তাঁবুর পাশেই তিন-চারজন লোক বসে আছে। সৈন্যরা সেখানে গিয়ে শুনতে পেল, তাঁবুর ভেতর থেকে ভেসে আসছে দরবেশের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জিকিরের আওয়াজ।

সেই সাথে তারা শুনতে পেলো, রক্তের বন্যা... থামিয়ে দাও, থামিয়ে দাও।

তাঁবুর বাইরে বসে থাকা লোকেরা সৈন্যদের জানালো, তারা সারা রাত এখানেই কাটিয়েছে। দরবেশ রাতভর বিরতিহীনভাবে এই জিকির চালিয়েছেন এবং মাঝে মধ্যেই তার লাঠি সাগরের পানিতে ডুবিয়ে এখানকার পানির গভীরতা পরিমাপ করেছেন।

তারা আরো জানালো, দরবেশের পা ধরে তারা মিনতি করে জানতে চাচ্ছিলো আসলে বিপদ কি ধরনের হতে পারে। তাদের অনুরোধে দরবেশ তাদের আসমানের প্রতি তাকাতে বললেন। তারা দিব্যচোখে দেখেছে, আসমানের তিনটি তারা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গোটা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারার টুকরোগুলো দূর-দূরান্তে গিয়ে মাটিতে আঁছড়ে পড়েছে। এরপর দরবেশ আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখনো সময় আছে, ফিরে এসো, আসমানের এই গজবকে থামিয়ে দাও।'

তারা সৈন্যদের আরো জানালো, আমরা দরবেশ বাবার সেবা করার জন্য এখানে এসেছি। কিন্তু তিনি আমাদের দিকে তাকিয়েও দেখছেন না। সৈন্যরা তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে দরবেশের তীব্র চিৎকারের জিকির শুনছিলো এবং তাঁবুর

বাইরে অপেক্ষমাণ লোকদের মুখে দরবেশ সম্পর্কে নানা তথ্য অবহিত হচ্ছিল। বাইরে অপেক্ষমাণ লোকদের বক্তব্যও দরবেশের তীব্র জিকির শুনে সৈন্যরা দরবেশকে আল্লাহর জীবন্ত পয়গামবাহী দূত ভাবতে শুরু করল।

এই সৈন্যরা ব্যারাকে ফিরে গিয়ে গতকালের অনেকের দেখা দরবেশকে আরো রহস্য পুরুষে পরিণত করল।

পরদিন ব্যারাকের আরো সৈন্য আর শহরের বহু লোক দরবেশকে দেখার জন্য সমুদ্র তীরবর্তী তাঁবুর পাশে জমায়েত হলো। দেখতে দেখতে তাঁবুর জায়গাটি সৈনিক এবং শহরের লোকদের জন্য তীর্থস্থানে পরিণত হলো।

লোকজন সমুদ্রতীরে গিয়ে তাঁবুর বাইরে দাঁড়াতো। তাঁবুর ভেতরে দরবেশের উচ্চ আওয়াজে জিকির শুনতে পেতো, সেই সাথে দরবেশ তিলাওয়াত করতো কেয়ামত দিবস সম্পর্কীয় আয়াতসমূহ। থেকে থেকে দরবেশ বলছিল, "রক্তের প্লাবন ধেয়ে আসছে, মানুষ মানুষকে হত্যা করবে।... দেশের বাদশা নারীর গোলামে পরিণত হবে'।"

* * *

সুলতান মাহমূদের দুই গোয়েন্দা কর্মকর্তা বিয়ে অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসে সুলতানকে জানালো, তারা বিয়ে অনুষ্ঠানে বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন, সেনাপতি আবু ইসহাক ও সেনাপতি খমরতাশ এর কথাবার্তা শুনেছে। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা সুলতানকে জানালো, আবুল আব্বাসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এ তিন ক্ষমতাধর ব্যক্তি চক্রান্ত করছে। অচিরেই তারা একটা কিছু ঘটাবে।"

সুলতান তাদের কথা শুনে পরামর্শ দিলেন, তোমরা আবুল আব্বাসের রাজমহল জুরজানিয়া এবং বুখারায় তোমাদের কয়েকজন গোয়েন্দাকে নিয়োগ করো, যাতে তারা ওদের চক্রান্তের খবর সময়মতো আমাদের অবহিত করতে পারে।"

সুলতানের নির্দেশে চার-পাঁচজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দাকে জুরজানিয়া ও বুখারায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। তারা জুরজানিয়া গিয়ে সুলতানের বোন নাহিদার সাথেও যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হলো। কিন্তু তারা বারংবার খবর

দিচ্ছিলো, আবুল আব্বাসের পক্ষ থেকে সুলতানের বিরুদ্ধে কোন ধরনের বিরূপ তৎপরতার আশঙ্কা নেই। আসলে রাজধানীতে চক্রান্তকারীদের কোন তৎপরতা ছিলো না। চক্রান্ত চলছিলো হাজারাশীপ ও বুখারায়।

হাজারাশীপের সমুদ্রতীরের ঝুপড়ীসম তাঁবুতে বসে দরবেশরূপী ফকির হাজারাশীপ সেনাশিবিরের সৈন্যদের মধ্যে অভাবনীয় প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।

ওদিকে হাজারাশীপ থেকে শত মাইল দূরবর্তী বুখারা রাজ্যের সমুদ্রতীরে অনুরূপ আরেক দরবেশের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এই দরবেশও সমুদ্রতীরে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করছিলো। বুখারার এই দরবেশ তার তাঁবুতে একা ছিলো না, তার সাথে ছিলো আরো বহু শিষ্য মুরীদ। মুরীদের মধ্যে কয়েকজন পুরুষ আর কয়েকজন নারী।

মাত্র কয়েক দিনেই দরবেশের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো যে, এই বুযুর্গ ব্যক্তি এমন একটি ওষুধ এবং তাবিজ দেয়, যা ব্যবহার করলে মানুষ কখনো বার্ধক্যের শিকার হয় না– দীর্ঘজীবন লাভ করে।

মানুষ মাত্রই দীর্ঘজীবন ও দীর্ঘ যৌবন প্রত্যাশা করে। সেনাদের প্রতিটি মুহূর্ত উৎকর্ণ থাকতে হয় কখন যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। যুদ্ধ মানেই মৃত্যু, মৃত্যুর হাতছানি।

দীর্ঘজীবন ও যৌবন লাভের দাওয়াই এবং তাবিজের কথা সেনাশিবিরে পৌঁছামাত্র এ খবর এ কান ও কান হতে হতে শিবিরময় ছড়িয়ে পড়লো। মৃত্যু আতঙ্কে ভীত সৈন্যরা এ খবরে খুবই প্রভাবিত হলো। দলে দলে সৈন্যরা সমুদ্রতীরে দরবেশের তাঁবুতে ভিড় করলো।

উভয় সৈন্যশিবিরে সৈন্যরা সমুদ্রতীরের অবস্থান নেয়া দুই দরবেশের তাঁবুতে জমায়েত হতে লাগলো। উভয় দরবেশ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললো, "তোমরা আল্লাহর পথের সৈনিক। তোমরা সুন্দর সঠিক পথে আছো। কিন্তু তোমাদের চারপাশে যেসব মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে, ওদের কেউ সঠিক পথে নেই। ওরা নামে মাত্র মুসলমান। তাদের কেউ কেউ তোমাদেরকে গোলামে পরিণত করতে তৎপর। প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রকে তোমরা মুসলমান মনে করে যদি তাদের উপর ভরসা করো, তাহলে তোমাদের উপর এমন গজব পড়বে যে, তোমাদের কোন নামগন্ধ থাকবে না।

উভয় সেনাশিবিরে দরবেশরূপী দুই ফকির তাদের সম্মোহনী ক্ষমতাবলে সৈন্যদেরকে এতোটাই প্রভাবিত করলো যে, সৈন্যরা তাদের কথা অমোঘ সত্য বলে হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করলো।

এক রাতে আলাফতোগীন তার খাস কামরায় উপবিষ্ট। তার সামনে অপরিচিত দু'জন লোক। তাদের কারো চেহারা ছবি স্থানীয় লোকদের মতো নয়। তারা মুসলমানও নয়। উভয়েই বিদেশী ইংরেজ।

"আপনাদের এই কৌশল শেষ পর্যন্ত কি ফল বয়ে আনবে?" উপস্থিত ফিরিঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন।

"আপনি কেন আমাদের সাহায্য করেছেন?" ফিরিঙ্গীদের একজন আলাফতোগীনকে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো। সৈন্যদেরকে আপনার আস্থাভাজন বানিয়ে আপনি খাওয়ারিজম রাজ্যের অধিপতি হতে চান?" এই উদ্দেশ্যেই তো আপনি আমাদের সহযোগিতা করেছেন, তাই না?"

আমরা এখানে এসে সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি, তারা খাওয়ারিজম শাহের বিরুদ্ধে কিংবা জুরজানিয়ার সৈন্যদের বিরুদ্ধে তরবারী ধরতে মোটেও সম্মত নয়। কোন ধরনের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘোর বিরোধী তারা।

আমরা হাজারাশীপ ও বুখারার সৈন্যদের ভেতরের খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছি, তারা অভ্যন্তরীণ সংঘাত তো দূরের কথা প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও যুদ্ধবিগ্রহে আগ্রহী নয়। এখানকার সকল সৈন্যদেরকে মৌলিকভাবেই এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, মুসলমান কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে তরবারী ধরতে পারে না। এজন্য আমাদেরকে সর্বাগ্রে হাজারাশীপ ও বুখারাতে যেসব সৈন্য রয়েছে, তাদের মন থেকে ইসলামের আদর্শিক বিশ্বাস দূর করতে হবে।

"কল্পনা ও সংশয়বাদিতা এমন এক অস্ত্র, যা দিয়ে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি ধসিয়ে দেয়া যায়। সব মানুষই ভবিষ্যতে ঘটিতব্য এবং ঘটমান ঘটনাবলীর কারণ জানতে চায়। এটা মানুষের একটি স্বভাবজাত দুর্বলতা।

মানুষের আরেকটি দুর্বলতা হলো আবেগ ও বিষ্ময়। সকল মানুষ বিস্ময়কর কথাবার্তা ও ঘটনাকে শুনতে ও দেখতে পছন্দ করে এবং আবেগকে বিবেকের উপর বিজয়ী করে ফেলে। মানুষের এই আবেগ ও বিস্ময়ানুভূতিকে সহজেই প্রভাবিত করা যায়। যে মানুষ যতো বেশী মূর্খ ও অশিক্ষিত, সে ততো বেশী

আবেগপ্রবণ ও আবেগাশ্রয়ী। মানুষের তৃতীয় দুর্বলতা হলো প্রত্যেকেই চির যৌবন ও অমরত্ব লাভ করতে চায়।

আমরা আপনাদের সেনাবাহিনীর কমান্ডার ও সৈনিকদের এই মানবিক দুর্বলতাগুলোকে দুই কৃত্রিম দরবেশের দ্বারা কাজে লাগাচ্ছি। আমাদের দুই দরবেশরূপী মনোবিজ্ঞানী সিপাহী ও কমান্ডারদের ধর্মানুভূতি ও ধর্মবিশ্বাসের জায়গায় সংশয় ও কল্পনাবিলাস ঢুকিয়ে দেবে। উভয় দরবেশ কথায় কথায় ধর্মের বিধান উল্লেখ করে কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়। কিন্তু তার প্রতিটি কথার মর্ম সম্পূর্ণ ইসলামের পরিপন্থী। আমাদের এই দুই বিশেষজ্ঞ আপনাদের সৈন্যদের ধর্মানুরাগ অক্ষুণ্ন রেখেই প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক ও সৈন্যদের প্রতি অবিশ্বাস ও সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম।

ধর্মবিশ্বাসে আমরা খৃস্টান। কিন্তু আপনাদের ধর্মের প্রতিটি বিধিবিধান সম্পর্কে আমরা অবগত। আমরা আপনাদের সৈন্যদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করেছি। আমাদের প্রশিক্ষিত মুসলিম অনুচরেরা আপনাদের সেনাশিবিরগুলোর অলিগলি ঘুরে ঘুরে নানা গুজব ছড়িয়ে দিচ্ছে। তারা এ কথা খুবই সাফল্যের সাথে প্রচার করছে, খাওয়ারিজমকে সুলতান মাহমূদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার নেতৃত্বের উপযুক্ত একমাত্র ব্যক্তিত্ব বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন।

খাওয়ারিজম শাহ্ আবুল আব্বাস এবং তার নতুন স্ত্রী নাহিদা সম্পর্কে এমনই দুর্নাম ছড়ানো হয়েছে যে, সৈন্যরা আবুল আব্বাসকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। আমরা আশা করছি, অল্পদিনের মধ্যেই সৈন্যরা আবুল আব্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য উন্মত্ততা শুরু করবে।

"আপনার দু'জন সহকারী সেনাপতি– যারা আবুল আব্বাসের কট্টর ভক্ত ছিলো– দু'জন প্রশিক্ষিত তরুণীকে তাদের পিছনে লাগিয়ে দিয়ে আমরা তাদেরকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। আপনার হয়তো জানাই ছিলো না, এই দুই প্রভাবশালী সেনাকর্মকর্তা আপনাকে মোটেও পছন্দ করতো না। এখন তারাও আপনাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে। এ ছাড়াও যদি আপনার কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে আমাদের বলতে পারেন। আমরা আপনাকে আর্থিক, সামরিক ও পরিবহনের জন্য উপযুক্ত জন্তু দিয়ে সহযোগিতা করতে পারি।

“সেটি এখনই নয়।” বললেন আলাফতোগীন। এখনই যদি আপনাদের এসব সহযোগিতা নিই, তাহলে খাওয়ারিজম শাহ্ জেনে যেতে পারে। আমি একটা সুযোগের অপেক্ষা করছি, যাতে আমি আবুল আব্বাসের বিরুদ্ধে সৈন্যদের বিক্ষুব্ধ করে আমার পক্ষে নিয়ে আসতে পারি। আমি যদি খাওয়ারিজম শাহের গদি উল্টে দিতে পারি, তাহলে আপনাদের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে।

“আমরা আপনার কাছে কোন প্রতিদান চাই না।” বললো অপর ফিরিঙ্গী। আমরা শুধু আপনার বন্ধুত্ব চাই। আপনার সাথে আমাদের শাসনতান্ত্রিক বন্ধুত্ব ও মৈত্রীস্থাপন হলেই বুঝতে পারবেন, গির্জা ও মসজিদের সম্পর্ক কতোটা হৃদ্যতাপূর্ণ। আমাদের এই স্বর্গীয় বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর পথে সুলতান মাহমূদই একমাত্র বাধা। এই ঝগড়াটে লোকটির বিনাশ খুবই জরুরী।”

“আমিও তার ধ্বংস চাই।” বললেন আলাফতোগীন। এই যুদ্ধবাজ লোকটি তার সাম্রাজ্যকে আরো বিস্তৃত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

“আপনি হয়তো জানেন, আপনার সৈন্যরা কোন মুসলিম রাষ্ট্রের সৈন্যদের সাথেই যুদ্ধ করতে সম্মত নয়। বিশেষ করে গযনীর সৈন্যদের সাথে যুদ্ধের কথা তারা ভাবতেই পারে না।” বললো এক ফিরিঙ্গী।

“সৈন্যদের এই মনোভাব আবুল আব্বাসের তৃতীয় স্ত্রী নাহিদার প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের চোখ আবুল আব্বাসের শয়নকক্ষের ভেতরের খবরও রাখে। আবুল আব্বাস তার আগের দুই স্ত্রীকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে সুলতান মাহমূদের বোনের প্রেমে পড়ে নিজের বিবেক-বুদ্ধি খুইয়ে ফেলেছে। এমনও হতে পারে, আবুল আব্বাস গযনীকে সামরিক সহযোগিতা দিয়ে বসবে; কিন্তু সে কিছুতেই গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না।”

“অনিন্দ্য সুন্দরী দুই তরুণী বুখারার শাসক আলাফতোগীনসহ দুই ফিরিঙ্গীকে সুরা ঢেলে দিচ্ছিল। এই দুই তরুণী ছিলো ফিরিঙ্গীদের সঙ্গী। আলাফতোগীন শরাবের নেশার চেয়ে তরুণীদের রূপ সৌন্দর্যে বেশী আসক্ত হয়ে পড়েছিলো। সে বারবার তরুণীদের দিকে তাকাচ্ছিলো। তরুণীদের ভুবনমোহিনী মুচকি হাসি আর মনকাড়া চাহনীতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো। এদিকে দুই ফিরিঙ্গী অতিকৌশলে নেশাগ্রস্ত আলাফতোগীনের মন-মগজে

খাওয়ারিজমের একচ্ছত্র অধিপতি তথা বাদশাহ হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করে তুলেছিল।

গযনী থেকে নাহিদার একান্ত ফুটফরমায়েশের জন্য জেবীন নামের মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তিকে পাঠানো হলো। নাহিদা আবুল আব্বাসকে জানালো, জেবীন ছিলো আমার একান্ত কর্মচারী। ভাইয়া তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। জেবীন খুবই বিশ্বস্ত এবং সমঝদার।

সত্যিকার অর্থেই জেবীন ছিলো অনুগত, ভদ্র, মেধাবী এবং পরিচ্ছন্ন মনের মানুষ।

কয়েক দিনের মধ্যেই জেবীন আবুল আব্বাসের মন জয় করতে সক্ষম হয়। জেবীন আবুল আব্বাসের রাজপ্রাসাদের অন্যান্য কর্মচারী ও সেবক-সেবিকার উপর নজরদারী এবং তাদেরকে বশে রাখার ব্যাপারে খুবই দক্ষতার পরিচয় দেয়। অবশ্য একাজে আগে থেকেই জেবীন ছিলো পরীক্ষিত এবং অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ।

একদিন বিকেল বেলায় প্রাসাদের বাগানে বসেছিলো নাহিদা। জেবীন নাহিদার সামনে মাথা নীচু করে দু'হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলো। অবস্থাদৃষ্টে যে কেউ মনে করবে, সে নাহিদার কথা শুনছে। বস্তুত জেবীন বলছিলো আর নাহিদা গভীর মনোযোগ দিয়ে জেবীনের কথা শুনছিলো।

"একটা কিছু ঠিকই ঘটে চলছে নাহিদা! আমাদের লোকেরা বুখারা ও হাজারাশীপ থেকে যেসব খবর আনছে, তা থেকে বোঝা যায় ওখানে কোন শয়তানী কারসাজী শুরু হয়েছে। হাজারাশীপের নদীর তীরে এক ফকির আস্তানা গেড়েছে, সে নাকি বিস্ময়কর সব ভবিষ্যদ্বাণী করছে। সে এমন ধরনের চক্রান্তমূলক কথাবার্তা বলছে যে, সেনাবাহিনীর সব লোক তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। সে এক হাতে কুরআন শরীফ আর একহাতে তসবীহ নিয়ে সারাক্ষণ ওয়াজ করে।"

"একথা কি নিশ্চিতভাবে বলা যাবে, সে সত্যিই কোন দুনিয়াবিমুখ ওলী ব্যক্তি নয়?" জিজ্ঞেস করলো নাহিদা।

সে আলেম বটে; কিন্তু দুনিয়াবিমুখ নয়, বরং দুনিয়ামুখী। সে কোন দীনদার আলেম নয়, কুরআনের আড়ালে সে আসলে খ্রিস্টবাদ ছড়াচ্ছে এবং গণমানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

গযনী সালাতানাতের বিরুদ্ধে বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে সে। কুরআন শরীফের আয়াত পড়ে পড়ে সে বলছে, গযনী ও আশেপাশের সকল মুসলিম রাজ্যগুলো এবং এগুলোর শাসকগোষ্ঠী নামকাওয়াস্তে মুসলমান। ইসলামের নামের আড়ালে ওরা সবাই ক্ষমতালোভী। একমাত্র সত্যিকার মুসলিম ও মুসলমানের দেশ খাওয়ারিজম।"

"সে কি খাওয়ারিজম শাহীর বিরুদ্ধেও কোন কথাবার্তা বলে?"

"না, প্রকাশ্যে সে খাওয়ারিজম শাহীর বিরুদ্ধে বলে না।" বললো জেবীন। কিন্তু সৈনিক ও কমান্ডারদের আচার-আচরণ ও কথাবার্তা এবং তাদের মনোভাব খাওয়ারিজম শাহীর জন্য খুবই ভয়ানক।...

বুখারার পার্শ্ববর্তী নদীতীরেও এমন এক দরবেশ আস্তানা গেড়েছে। সেখানে শুধু দরবেশই নয়, তার সাথে রয়েছে কিছুসংখ্যক পুরষ ও সুন্দরী নারী। বুখারা জুড়ে এ খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে যে, দরবেশ এমন এক তাবিজ ও ওষুধ দেয়, যা সেবন ও ধারণ করলে মানুষ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে এবং জীবনে কখনো বার্ধক্য স্পর্শ করে না। ওই দরবেশের সাথে যেসব সুন্দরী তরুণী রয়েছে, রাতের বেলায় তাদেরকে সেনাকমান্ডারদের সাথে আপত্তিকর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় নদীতীর ও জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

বুখারার সেনাদের কথাবার্তায়ও মারাত্মক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। ওই ফকিরকে ঘিরে ওখানে মানুষের সমাগম এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ওখানে রীতিমতো মেলা জমে গেছে। ওই ফকিরও কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াজ করে আর গযনী সালতানাতের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে।

মোদ্দাকথা হলো, গযনী ও খাওয়ারিজমের মধ্যে একটা শক্তিশালী শত্রুতা তৈরীর অপচেষ্টা চলছে। আমাদের লোকেরা উভয় সেনা শিবিরের সৈন্যদের সাথে উঠাবসা করে এবং ফকিরের মুরীদ সেজে তাদের কথাবার্তা শুনেছে এবং সৈন্যদের মনোভাব চিন্তা-ভাবনার খবর নিয়েছে।

যে বুখারা ও হাজারশীপের সাধারণ সৈন্যরা কোন কাজকর্ম না থাকায় অলস বসে বসে সারাক্ষণ অশ্লীল কথাবার্তা ও নোংরা আলাপচারিচায় সময় কাটাতো, তাদের প্রত্যেকের মুখে এখন গযনীর প্রতিটি প্রাসাদ থেকে ইট খুলে নেয়ার বিষোদগার। গযনীর ধ্বংসই এখন আলোচনার একমাত্র বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া একথাও শোনা গেছে, ওখানে বহু নারীর সমাগম হয়েছে।

যারা অনেকটা জ্ঞাতসারেই দেহ ব্যবসার পসরা সাজিয়ে সৈনিক ও যুবকদের চরিত্র হনন করছে।

আমাদের একজন গোয়েন্দা এমন এক তরুণীর সাথে মিলিত হয়েছিলো। সে জানিয়েছে, এসব তরুণী শুধু দেহ ব্যবসাই করে না, এরা গযনী সালতানাত ও খাওয়ারিজম শাহ আবুল আব্বাসের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াচ্ছে। পর্দার অন্তরালে এসব দেহপসারিণীদের সম্পর্ক রয়েছে ওই দুই দরবেশের সাথে। তাদের কথাবার্তায় এ বিষয়টি একেবারে দিবালোকের মতো পরিষ্কার।...

আমাদের এক গোয়েন্দা বলেছে, বুখারার ফকিরের সাথে থাকা এক তরুণী একদিন নদীর তীরে তাকে একাকী পেয়ে ঘনবনের দিকে নিয়ে যায় এবং তাকে প্রেম নিবেদন করে। তখন ছিলো সন্ধ্যা। বেলা ডুবে গেলে তরুণী তার গলা জড়িয়ে ধরে প্রেম নিবেদন করে তার পরিচয় জানতে চায়। আমাদের গোয়েন্দা নিজেকে খাওয়ারিজম সেনাবাহিনীর কমান্ডার বলে পরিচয় দেয়। সেনাকমান্ডারের পরিচয় পাওয়ার পর তরুণী এমনভাবে নিজেকে তার সামনে মেলে ধরলো যে, সে যেনো যুগ যুগ ধরে তাকেই ভালোবাসে।

আমাদের গোয়েন্দা জানিয়েছে, এসব তরুণী খুবই সুন্দরী ও প্রশিক্ষিত। আমাদের গোয়েন্দা বলেছে, 'আমার যদি কর্তব্যবোধ না থাকতো, আর আল্লাহর কাছে জবাবদিহির প্রশ্ন ও পাপাচারের শাস্তির ভয় না হতো, তাহলে এই তরুণীকে আমি জীবনসঙ্গিনী করার জন্য সম্ভব সবকিছুই করতাম।' আমাদের গোয়েন্দা আরো বলেছে–

তরুণী তার মধ্যে কামোদ্দীপনা জাগিয়ে দিয়ে গলা জড়িয়ে বললো, "তোমাদের খাওয়ারিজম শাহ তো তার তৃতীয় স্ত্রীর গোলামে পরিণত হয়েছে। গযনী সুলতানের বোন নাহিদা খাওয়ারিজম শাহের জ্ঞানবুদ্ধি সবই গিলে ফেলেছে। সে এখন আঙুলের ইশারায় খাওয়ারিজম শাহকে নাচাচ্ছে।"

"আমাদের গোয়েন্দা তরুণীকে জিজ্ঞেস করলো, "রাজমহলের কথা তুমি কিভাবে জানলে?"

তরুণী জানালো, "আমি রাজমহলেরই রক্ষিতা ছিলাম। কিন্তু গযনী সুলতানের বোন নাহিদাকে আবুল আব্বাস বিয়ে করার পর একের পর এক সুন্দরী তরুণীদের আগমন শুরু হয়। প্রতিদিন দলে দলে গযনী থেকে সুন্দরী তরুণীরা খাওয়ারিজমে আসতে শুরু করে। নাহিদা একেক রাতে আবুল

আব্বাসের কাছে একেক সুন্দরীকে হাজির করে। নাহিদার চক্রান্তের কারণে আবুল আব্বাস হারেমের সকল সেবিকা ও রক্ষিতাকেই তাড়িয়ে দিয়েছে।" একথা বলে তরুণী কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং বলে... তুমিই বলো, এখন আমরা কোথায় যাবো?

"আমাদের বেঁচে থাকার এখন একটাই পথ।" আচ্ছা, তুমি কি আমাকে আশ্রয় দিতে পারো? আমাকে কি এই পঙ্কিল পথ থেকে বাঁচাতে পারবে? একথা শুনে আমাদের গোয়েন্দা তাকে সান্ত্বনা দিলো এবং পরবর্তীতে তার সাথে আবারো মিলিত হওয়ার কথা বলে সেখান থেকে সরে এলো।

এই ঘটনা থেকেই আপনি আন্দাজ করতে পারেন, সেখানে কী চলছে।" বললো জেবীন।

"আমাদের গোয়েন্দারা আরো খবর দিয়েছে, বুখারার গভর্নর আলাফতোগীনের প্রাসাদে দু'জন ভিনদেশী লোক বসবাস করছে, এদের চামড়া দেখে মনে হয় তারা ফিরিঙ্গী ইংরেজ। এরা ধর্মীয়ভাবে ইহুদীও হতে পরে কিংবা খৃষ্টানও হতে পারে। এখন আপনিই আমাদের বলুন, আমাদের কি করতে হবে? আপনি কি খাওয়ারিজম শাহকে এ ব্যাপারে জানাবেন, এখানে এসব ঘটছে?"

"না, তাকে এসব ব্যাপারে জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, এসব খবর আমি তাকে জানালে আমাকে জবাব দিতে হবে এসব খবর আমি কি করে কার মাধ্যমে পেলাম।"

"আবুল আব্বাস আমার হাতে আছে। আমি তাকে বলতে পারতাম, আপনি হাজারাশীপ ও বুখারার সকল সৈন্যকে রাজধানীতে বদলী করুন এবং রাজধানীর সৈন্যদেরকে সেখানে বদলী করুন। এরফলে এক জায়গায় থেকে থেকে সৈন্যরা অলস ও নিষ্কর্ম হয়ে যাবে না। কিন্তু এ মুহূর্তে তাকে এমন কোন পরামর্শ দেয়া ঠিক হবে না। ওখানকার সৈন্যরা দুই ফকিরের সংশ্রবে যেভাবে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে, এখানকার সৈন্যরা সেখানে গেলে এরাও খারাপ হয়ে যাবে।

তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ হলো, তোমরা কৌশলে ওই দুই ফকিরকে গায়েব কিংবা হত্যা করে ফেলো। গযনীতে এমন কিছু ঘটলে এদের গ্রেফতার করে শাস্তির মুখোমুখি করা যেতো। কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়। আচ্ছা,

আমাদের লোকেরা কি এদের হত্যা করার মতো ক্ষমতা রাখে? জেবিনকে জিজ্ঞেস করলো নাহিদা।

"ফকির দু'জনকে হত্যা করা আমাদের গোয়েন্দাদেরকে জন্য তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। আমাদের দরকার এ ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতা।" বললো জেবীন।

"ঠিক আছে, আমি এই নির্দেশ দিলাম। তোমাদের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারটিও আমি নিশ্চিত করবো। তবে এই কাজের সাথে সাথে গযনী সুলতানের কাছে খবর পাঠিয়ে দাও, আমার নির্দেশে দুই চক্রান্তকারী ফকিরকে হত্যা করা হচ্ছে এবং হাজারাশীপ ও বুখারাতে যা ঘটছে এর বিস্তারিত খবরও দিয়ে দাও।" জেবিনকে বললো নাহিদা।

* * *

কয়েকদিন পর নদীর তীরবর্তী দরবেশের আস্তানা থেকে লোকজন বাড়ী ফিরতে শুরু করে। রাত বাড়ার সাথে সাথে দরবেশের আস্তানা থেকে লোকজন সরে যেতে থাকে।

এক পর্যায়ে সাধারণ মানুষের ভিড় কমে যায়। অর্ধরাতে সাধারণ মানুষের ভিড় কমে যাওয়ায় দেহপসারিণী তরুণীরা খদ্দের সাথে নিয়ে দূরের নদী তীরের ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে চলে যায়।

দরবেশের আস্তানায় মানুষের ভিড় কমে গেলেও দু'জন লোক আস্তানার ধারে পাশেই ঘোরাফেরা করছিলো। দরবেশ বাইরের মশাল নিভিয়ে দিয়ে তাঁবুর ভেতরে চলে গেল। তাঁবুর বাইরে দু'জন প্রহরী প্রহরা দিচ্ছিলো। প্রহরী দু'জন প্রহরা দেয়ার লক্ষ্যে অনড় বসে ছিলো আর অজ্ঞাত দুজন লোক তাঁবুর অদূরে থেকে প্রহরীদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করছিল। তাদের একজন সঙ্গীর উদ্দেশ্যে বললো–

"মনে হয়, তাঁবুর বাইরে অপেক্ষমাণ এই লোক দু'টি দরবেশের প্রহরী। এরা তাঁবুর সম্মুখ থেকে সরবে না।"

"এরা তাঁবুর ভেতরে চলে গেলে আমাদের কাজ কঠিন হয়ে যাবে।" বললো অপরজন।

"একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে।" বললো প্রথমজন। তুমি ওদের কাছে গিয়ে নিজেকে সেনাবাহিনীর কমান্ডার পরিচয় দেবে আর এমনভাবে নিজেকে উপস্থাপন করবে যে, তুমি দরবেশের খুব ভক্ত। আর এদিকে আমি কাজ সমাধা করার চেষ্টা করবো।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি সঙ্গীর কথামতো প্রহরীদের কাছে গিয়ে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক গল্প জুড়ে দেয়। লোকটি যখন নিজেকে সেনাবাহিনীর কমান্ডার হিসেবে পরিচয় দেয়, তখন দরবেশের প্রহরীরা তার সাথে কথা বলতে বেশ উৎসাহবোধ করে। লোকটি প্রহরীর উদ্দেশ্যে বললো, বাবাজী হয়তো শুয়ে পড়েছেন, এখানে আমরা কথা বললে তার ঘুমের ব্যাঘাত হবে, আমাদের একটু দূরে গিয়ে কথাবার্তা বলা উচিত।

এই বলে সে দুই প্রহরীকে একটু দূরে সরিয়ে নিলো।

দরবেশ চতুর্দিকে পর্দা ঘিরে দিয়েছিলো। অপরদিকে তার সঙ্গী অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তাঁবুর পিছনে চলে গেলো এবং হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে ভেতরটা দেখে নিলো।

তাঁবুর ভেতরের মশালের আলোয় সে দরবেশকে পরিষ্কার দেখতে পেলো। দরবেশরূপী কুচক্রী দেদারছে শরাব গিলছে। গোয়েন্দা যে দিকটা উঁচু করে দরবেশকে দেখছিলো, এ দিকটায় ছিলো দরবেশের পিছন দিক। এই দুই আগন্তুক ছিলো গযনীর দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা।

গোয়েন্দা খুব ধীরে ধীরে তাঁবুর একটি রশি খুলে নিলো এবং হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে পড়ল। দরবেশ তখন প্রচুর মদ গিলে বেহুঁশ। গোয়েন্দা দু'পায়ের উপর ভর করে রশিতে ফাঁস তৈরী করে দরবেশের গলায় ছুঁড়ে দিলো এবং একটানে ফাঁস আটকে ফেলল। দরবেশের মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হওয়ার অবকাশ ছিলো না।

মুহূর্তের মধ্যেই দরবেশের দেহ নিথর হয়ে গেল। দরবেশরূপী মদ্যপের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গোয়েন্দা হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর পিছন দিক দিয়ে দূরে চলে গেলো। এদিকে তার সঙ্গী দরবেশের দুই প্রহরীর সাথে জমিয়ে গল্প করছিল। হঠাৎ তারা পেঁচার ডাক শুনতে পেলো।

পেঁচার আওয়াজ শুনে দরবেশের দুই প্রহরীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার দু'জন সঙ্গীর সাথে এসে মিলিত হলো এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল করে

অন্ধকারে তাদের গন্তব্যে পা বাড়াল। পেছনে পড়ে রইলো হাজারাশীপের সেনাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী চক্রান্তকারীর মরদেহ।

তাদের পরবর্তী গন্তব্য বুখারা। কিন্তু বুখারা হাজারাশীপ থেকে অনেক দূরে। তাদের পক্ষে রাতারাতি বুখারায় পৌঁছে বুখারার দরবেশরূপী কুচক্রীকে হত্যা করা সহজ ব্যাপার ছিলো না।

একে তো বুখারার দূরত্ব অপর দিকে হাজারাশীপের দরবেশের মতো বুখারার দরবেশ তার তাঁবুতে একাকী অবস্থান করতো না। তার সাথে থাকতো আরো কয়েকজন পুরুষ ও নারী। তবুও এই দুই গোয়েন্দা তাদের কর্তব্য পালনে রাতের অন্ধকারে বুখারার পথে ঘোড়া হাঁকাল।

তারা নদীর তীর ধরে দ্রুতগতিতে বুখারার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। যেতে যেতে এক পর্যায়ে নদীর ওপারে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলো। সেখানে নদী ছিলো বেশ চওড়া। চওড়া হওয়ায় বোঝা যাচ্ছিল নদীর গভীরতা সেখানে কম হবে।

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে দুই গোয়েন্দা তাদের ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দিলো। নদীর মাঝখানটা ছিলো যথেষ্ট গভীর। সেখানে ঘোড়াকে সাঁতরিয়ে পার হতে হলো। হাজারাশীপ থেকে বুখারার দূরত্ব ছিলো প্রায় শত মাইলের কাছাকাছি।

* * *

পরদিন ভোর হতে না হতেই হাজারাশীপের সর্বত্র খবর ছড়িয়ে পড়লো, রাতের অন্ধকারে কে বা কারা নদী তীরের তাঁবুতে দরবেশকে হত্যা করেছে। অজ্ঞাত ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন দরবেশ। এ খবর মুহূর্তের মধ্যে শহরময় ছড়িয়ে পড়ল এবং ছড়িয়ে পড়লো সেনাশিবিরে। খবর পেয়ে ছোট-বড় অফিসার, সকল সৈনিক ও সাধারণ মানুষ নদীতীরে অবস্থিত দরবেশের আস্তানায় ভিড় জমালো।

দরবেশের মৃত্যু সংবাদের সাথে সাথে এ খবরও ছড়িয়ে পড়লো যে, গযনীর গোয়েন্দারাই দরবেশকে হত্যা করেছে। কারণ, দরবেশ গযনীর সৈন্য ও গযনী শাসকের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতেন। গযনী সৈন্যদের হাতেই দরবেশ নিহত হয়েছেন, এ কথা সবাই বিশ্বাস করলো। এ খবর হাজারাশীপ সৈন্যশিবিরে বিদ্বেষের আগুন ধরিয়ে দিল।

এই হত্যাকাণ্ডকে ব্যবহার করে গযনী সালতানাতের বিরুদ্ধে হাজারাশীপের সৈন্যদের উত্তেজিত করতে আরো ভয়াবহ প্রচারণা চালানোর সুযোগ পেলে কুচক্রীরা।

সবার মুখে মুখেই একথা উচ্চারিত হতে থাকলো, দরবেশ যে বিপদের কথা বলছিলেন, এই বিপদ এখন মাথার উপরে এসে গেছে। সাধারণ মানুষ ও সৈন্যরা তো আগেই ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলো, এখন দরবেশের নিহতের ঘটনায় কমান্ডাররা পর্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সেই সাথে কমান্ডাররা গযনী সালতানাতের বিরুদ্ধে ক্ষোভে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলো।

* * *

পরদিন সূর্যাস্তের সাথে সাথে গযনীর অকুতোভয় দুই গোয়েন্দা তীব্রগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রায় শত মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে বুখারার উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল। পথিমধ্যে তারা মাঝে-মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য যাত্রাবিরতি দিয়ে তাদের বয়ে নেয়া ঘোড়াকে বিশ্রাম দিয়েছে এবং খাবার খাইয়েছে। বুখারার উপকণ্ঠে পৌঁছে গোয়েন্দা দু'জনের একজন শহরে প্রবেশ করে বুখারায় বহুরূপী ফকিরের বেশ ধারণ করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণরত গযনী গোয়েন্দাদের খুঁজতে শুরু করলো।

শহরে প্রবেশ করে গোয়েন্দা বুখারায় নিযুক্ত দুই গোয়েন্দার একজনকে পেয়ে গেলো। স্থানীয় গোয়েন্দাদেরকে তাদের পরিকল্পনা জানিয়ে, এখন তাদের কি করতে হবে তা বুঝিয়ে দিল।

"খাওয়ারিজমের দরবেশরূপী নিঃসঙ্গ প্রতারককে হত্যা করা সহজ ছিলো। কিন্তু এখানকার কুচক্রী একাকী নয়। আমরা তাকে দেখেছি, সে তাঁবুতে একাকী থাকে বটে; কিন্তু তার তাঁবুর পাশেই রয়েছে সঙ্গীদের তাঁবু।" জানালো স্থানীয় গোয়েন্দারা।

"অন্যরা জেগে গেলে আমরা পাকড়াও হবো কিংবা মারা পড়বো এটাকে সমস্যা মনো করো না।" বললো স্থানীয় দুই গোয়েন্দার একজন। আমাদেরকে পাঠানোর আগে যে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিলো, তা একবার স্মরণ করো। আমরা ইচ্ছা করলে সুলতানকে ধোঁকা দিতে পারবো বটে; কিন্তু মহান আল্লাহ্কে আমরা কিছুতেই ধোঁকা দিতে পারবো না। বললো অন্যজন।"

এই ভণ্ড প্রতারক কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে এবং মুসলমানদেরকে পরস্পর শত্রু বানিয়ে ফেলছে তা তোমরা সবই প্রত্যক্ষ করেছো। তোমরা জানো, এই চক্রান্তের মূলে রয়েছে ফিরিঙ্গী খৃস্টান ও ইহুদীচক্র। এরা যা করছে, তা ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করছে।

গভর্নর আলাফতোগীন খাওয়ারিজমের বাদশা হওয়ার জন্য কুরআনের অবমাননা করছে। ধর্মের প্রয়োজনে পবিত্র কুরআরে মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে গিয়ে আমাদের জীবন বিলিয়ে দেয়া উচিত। বললো আগন্তুকদের একজন।

ঠিক আছে, আর কথা নয়, এবার চলো। বললো স্থানীয় গোয়েন্দা।

তিনজন তিনটি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে চতুর্থ সঙ্গীকে সাথে নেয়ার জন্য শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে অন্যজনকেও পেয়ে গেলো। তাকে সাথে নিয়ে সবাই নদীর তীরবর্তী দরবেশের আস্তানার দিকে রওনা হলো।

এরা চারজন নদী তীরের একটি ঘন জঙ্গলে তাদের ঘোড়াকে বেধে রেখে দরবেশের আস্তানার দিকে যখন রওনা হলো, তখন সাধারণ মানুষ সেখান থেকে ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। এরা চারজন দর্শনার্থীদের ভিড়ের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগলো।

এবার দর্শনার্থীরা সেখান থেকে চলে গেল। রয়ে গেলো শুধু নারীদের নিয়ে স্ফূর্তি করার আগ্রহী সেনাকর্মকর্তাদের দু'-চারজন। রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেলো নারীদের দেহ ব্যবসা এবং সেনা কর্মকর্তাদের আমোদফুর্তি।

দরবেশরূপী কুচক্রীর তাঁবু থেকে দূরে গিয়ে নদী তীরের ঝোঁপ-ঝাড়ের আড়ালে যখন প্রশিক্ষিত তরুণীরা তাদের ইপ্সিত নাগরদের নিয়ে ফুর্তিতে মেতে উঠে, তখন ফকিরের আস্তানায় নীরবতা নেমে আসে।

আস্তানায় নীরবতা নেমে এলে গযনীর চার গোয়েন্দা ধীরপায়ে ফকিরের তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল। ফকিরের তাঁবু ছিলো চতুর্দিকে মোটা পর্দা দিয়ে ঘেরা। ভেতরে প্রদীপ জ্বলছিলো।

পা টিপে টিপে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে গযনীর চার গোয়েন্দা ফকিরের তাঁবুতে উঁকি দিতে গেলে একজন কিছু একটার সাথে হোঁচট খায়। তাতে হাত দিয়ে সে বুঝতে পারে এটি মটকা। মটকাতে হাত দিয়ে ঘ্রাণ শুকে সে বুঝে

নেয়, এটি জ্বালানী তেলে ভর্তি। এমতাবস্থায় দুজন ফকিরের তাঁবু ঘেঁষে বসে পড়ল।

এরা পর্দা ফাঁক করে ভেতরে দেখতে পেলো, অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় ফকিররূপী কুচক্রীর পাশে প্রায় উলঙ্গ এক সুন্দরী তরুণী বসে তাকে মদ ঢেলে দিচ্ছে। ফকির ও তরুণী উভয়েই দেদারছে মদ গলাধঃকরণ করছে। এক গোয়েন্দা তেলভর্তি মটকাটা উল্টে দিয়ে তাঁবুর পর্দা ভিজিয়ে দিলো আর অন্যরা ধারালো খঞ্জর হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল।

হঠাৎ এদের দু'জন পর্দা উঁচু করে ফকির ও তরুণী কিছু বুঝে উঠার আগেই তাদের মুখ চেপে ধরলো। ফকির ও তরুণী উভয়েই ছিলো মদের নেশায় বুঁদ। প্রতিরোধ তো দূরের কথা তাদের পক্ষে একটু শব্দ করারও অবকাশ হলো না।

মুহূর্তের মধ্যে দুই গোয়েন্দা ধারালো খঞ্জর ফকির ও তরুণীর বুকে বিদ্ধ করলো। একবার খঞ্জর বুকে বিদ্ধ করে টেনে বের করে পুনর্বার বিদ্ধ করতেই ফকির ও তার সঙ্গীনি তরুণীর ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। নীরবে এদের খতম করে দু'জন বাইরে বেরিয়ে এলো। অপর দুজন তাঁবুর বাইরে অপেক্ষা করছিল।

অপেক্ষমাণ এক গোয়েন্দা অত্যধিক ক্ষুব্ধ হয়ে মটকার জ্বালানী তেল অন্যান্য তাঁবুতেও ছিটিয়ে দিতে লাগলো। পার্শ্ববর্তী তাঁবুর বাসিন্দারা এতোটাই নিশ্চিন্তে গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিলো যে, তাদের কেউ এদের কোনকিছুই টের পেল না। সব তাঁবুতে তেল ছিটিয়ে দিয়ে ফকিরের তাঁবু থেকে প্রদীপ এনে সব তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিল। জ্বলন্ত তাঁবুর ভেতরে ঘুমন্ত বাসিন্দাদের আর্তচিৎকার শুরু হওয়ার আগেই তারা দ্রুত পায়ে জায়গা ত্যাগ করে ঘোড়া নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিল।

* * *

দু'দিন পর নাহিদাকে খবর দেয়া হলো, দরবেশরূপী কুচক্রীদের ইহলীলা সাঙ্গ করে দেয়া হয়েছে। বুখারায় যেসব সেনাসদস্য অবস্থান করছিলো, তাদের কর্মকান্ড ছিলো জনগণের বিপক্ষে এবং আতংকজনক। বুখারাতেও ফকিররূপী ধর্মগুরুর হত্যাকাণ্ডকে গযনী বাহিনীর নৃশংসতা হিসেবে প্রচারিত হয়। এ খবরে বুখারার সৈন্যরা গযনীর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

এদিকে বুখারা ও হাজারাশীপের কথিত ধর্মতাত্ত্বিকের নিহতের ঘটনা এবং সেখানকার সেনাদের গযনীবিরোধী বিক্ষোভের খবর সুলতানের কাছে পৌঁছালো সাত দিন পর।

সুলতানের কাছে প্রথম খবর পৌঁছালো নাহিদার তৎপরতার কথা। দ্বিতীয় খবর এলো নাহিদার নির্দেশে হাজারাশীপ ও বুখারার কথিত ধর্মগুরুদের হত্যা করা হয়েছে।

এসব খবর শুনে সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন সুলতান। তার ভাবনা শেষ হতে না হতেই খবর এলো নাহিদার পক্ষ থেকে আরেকজন দূত জরুরী খবর নিয়ে এসেছে।

এই দূত জানালো, আবুল আব্বাসের নিযুক্ত বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন বুখারায় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে এবং বুখারা ও হাজারাশীপের সকল সৈন্যকে সেনাপতি আবু ইসহাক এবং সেনাপতি খমরতাশ বিদ্রোহী করে তুলেছে। রাজধানী জুরজানিয়ায় যে সামান্যসংখ্যক সৈন্য রয়েছে, তারা আবুল আব্বাসের পক্ষে বটে; কিন্তু বিপুল বিদ্রোহী সৈন্যের আক্রমণে প্রতিরোধ করার মতো শক্তি তাদের নেই।

এ খবর শুনে তাৎক্ষণিকভাবে সুলতান মাহমূদ আবুল আব্বাসের নামে পয়গাম লিখালেন। ঐতিহাসিকদের মতে সুলতানের লেখা এই পয়গামের ভাষ্য ছিলো অনেকটা এমন–

"আমার বিশ্বাস, আপনার বিরুদ্ধে ধেয়ে আসা বিদ্রোহ আপনার পক্ষে দমন করা অসম্ভব। কারণ, একে তো আপনার বয়স কম, দ্বিতীয়ত এ ধরনের বিদ্রোহ দমনের অভিজ্ঞতাও আপনার নেই। আপনার ক্ষমতাচ্যুতি কিংবা বিদ্রোহীদের হাতে আপনি নিহত হওয়ার আগেই আপনাকে আমার সহযোগিতা করা উচিত। কিন্তু এই সাহায্য ও সহযোগিতা তখনই করা সম্ভব, যখন আপনার স্বাধীনতা ও স্বাধিকার অক্ষুণ্ন রেখেই আপনি আমার অধীনতা কবুল করে নেবেন এবং আমার নামে খুতবা জারি করবেন।

আমার অধীনতা স্বীকার করে নিলেও আপনার স্বাধীকার ও স্বাতন্ত্রবোধ বজায় রাখা হবে। এই অধীনতা স্বীকার করে নিলে আপনার বিশেষ উপকার এই হবে যে, আমি আপনার ক্ষমতা বহাল রাখার জন্যে আমার সবচেয়ে চৌকস সেনাদল আপনার নিরাপত্তা রক্ষায় রাজধানী জুরজানিয়ায় মোতায়েন

করতে পারবো। দ্বিতীয়ত তারা শুধু আপনাকেই নিরাপত্তা দেবে না, আপনার গোটা রাষ্ট্রের নিরাপত্তাব্যবস্থা আপনার নিয়ন্ত্রণে এনে দেবে।

আপনাকে সতর্ক করে দিতে বাধ্য হচ্ছি যে, এ ব্যাপারে যদি আপনার পরামর্শ একান্তই দরকার হয়, তাহলে শুধু প্রবীণ উজির আবুল হারেসের সাথেই আপনি পরামর্শ করতে পারেন। এ ব্যাপারে বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন ও সেনাপতিদের সাথে যদি পরামর্শ করেন, তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করবে।

আপনি এতোটাই অনভিজ্ঞ যে, আপনাকে ঘিরে আপনার রাষ্ট্রের চারপাশে কী ঘটছে, আপনি এ ব্যাপারে একেবারেই বেখবর। শত শত মাইল দূরে গযনীতে বসেও আমি জানতে পারছি, বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে আপনি একেবারেই সঙ্গীহীন। আশা করবো, এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে আপনি অযথা কালক্ষেপণ ও সময় নষ্ট করবেন না।"

* * *

খ্যাতিমান ঐতিহাসিক বায়হাকী লিখেছেন, গযনী সুলতানের লেখা এই পয়গাম খাওয়ারিজম শাহ আবুল আব্বাসের কাছে পৌঁছুলে তিনি এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্য রাষ্ট্রের সকল গভর্নর ও সেনাপতিদের সভা ডাকলেন। এ সভায় বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন, সেনাপতি আবু ইসহাক, সেনাপতি খমরতাশও বাদ পড়লো না।

এহেন পরিস্থিতিতে আবুল আব্বাস সুলতান মাহমূদের অধীনতা গ্রহণের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি পয়গামটি কাউকে না দেখিয়ে সভায় শুধু এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, গযনী শাসক সুলতান মাহমূদ তার অধীনতা কবুল করে নিয়ে খুতবায় তার নাম পাঠ করার প্রস্তাব করেছেন।

বৈঠকে উপস্থিত একমাত্র উজির আবুল হারেস ছাড়া সকল সেনাপতি ও গভর্নরই প্রস্তাব মেনে নেয়ার বিপক্ষে মতামত দিলেন। রাজধানীর রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের খবর বৈঠক শেষ হতে না হতেই দ্রুত সকল সেনাশিবিরে পৌঁছে গেলো। খবর পাওয়ামাত্রই সেনারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিল।

আবুল আব্বাস বিদ্রোহের কথা শুনে সৈন্যদের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করে বিদ্রোহ আপাতদৃষ্টিতে প্রশমন করলেন। সেদিনের বৈঠক সিদ্ধান্ত ছাড়াই মুলতবী হয়ে গেল। চারদিন পর আবারো বৈঠক ডাকা হলো।এবার বৈঠকে আবুল আব্বাস ঘোষণা করলেন, গযনীর অধীনতা মেনে নেয়া হবে না। গযনী সুলতান যদি খাওয়ারিজম আক্রমণ করে বসে, তাহলে তুর্কী খানদের কাছ থেকে সহযোগিতা নেয়া হবে। এজন্য তুর্কি খানদের সাথে সহসাই মৈত্রীচুক্তি করা হোক এবং সেই চুক্তিকে গোপন রাখা হোক।

ঐতিহাসিক বায়হাকী লিখেছেন, আবুল আব্বাসের এই সিদ্ধান্তের খবর গযনীর গোয়েন্দারা সুলতানকে যথাসময়ে জানিয়ে দিল। সুলতান খবর পেলেন, আবুল আব্বাস তার প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে তুরস্কের খানদের সাথে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করতে যাচ্ছেন।

এ খবর শুনে সুলতান মাহমূদ সৈন্য এবং পাঁচশত জঙ্গী হাতির বহর নিয়ে খাওয়ারিজমের নিকটবর্তী বলখ পৌছে আবুল আব্বাসকে খবর পাঠালেন, সুলতানের প্রেরিত পয়গাম না মানলে গযনী বাহিনী জুরজানিয়া আক্রমণ করবে।

সুলতানের সেনাসমাবেশের খবর শুনে তুর্কিস্তানের খান শাসকরা খাওয়ারিজম শাহের সাথে সামরিক সহযোগিতা চুক্তি করতে অস্বীকৃতি জানালো।

তুর্কিস্তানের খান শাসকরা বলখে এসে সুলতানকে খাওয়ারিজম আক্রমণ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করলো। কিন্তু সুলতান তাদের কথায় সম্মত হলেন না। তিনি তার অভিপ্রায়ে অবিচল রইলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে তুর্কি খানেরা আবুল আব্বাসকে গিয়ে সুলতানের প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী করালো। সেইসাথে খাওয়ারিজম জুড়ে সুলতানের নামে খুতবা দেয়ার প্রস্তাব পাশ করালো।

সুলতানের দাবী পূরণে আবুল আব্বাস সম্মত হওয়ায় সুলতান বলখ থেকে তাঁর সেনা বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিলেন।

সুলতান মাহমূদের সময়কার বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক আবু নসর মুহাম্মদ আল উতবী ছিলেন সুলতানের একজন ঘনিষ্টজন। উতবী বহু সফরে সুলতানের সহযাত্রী ছিলেন। সুলতানের পক্ষে তিনি কয়েকবার বিভিন্ন রাষ্ট্রে

দূতের ভূমিকাও পালন করেছেন। উতবী তার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ সম্বলিত প্রামাণ্যগ্রন্থ কিতাব আল ইয়ামিনীতে লিখেছেন–

“আবুল আব্বাস সুলতানের প্রস্তাব মেনে নিতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কারণ তিনি স্বাধীনতা ও স্বাধিকার হারানোর আশঙ্কা করছিলেন। কিন্তু তার উজির আবুল হারেস তাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, সুলতানের প্রস্তাব মেনে নেয়ার মধ্যে এতোটা ক্ষতি নেই, যতটুকু ক্ষতি সেনাবিদ্রোহে হবে। সর্বোপরি সম্মত সুলতানের প্রস্তাব মেনে নিতে আবুল আব্বাসকে নাহিদা করাতে জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

নাহিদা আবুল আব্বাসকে আশ্বস্ত করতে বলেছিলেন–

“আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, আমার ভাই আপনার স্বাধীনতা কখনো হরণ করবেন না। তিনি আপনাকে তার মিত্র এবং আপনাকে বিদ্রোহের আশঙ্কা থেকে নিরাপদ করতে চান।”

“আমি বুঝতে পারছি না, কে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে? আমার সেনাদের প্রতি আমার আস্থা আছে।” নাহিদার উদ্দেশে বললেন আবুল আব্বাস।

“আপনি ভুল ধারণা পোষণ করছেন। সেনাবাহিনী থেকে আপনার আস্থা এবং আপনার প্রতি সৈন্যদের বিশ্বস্ততা বিনষ্ট করে দেয়া হয়েছে।”

“কে সেনাদের মন থেকে আমার আস্থার বিলোপ ঘটিয়েছে?”

“আপনার গভর্নর আলাফতোগীন, সেনাপতি আবু ইসহাক এবং সেনাপতি খমরতাশ।” বললেন নাহিদা।

এদের পশ্চাতে রয়েছে ফিরিঙ্গী খৃস্টান ও ইহুদী কুচক্রী গোষ্ঠী। আপনাকে বুঝতে হবে, সুলতান মাহমূদের সহযোগিতা ছাড়া আপনার বাদশাহী টেকানো অসম্ভব। আপনি আত্মশ্লাঘায় না ভুগে আমার কথায় বিশ্বাস করুন। আপনি দয়া করে গযনী সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করে নিন।”

চিন্তা-ভাবনার পর অবশেষে আবুল আব্বাস সুলতানের আনুগত্য মেনে নিতে সম্মত হলেন এবং সুলতানের নামে খুতবা পাঠের ঘোষণা জারি করলেন।

সুলতানের নামে খুতবা পড়ার হুকুমনামা হাজারাশীপ ও বুখারায় পৌঁছুলে সৈন্যদের মধ্যে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব থেকেই সৈন্যদেরকে

সুলতানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছিল। এবার তার নামে খুতবা পড়ার হুকুমনামা ক্ষোভের আগুনে যেন ঘি ঢেলে দিলো।

বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন সৈন্যদের ছোট বড় কমান্ডারদের ডেকে এনে বললো, দরবেশগণ যে বিপদাশঙ্কার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এই বিপদ এখন গযনী সেনাবাহিনীর রূপধারণ করে আসছে। যে করেই হোক এ বিপদ আমাদের রুখতেই হবে। নয়তো আমাদের ও তোমাদের মা-বোনেরা গযনীর লুটেরা হিংস্র বাহিনীর দাসী-বাঁদীতে পরিণত হবে।

হিন্দুস্তানকে লুণ্ঠনকারী সুলতান মাহমূদ এখন খাওয়ারিজমকে লুণ্ঠনের জন্য এবং এখানকার মুসলিম নারীদের বাঁদী-দাসীতে পরিণত করে গযনী নিয়ে যাওয়ার জন্য আসছে। পরিতাপের বিষয়, খাওয়ারিজম শাহ আবুল আব্বাস নিজেই এই ভয়ঙ্কর লুটেরাকে ডেকে আনছেন। গযনীর লুটেরাদের প্রতিরোধ করতে হলে সর্বাগ্রে আমাদেরকে খাওয়ারিজম শাহী খতম করে সেনাশাসন জারি করতে হবে।

আলাফতোগীন সেনাকমান্ডারদের উদ্দেশে বললেন, প্রত্যেক কমান্ডার নিজ নিজ ইউনিটের সেনাদের বলে দাও, দরবেশগণ তোমাদের যে ভাগ্য বদলের কথা বলেছিলো, সেই দরবেশদের হত্যাকারী খুনীরা এখন তোমাদের ভাগ্য বরবাদ করতে আসছে।

ওদিকে হাজারাশীপের সৈন্যদেরকেও সেনাপতি আবু ইসহাক এবং সেনাপতি খমরতাশ একইভাবে গযনী সুলতান ও আবুল আব্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উন্মাদনায় উত্তেজিত করে বিদ্রোহে ইন্ধন দিলো।

* * *

এই ঘটনার কয়েক দিন পরের ঘটনা। আবুল আব্বাসের একান্ত সংবাদবাহক এসে তাকে খবর দিলো, তুর্কিস্তানের কয়েকজন খান আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। তাদের সাথে গভর্নর আলাফতোগীনও রয়েছেন। তারা লেকের পাড়ের বাগানে অপেক্ষা করছেন। গভর্নর আলাফতোগীন তাদের মর্যাদা দেয়ার জন্য মহামান্য শাহকে নিজে তাদের অভ্যর্থনা জানানোর অনুরোধ করেছেন।

খবর শুনে আবুল আব্বাস তার একান্ত প্রহরীদেরকে সওয়ারী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। এমন সময় নাহিদার কাছে খবর গেলো, বাদশা আবুল আব্বাস বাইরে কোথাও যাচ্ছেন। তিনি দৌড়ে আবুল আব্বাসের খাস কামরায় পৌছুলে আবুল আব্বাস তাকে বললেন তিনি কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাচ্ছেন। নাহিদা আবুল আব্বাসকে বাইরে যেতে নিষেধ করলেন।

"তুর্কিস্তানের মেহমান এসেছে। তাদের সম্মানে আমি নিজে অভ্যর্থনা জানাতে যাচ্ছি। অসুবিধা কী? তাদের সাথে গভর্নর আলাফতোগীন রয়েছেন।"

"না, আপনি যাবেন না। এমনই যদি হতো, আলাফতোগীন দূত পাঠালো কেন? সে নিজেই তো আসতে পারতো।" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আবুল আব্বাসকে বললেন নাহিদা।

"আরে, এই মহিলাদের নিয়ে যতো সমস্যা। এখানে তুমি সমস্যার কী দেখলে? ঘাবড়ে যাচ্ছো কেন নাহিদা?"

"আল্লাহ্র দোহাই লাগে আবুল আব্বাস! তুমি এখন বাইরে যেয়ো না। আমার মন বলছে, বাইরে কোন বিপদ অপেক্ষা করছে।"

নাহিদা আবুল আব্বাসের হাত ধরে বললেন, "আবুল আব্বাস! জীবনে কোনদিন আমি তোমাকে কোথাও যেতে নিষেধ করিনি। আজ তোমাকে করজোড় মিনতি করছি। তুমি বাইরে যেয়ো না। কোন জরুরী কাজের বাহানা করে যাওয়া বাতিল করে দাও।"

"ধুত্তরী! আমি মহিলা নাকি?"

"না, তুমি মহিলা হবে কেন? পুরুষ হলেও আজ একজন অবলা নারীর কথা রাখো। আজ আমার এই অনুরোধটুকু রক্ষা করো" বলে কেঁদে ফেললেন নাহিদা। আমি বাইরে ভয়ঙ্কর বিপদাশঙ্কা করছি।"

"স্মিত হেসে আবুল আব্বাস নাহিদার উদ্দেশে বললেন, প্রেমের টানে এতোটা উতলা হয়ে যাওয়া ঠিক নয় নাহিদা। আমাকে আমার অবস্থান থেকে নামিয়ে দিও না তুমি! বাইরে ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

"আবুল আব্বাসকে বাইরে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে না পেরে বিপদাশঙ্কায় নাহিদার হিতাহিত জ্ঞান হারানোর উপক্রম হলো। আবুল আব্বাস নাহিদাকে পাশ কেটে বাইরে বেরিয়ে পড়লে নাহিদাও দৌড়ে বেরিয়ে এলেন।

ততোক্ষণে আবুল আব্বাসকে বহনকারী ঘোড়ার গাড়ী নিরাপত্তা রক্ষীদের ভিড়ে চলে গেছে। উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত নাহিদাকে তার একান্ত সেবিকা ও দাসীরা বোঝাতে ও সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু নাহিদার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ক্রমেই বেড়ে চললো।

এর কিছুক্ষণ পরেই রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে বহুসংখ্যক অশ্বারোহীর দৌড়ঝাপের শব্দ শোনা গেলো। সেই সাথে সেনাদের তাকবীর ধ্বনি ভেসে এলো।

আবুল আব্বাস হয়তো ফিরে এসেছেন এই আশায় নাহিদা দৌড়ে তার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু বিধি বাম, আসলে এরা ছিলো বিদ্রোহী সেনা, যারা রাজপ্রাসাদকে ঘেরাও করেছিলো। বিদ্রোহী সেনারা শ্লোগান দিচ্ছিলো, নারীলিপ্সু খাওয়ারিজম শাহীর পতন হয়েছে, গযনী গোলামকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, খাওয়ারিজম শাহী আলাফতোগীন জিন্দাবাদ...।

নাহিদার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো। তিনি মাথা দু'হাতে ধরে কোনমতে নিজের বিছানায় গিয়ে পড়ে গেলেন। ইত্যবসরে রাজপ্রাসাদ দখলের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে সর্বপ্রথম নৃশংসতার শিকার হলেন আবুল আব্বাসের বিশ্বস্ত উজির আবুল হারেস। তাকে নির্মমভাবে কুপিয়ে খুন করলো আলাফতোগীনের লেলিয়ে দেয়া সৈন্যরা। তারা আবুল হারেসকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হলো না, তার শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেললো।

রাজপ্রাসাদের ভেতর-বাইরের সবখানে হাজারাশীপ ও বুখারার সৈন্যরা ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলো। কিন্তু আলাফতোগীনের নির্দেশে নির্বিচারে হত্যা ও লুটতরাজ থেকে বিরত রইল সৈন্যরা। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে আবুল আব্বাসের বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী ও অনুগত ভৃত্যদের খুঁজে খুঁজে বের করে এনে হত্যা করা হলো। রাজধানী জুরজানিয়াতে নিযুক্ত সৈন্যদের দু'টি ইউনিট বিদ্রোহী-সেনাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু তাদের সৈন্যসংখ্যা এতোটাই কম ছিলো যে, বিদ্রোহীরা তাদের সবাইকে ঘেরাও করে অস্ত্রসমর্পণে বাধ্য করল। এরপর যে ডেপুটি সেনাপতির নির্দেশে বিদ্রোহীদের মোকাবেলার জন্য এই ইউনিটের সৈন্যরা প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তুলেছিলো, তাকে এবং তার অধীনস্ত সকল কমান্ডারের ধরে ধরে হত্যা করলো।

বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন বিজয়ী এবং রাজার বেশে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলো। সে ছিলো স্বঘোষিত বাদশা। এই বাদশাহ হওয়ার প্রতি জুরজানিয়া ও খাওয়ারিজমের সাধারণ মানুষের কোনই আগ্রহ ছিলো না। দেশের সাধারণ মানুষ তাকে কখনো রাজার আসনে বসানোর উপযুক্ত মনে করেনি।

রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে গভর্নর আলাফতোগীন খাওয়ারিজম শাহের রাজকীয় মসনদে আসীন হয়ে ফরমান জারি করল, "দেশব্যাপী ঘোষণা করে দাও, খাওয়ারিজম শাহীর পতন হয়েছে, আজ থেকে আলাফতোগীন খাওয়ারিজমের বাদশা এবং আবুল আব্বাস নিহত হয়েছে।"

অবশেষে নাহিদার আশঙ্কাই সত্যে পরিণ হলো। তুর্কিস্তানের খানের আগমনের মিথ্যা খবর দিয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে বাইরে এনে আলাফতোগীনের নির্দেশে বিদ্রোহী সৈন্যরা সরলমতি আবুল আব্বাসকে হত্যা করল।

সময়টা ছিলো ৪০৭ হিজরী সনের ১৫ শাওয়াল মোতাবেক ১০১৮ খৃস্টাব্দের ১৭ মার্চ।

ঐতিহাসিক বায়হাকী ও গারদিজী লিখেছেন, বিদ্রোহী সেনাদের রাজমহলে প্রবেশ করতে দেখে নাহিদার একান্ত কর্মচারী জেবীন– যে প্রকৃতপক্ষে গযনী সুলতানের একজন পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত গোয়েন্দা ছিলো– দৌড়ে নাহিদার কক্ষে প্রবেশ করলো। জেবীন নাহিদার কক্ষে গিয়ে দেখে নাহিদা বিছানায় পড়ে বিলাপ করছে–

"আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম, মৃত্যু তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেলো"। এমতাবস্থায় জেবীন নাহিদার জীবনাশঙ্কা বোধ করলো। সে নাহিদাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, চিন্তা করো না শাহজাদী, যে করেই হোক আমরা তোমাকে গযনী নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো। যা ঘটে গেছে এ নিয়ে বিলাপ করে বিদ্রোহী সেনাদের তোমার প্রতি মনোযোগী করো না। বিপদে ধৈর্য ধরো এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে স্বাভাবিক হও।"

নাহিদা শরীর থেকে রাজকীয় পোশাক ছুঁড়ে ফেলে অতি সাধারণ সেবিকাদের পোশাক গায়ে জড়িয়ে মাথায় উড়না দিয়ে সাধারণ বেশে প্রাসাদ তাগ করে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। এ কাজে তাকে পথপ্রদর্শন কর হলো তারই একান্ত কর্মচারী জেবীন।

সাধারণ সেবিকার রূপ ধারণ করে ছদ্মবেশে নিজের কক্ষ ত্যাগের উদ্দেশ্যে নাহিদা চৌকাঠে পা রাখতেই তার মুখোমুখী হলো আলজৌরী।

"তোমার খাওয়ারিজম শাহীর রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে নাহিদা! পালাবে কোথায়? বাইরে গেলে বিদ্রোহী সেনাদের হাতে খুন হবে, নয়তো উত্তেজিত সৈন্যরা তোমাকে টেনে ছিড়ে ফেলবে।" ভর্ৎসনামাখা কণ্ঠে বললো আলজৌরী।

"শোন নাহিদা, আমার কথা মেনে আমার সাথে এসো। আমি হারেমে তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওখানে থাকলে তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।

আর ভালো চাইলে, তুমি আমার বাবাকে বিয়ে করতে পারো। এখন তো আর তোমার পক্ষে গযনী ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। এখানে বন্দী থাকার চেয়ে আমার বাবার চতুর্থ স্ত্রী হয়ে থাকা অনেক ভালো হবে।"

"আলজৌরী!" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন নাহিদা। আমার গযনী ফেরার জন্য মোটেও তাড়া নেই। অচিরেই দেখতে পাবে গযনীর সিংহের দল এখানে পৌঁছে যাবে... ।"

হঠাৎ ব্যাঘ্র মূর্তি ধারণ করে গলা চড়িয়ে আলজৌরীর উদ্দেশ্যে নাহিদা বললো-

"শয়তানী, সরে যা আমার সামনে থেকে। আমি এখনো শাহজাদী। গযনীর সিংহ সুলতান মাহমূদের বোন আমি। এখনো আমার ভাই মরে যায়নি।

ভুলে গেছো তুমি কার মেয়ে? এক নিমকহারাম সেনাপতির মেয়ে তুমি। ক্ষমতার উদগ্র লিপ্সা যাকে পরিণতির কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। যাও, গিয়ে ওদের বলো, সাহস থাকলে ওরা যেনো আমাকে হত্যা করে, নয়তো জেলখানায় বন্দী করে। এরপর তুমি নিজ চোখেই বাপের নিকমহারামীর পরিণাম এবং স্বঘোষিত শাহের ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখতে পাবে।"

ঠোঁটের কোনে বিদ্রূপাত্মক হাসি এবং বাঁকা চাহনী দিয়ে আলজৌরী সেখান থেকে চলে এলো।

এই ফাঁকে জেবীন নাহিদাকে বললো, আসুন শাহজাদী, আমরা এই ফাঁকে এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি।

“না জেবীন! আমি চুপিসারে পালিয়ে যাবো না। আমি ধোঁকাবাজ প্রতারক, নিমকহারাম চক্রান্তকারী খাওয়ারিজম শাহীর মুখোমুখী হবো।”

একথা বলে ঝড়ের বেগে কক্ষ ছেড়ে বাইরের দিকে পা বাড়ালেন নাহিদা। কিন্তু জেবীনকে তার পিছু পিছু দৌড়াতে দেখে দাঁড়িয়ে বললেন, “জেবীন! আমার ভবিষ্যৎ আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দাও। তুমি আমার ধারে কাছে থাকলে ওরা তোমাকে জ্যন্ত রাখবে না। তুমি বরং খবর নাও, এখানকার পরিস্থিতির সংবাদ দিতে কেউ গযনী রওনা হয়ে গেছে কি না। যদি কাউকে খুঁজে না পাও, তাহলে নিজেই চলে যাও। আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে নাও।”

* * *

খাওয়ারিজম শাহের মসনদে বসে আলাফতোগীন নানা শাহী ফরমান ঘোষণা করছিলো, যে মসনদে কয়েক ঘন্টা আগেও বসেছিলেন আবুল আব্বাস। আলাফতোগীনের দরবারে কিছু লোক দু'হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে ছিলো। এদের অধিকাংশই ছিলো সেনাবাহিনীর লোক। আবুল আব্বাসের শাসনব্যবস্থাপনায় জড়িত কেউ সেখানে ছিলো না। আলাফতোগীনের দরবারে কিছুটা শোরগোলের মতো নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থা বিরাজ করছিল। হঠাৎ দরবারে পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেলো মানুষের ভিড় ঠেলে সদ্যবিধবা রাণী নাহিদা বাঘিনীমূর্তি ধারণ করে আলাফতোগীনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

“ওহ্‌, নাহিদা! নাহিদার দিকে তাকিয়ে বললো আলাফতোগীন। তোমার ব্যাপারে আমি কোন কিছু চিন্তা করারই অবসর পাইনি।

“নাহিদা, আমি জানি, তুমি প্রাণ ভিক্ষা চাইতে এসেছো। তুমি হয়তো বুঝতে পারোনি, তোমার স্বামীকে কিন্তু তুমিই হত্যা করিয়েছো। তুমি তার উপর ছলনার জাদু চালিয়ে তাকে গযনীর কেনা গোলামে পরিণত করেছিলে। খাওয়ারিজমের স্বাধীনচেতা জনতা, খাওয়ারিজমের আত্মমর্যাবোধসম্পন্ন সেনাবাহিনী কোন বহির্দেশের গোলামী কখনো বরদাশত করে না। দেখতেই পাচ্ছো, সমগ্র জাতি ও সৈন্যরা মিলিত হয়ে আমাকে বুখারা থেকে টেনে এনে এই মসনদে বসিয়েছে। এখন আমি তাদের ইচ্ছাতেই শুধু এই মসনদ ছাড়তে

পারি। জাতি আমার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করছে, যেকোন মূল্যে এই দায়িত্ব আমি পালন করবো।”

“প্রাণ ভিক্ষা নয়, আমি প্রাণ দিতে এসেছি বেঈমান!” হুংকার দিয়ে বললেন নাহিদা।

তোমার জানা উচিত, আমি যা করেছি, তা আল্লাহ্ ও এখানকার সাধারণ মুসলমানদের ঈমানের সার্থে করেছি। তাদের ধর্ম, ইজ্জত, সম্ভ্রম ও মর্যাদার সাথে করেছি।

বেঈমান! তুমি নিজে যেমন পবিত্র কুরআনের অসম্মান করেছো, ফিরিঙ্গিদের দিয়েও পবিত্র কুরআনের অবমাননা করিয়েছো। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সবকিছু দেখেন, আল্লাহ্‌র কাছে তুমি কিছুই লুকোতে পারবে না।

বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যার ফুলঝুরি দিয়ে সরলপ্রাণ জনতা ও সৈন্যদের বিভ্রান্ত করতে পারলেও অচিরেই জেনে যাবে, জনতা তোমাকে এখানে আনেনি, তুমি জনতা ও সৈন্যদেরকে ধোঁকা দিয়ে এখানে এসেছো। তুমি যদি জাতির কাছে এতোটাই প্রিয় ব্যক্তি হতে আর এতোটাই সম্মানী ব্যক্তি হতে, তাহলে প্রতিটি গলি আর প্রতিটি বাড়ির সামনে সৈন্য মোতায়েন করেছো কেন? শহরের লোকদেরকে তোমাকে অভ্যর্থনা জানানোর সুযোগ দিচ্ছো না কেন? তোমার এই রাজকীয় অভিষেকের দিনে শহরে মৃত্যুর মাতম কেন? শহরের মানুষ তোমার বিজয়ের জয়ধ্বনী করছে না কেন? শহরের চতুর্দিকে সেনারা টহল দিচ্ছে কেন?”

হঠাৎ দরবারে এক কোন থেকে গর্জন শোনা গেলো, “হুঁশ করে কথা বলো মহিলা। তুমি কি জানো না, খাওয়ারিজম শাহের সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছো?”

“খাওয়ারিজম শাহ! সে তো ছিলো আমার স্বামী। এই খুনীরা আমার স্বামীকে হত্যা করেছো। কিন্তু আমার আল্লাহ্ মরেননি। তিনি অবশ্যই এই খুনের প্রতিশোধ নেবেন।

আলাফতোগীনের উদ্দেশ্যে সাহিদা চিৎকার করে বললো, আলাফতোগীন! সেনাবাহিনীর সহযোগিতা ও ছত্রছায়ায় তুমি খাওয়ারিজমের বাদশাহী করার মতলব নিয়ে যদি এই মসনদ দখল করে থাকো, তবে আমি তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, অচিরেই তোমার এই দিবাস্বপ্ন কর্পুরের মতো উবে যাবে। আর যে ছাতার আশ্রয়ে ক্ষমতার আশায় খুনের নেশায় তুমি উন্মত্ত হয়ে আছো, অচিরেই

এমন তুফান দেখতে পাবে, যাতে তোমার এসব আশ্রয় খড়কুটোর মতো বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে না।

খাওয়ারিজম শাহের মসনদ একটি পবিত্র মসনদ। মসনদের যোগ্য ব্যক্তি ছাড়া এখানে কারো বসার অধিকার নেই। তুমি মামুনী খান্দানের জুতা বহন করে তোষামোদী করে গভর্নরের পদে পৌছেছিলো। মামুনী খান্দান তোমার চক্রান্তকে আমলে না নিয়ে তোমাকে বুখারার গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত করেছিলো। কিন্তু তুমি সেই পুরস্কারের মর্যাদা রাখতে পারলে না। তোমার সীমাহীন লোভ, হিংসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর বেঈমানী তোমার ভাগ্যে আজীবন কয়েদখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পঁচে পঁচে দুর্গন্ধ ছাড়ানোর পরিণতি লিখে দিয়েছে। এটাই হয়তো তোমাকে বরণ করতে হবে।"

"নিয়ে যাও ওকে! বেচারী পাগল হয়ে গেছে। ওকে তার নিজস্ব কক্ষে রেখে বাইরে প্রহরা বসিয়ে দাও। তার নিজস্ব শয়ন কক্ষেই তাকে নজরবন্দী করে রাখো। আমি সুলতান মাহমূদকে লিখে পাঠাবো, তুমি যদি খাওয়ারিজমের উপর আগ্রাসন চালাও, তাহলে তোমার বোনের থেতলানো দেহ দেখতে পাবে। নাহিদাকে তোমরা মুক্তিপণ হিসেবে রাখতে পারো। তার উপর কোন ধরনের অত্যাচার করো না। মানুষ যাতে একথা বলতে না পারে, খাওয়ারিজম শাহী আলাফতোগীন এক বিপন্ন বিধবা অসহায় নারীর উপর জুলুম করেছে।

'ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তোমার কবরের উপরেও থুতু ছিটাবে।' ভর্ৎসনামাখা কণ্ঠে বললেন নাহিদা। যে সেনাবাহিনীর জন্ম হয়েছিলো কাফের-বেঈমানদের বিরুদ্ধে ঈমানদারদের পক্ষ হয়ে লড়াই করার জন্য, সেই সেনাদেরকে তুমি নিজ ভূমি জয় করার ভ্রাতৃঘাতি হানাহানিতে প্ররোচিত করেছো। যে সেনারা সব সময় উৎকর্ণ থাকতো নির্দেশের জন্য, তাদেরকে তুমি এখন শাসক বানিয়ে দিয়েছো, এখন আর এই সেনাবাহিনীর একদিনও যুদ্ধ করার যোগ্যতা নেই।

অতঃপর উর্দ্ধতন কোন সেনাপতির নির্দেশে কয়েকজন সৈন্য নাহিদাকে দু'দিক থেকে হাত ধরে তার কক্ষে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

সেই সময়কার বিখ্যাত ঐতিহাসিক আলফজলী তার লেখা কিতাব 'আছারুল উজারা' গ্রন্থে লিখেছেন–

“চার মাস পর্যন্ত আলাফতোগীন খাওয়ারিজমে চরম দুঃশাসন চালায়। গোটা খাওয়ারিজমব্যাপী সে ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং নিজেকে ইসলামের পতাকাবাহী ও ইসলামের সেবক ঘোষণা করে। কিন্তু কারো মুখ থেকে যদি তার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র বিরোধিতামূলক শব্দ বের হতো, তাকেই ধরে এনে হত্যা করতো।

দেশব্যাপী আবাসিক এলাকায় সারাক্ষণ সেনাবাহিনী টহল দিতো। কারো পক্ষ থেকে বিরোধিতার সামান্য সংশয় জাগ্রত হলেই তাকে ধরে এনে হত্যা করতো। ফলে দিন দিন সাধারণ মানুষের জীবন, মান সংকীর্ণ হয়ে এলো। খাদ্যসামগ্রীর দাম আকাশচুম্বি হলো। জনজীবনে নেমে এলো চরম হতাশা। কিন্তু সেনাবাহিনীর লোকেরা রাজকীয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। দেশের উন্নত ও শ্রেষ্ঠ সব উৎপাদন তাদের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হলো। লাখ লাখ মুসলিম জনতাকে সেনাবাহিনী তাদের গোলামে পরিণত করলো।

প্রশ্ন হতে পারে দীর্ঘ চারমাস পর্যন্ত সুলতান মাহমূদ কী করলেন? কারণ, আলাফতোগীনের সফল অভ্যুত্থানের খবর তো তিনি চতুর্থ দিনেই পেয়ে গিয়েছিলেন।

সুলতান মাহমূদের সামনে তখন দু'টি সমস্যা ছিল।

প্রথমত কাশ্মীর বিপর্যয়ের পর সৈন্যঘাটতি তখনো পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সেই সাথে সুলতান এমন বিপুল শক্তি নিয়ে খাওয়ারিজম আক্রমণ করতে চাচ্ছিলেন, যাতে তিনি এক অভিযানেই গোটা খাওয়ারিজম কব্জায় নিয়ে নিতে পারেন। দ্বিতীয়ত তিনি তার ছোট বোন নাহিদাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন, যাতে আক্রমণের সময় প্রতিপক্ষ নাহিদার সামনে মানবিক কোন দুর্বলতা উত্থাপন করে তাকে মানসিকভাবে ঘায়েল করতে না পারে।

‘আছারুল উজারা’ গ্রন্থে লেখা হয়েছে, নাহিদাকে জীবন্ত উদ্ধারের ব্যাপারটি সুলতান তার উপদেষ্টা পরিষদে এই বলে উত্থাপন করেন–“সম্মানিত উপদেষ্টাবৃন্দ! আমার ভগ্নিপতি ও অগণিত নিরপরাধ মুসলমান হত্যার প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে আমার বুকে। আমর আদরের ছোট বোনটি আবারো বৈধব্যের শিকার হয়েছে। এখন যদি আমি এদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক অভিযানের নির্দেশ দিই, তাহলে সেটি আমার ব্যক্তিগত সার্থোদ্ধারের জন্য বলে অভিহিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। ইতিহাস হয়তো বলবে, আমি ব্যক্তিগত হিংসা

চরিতার্থ করতে গিয়ে দুটি ভ্রাতৃপ্রতীম মুসলিম বাহিনীকে সংঘাতে লিপ্ত করে খুন ঝরিয়েছি। আপনারা গোটা ব্যাপারটি সামনে রেখে আমার করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিন। এই বিদ্রোহ ফিরিঙ্গীরা ঘটিয়েছে এবং একটি সুন্দর শান্তিপূর্ণ মুসলিম দেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। কিছুদিন পরে হয়তো দেখা যাবে, গোটা খাওয়ারিজমে ফিরিঙ্গীরা ছেয়ে গেছে। এই অঞ্চলে ফিরিঙ্গীদের উপস্থিতি গযনী ও ইসলামের জন্য কেমন হতে পারে, এ বিষয়টি আপনাদের অজ্ঞাত নয়।

"নাহিদা আমাদের গর্বের ধন, তার সাথে গযনীর ইজ্জত-আব্রুর প্রশ্ন জড়িত।" বললেন সুলতানের উজির। আমাদের প্রথম কাজ হবে তাকে ওখান থেকে বের করে আনা। আমরা আগে আক্রমণ করলে তার খুন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া আমরা যে কোন ধরনের আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিলে তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হতে পারে। আমরা আলাফতোগীনকে পয়গাম দিতে পারি, সে যেন নাহিদাকে সসম্মানে গযনী পাঠিয়ে দেয়। যদি সে তা না করতে চায়, তাহলে কমান্ডো পাঠিয়ে আগে তাকে বন্দীদশা থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হোক। এরপর খাওয়ারিজমে সেনাভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে।"

উপদেষ্টাদের সবাই উজিরের কথা সমর্থন করলেন। অতঃপর আরো কিছু ব্যাপারে শলাপরামর্শের পর সর্বসম্মতিক্রমে একটি পরিকল্পনা তৈরী করা হলো। আলাফতোগীনের নামে নাহিদাকে সসম্মানে গযনী পাঠিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করে একটি পয়গাম পাঠানো হলো।

* * *

গযনী ও খাওয়ারিজমের মধ্যে দূরত্ব তখন প্রায় পাঁচশত মাইল। তন্মধ্যে অধিকাংশ এলাকা পাহাড়ী আর বাকীটা মরুময় পাথুরে এলাকা। মরু এলাকাকে তখনকার দিনে 'সাহরায়ে গায' বলে ডাকা হতো।

দূতের যেতে আসতে প্রায় কুড়ি দিন সময় লেগে গেলো। নাহিদাকে ফেরত পাঠানোর পয়গামের জবাবে আলাফতোগীন বললো, নাহিদার মুক্তি পেতে হলে গযনী সুলতান তাকে খাওয়ারিজম শাহ্ বলে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তার সাথে কোন ধরনের যুদ্ধ করা হবে না এই মর্মে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করতে হবে।"

নাহিদাকে নিরাপদে ও সসম্মানে রাখা হয়েছে, তা প্রমাণ করার জন্য আলাফতোগীন নিজে গযনীর দূতকে নাহিদার আবদ্ধ কক্ষ দেখিয়ে দেয় এবং দূতের সাথে নাহিদার সাক্ষাত করায়। আলাফতোগীনের নির্দেশে বন্দী নাহিদার কক্ষ খুলে দূতের সাথে তার কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়।

নাহিদার সাথে দূতের সাক্ষাত পরবর্তীতে গযনীর প্রেরিত কমান্ডোদের জন্য উপকারে আসে। নাহিদার একান্ত কর্মচারী জেবীন জুরজানিয়ার পতন ও আবুল আব্বাসের নিহত হওয়ার সংবাদ নিয়ে নাহিদার নির্দেশে গযনী এসে পড়েছিলো। সে জুরজানিয়ার রাজপ্রাসাদের সকল নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল।

নাহিদাকে উদ্ধারের জন্য পাঁচজন কমান্ডো নির্বাচিত করা হলো। তন্মধ্যে জেবীন ছিলো পঞ্চম।

* * *

পাঁচ কমান্ডো অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে জুরজানিয়া পৌঁছে গেল। তারা জুরজানিয়া গিয়ে একটি সরাইখানায় রাত যাপন করলো। পাঁচজনের পাঁচটি ঘোড়া ছাড়াও তারা একটি অতিরিক্ত ঘোড়াও সাথে নিল।

রাজধানী জুরজানিয়া ও আবুল আব্বাসের রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত জেবীন এই কমান্ডো অভিযানে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করল। সে এক কমান্ডোকে সাথে নিয়ে শহরের ভেতরে ঢুকে রাজপ্রাসাদের আঙিনায় চলে এলো। তারা আসার সময় শহরময় সকল রাস্তায় বিদ্রোহী দখলদার সেনাদের টহলরত অবস্থায় দেখতে পেল। তারা সারাদিন ছদ্মবেশে শহর ও রাজপ্রাসাদের বাইরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আবার সরাইখানায় ফিরে গেল।

পরদিন গযনীর পাঁচ কমান্ডো যখন সরাইখানা থেকে বের হলো, তখন তাদের পরনে ছিলো খাওয়ারিজম বাহিনীর উর্দি। তাদের হাতের বল্লমে খাওয়ারিজম সেনাদের পতাকা। এই পতাকা ছিলো খাওয়ারিজম বাহিনীর বিশেষ ইউনিটের প্রতীক। তারা বিশেষ বাহিনীর বিশেষ সৈন্য হিসেবে মাথা উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে পথ অতিক্রম করছিলো। প্রত্যেকেই ছিল অশ্বারোহী এবং পাঁচজনের সাথে একটি অতিরিক্ত ঘোড়াও জিনবাঁধা ছিলো। তাদের

ঘোড়াগুলোর চাল-চলনেই বোঝা যাচ্ছিল এগুলো সেনাবাহিনীর বিশেষ ইউনিটের দীর্ঘ প্রশিক্ষিত ঘোড়া। শহরের পথ অতিক্রম করার সময় টহলরত অশ্বারোহী সৈন্যদের সাথেও তাদের সাক্ষাত হলো। তারা একই বাহিনীর সমগোত্রীয় ভাইয়ের মতো স্মিত হাসি দিয়ে তাদেরই পরিচিত নিয়মে সম্ভাষণ জানালো।

শহরের বাসিন্দারা এমনিতেই সেনাশাসনে ভীত-বিহ্বল ছিল। তদুপরি বিশেষ বাহিনীর বিশেষ ঘোড়ায় আরোহী সৈন্যদের দেখে পথ ছেড়ে পাশে দাঁড়িয়ে তাদের যাবার পথ করে দিচ্ছিল এবং সম্মানসূচক সালাম দিচ্ছিলো। বস্তুত এই পাঁচ কমান্ডো ছিলো গযনী বাহিনীর বিশেষ দলের সদস্য। তাদের বহনকারী ঘোড়াগুলোও ছিল প্রশিক্ষিত। এ ছাড়া তারা খাওয়ারিজম বাহিনীর পোশাক ও পতাকাধারী বল্লম ধারণ করেছিলো বলে বিশেষ বাহিনীর মতো করে এগিয়ে যেতে তাদের কোন বেগ পেতে হয়নি। কারণ, তারা প্রত্যেকেই ছিলো উপযুক্ত ও প্রশিক্ষিত। তাছাড়া তারা আগেই জেনে নিয়েছিলো খাওয়ারিজমের বিশেষ বাহিনীর রীতিনীতি।

জেবীনের দেখানো পথে অনায়াসেই গযনীর পাঁচ কমান্ডো আবুল আব্বাসের রাজপ্রাসাদের সদর দরজায় চলে গেল। এই পাঁচ কমান্ডো ভয়ানক অভিযানে নেমেছিলো। তারা জানতো, ধরা পড়লে তাদের কী ভয়ঙ্কর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু সকল ভয়-শঙ্কাকে দু'পায়ে দলে তারা সদর দরজায় গিয়ে রাজমহলের ভেতরে প্রবেশ করলো।

রাজমহলের প্রহরীরা এই কমান্ডোদেরকে তাদের বাহিনীর বিশেষ ইউনিটের সদস্য মনে করে কোন ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ না করে পথ ছেড়ে দিল। জেবীন তার সঙ্গীদেরকে একটি ঘোর অন্ধকার পথে নাহিদার কক্ষে নিয়ে গেল। মহলের ভেতরেও দখলদার সেনাদেরকে কয়েক জায়গায় সতর্ক প্রহরা দিতে তাদের নজরে পড়ল। কিন্তু গযনীর এই অকুতোভয় কমান্ডোরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে সামনে অগ্রসর হলো।

রাজপ্রাসাদের একটি জায়গায় গিয়ে জেবীন সঙ্গীদের দাঁড় করিয়ে অতিরিক্ত ঘোড়াটি ও একজন সঙ্গীকে নিয়ে আরো এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জেবীন ও তার সঙ্গী ঘোড়া থেকে নেমে নাহিদার কক্ষের সঙ্গে লাগোয়া সেবিকার কক্ষে প্রবেশ করল। কক্ষের সামনে প্রহরী দাঁড়ানো। এর পরেই নাহিদার কক্ষ। কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে জেবীন স্থানীয় ভাষায় প্রহরীদেরকে

বললো, “দরজা খোল, বন্দী মহিলাকে শাহে খাওয়ারিজম আলাফতোগীনের একটি পয়গাম শোনাতে হবে।”

প্রহরী দরজা খুলে দিতেই চকিতে তারা দু'জন প্রহরীকে টেনে কক্ষের ভিতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল এবং তরবারীর আগা প্রহরীদের বুকে ধরে তার গায়ের উর্দি খুলতে বাধ্য করলো। এরপর কাপড় দিয়ে প্রহরীদের হাত-পা বেঁধে তাদের মুখে কাপড় গুঁজে পিঠমোড়া করে বেধে মেঝেতে উপুড় করে ফেলে রাখল। সেই সাথে বললো, আমরা গযনীর কমান্ডো, একটু শব্দ করবে তো এক আঘাতেই মেরে ফেলবো।

প্রহরীর গা থেকে খুলে নেয়া একটি উর্দি নাহিদাকে দিয়ে সেটি দ্রুত পরে নেয়ার জন্য অনুরোধ করল দুই কমান্ডো।

মুহূর্তের মধ্যে নাহিদা প্রহরীর উর্দি পরে সৈনিকের বেশে তাদের সাথে বাইরে বেরিয়ে এলো। কমান্ডো দু'জন সেই কক্ষ থেকে বের হয়ে বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়ে দ্রুত এসে অশ্বারোহণ করল এবং নাহিদাকে সাথে থাকা অতিরিক্ত ঘোড়াটিতে সওয়ার হওয়ার জন্য ইশারা করল।

নাহিদা ছিলেন অশ্বারোহণে অভ্যস্ত এবং প্রশিক্ষিত। কমান্ডোদের ইশারা পেতেই তিনি এক লাফে দক্ষ সৈনিকের মতোই ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। এরা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের সঙ্গীদের সাথে মিলিত হয়ে বিনা বাধায় সদর দরজা পেরিয়ে আসতে সক্ষম হলো।

ফেরার পথে শহরের পথ অতিক্রম করার সময় আগের মতোই তাদের চাল ছিলো বিশেষ বাহিনীর মতো। খুব দৃঢ়তার সাথেই তারা মূল শহর থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলো। তারা যখন শহরের সীমানায় দাঁড়িয়ে গাছগাছালীর আড়ালে এসে পড়ল, তখন সবাই এক সাথে উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাঁকালো।

নাহিদাও প্রশিক্ষিত কমান্ডোদের সাথে সমানতালে অশ্ব হাঁকিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি অভিজ্ঞ কমান্ডোদের মোটেও অনুভব করতে দেননি, তিনি নিতান্তই একজন অবলা নারী। তিনি কমান্ডোদের মতোই সমানতালে এই দুঃসাহসী অভিযানে নারীত্বের সকল দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে অশ্ব ছোটালেন। এই অভিযানে তিনিও কমান্ডোদেরই একজন সঙ্গী।

* * *

ইত্যবসরে সুলতান মাহমূদ সৈন্য ঘাটতি অনেকাংশেই দূর করে ফেলেছিলেন। কয়েক মাস যাবত মসজিদের ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে জুমআর দিনে ঘোষণা করা হচ্ছিলো, রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও দীনের সার্থে সেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবকের তীব্র প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ইমামদের এই ঘোষণার ফলে হাজার হাজার তরুণ যুবক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়। স্বেচ্ছাসেবকরা প্রত্যেকেই নিজের ব্যবহার্য ঘোড়া কিংবা উট সাথে নিয়ে এসেছিল। যারা সশরীরে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগদান করতে পারেনি, তারা তাদের উট কিংবা ঘোড়া সেনাবাহিনীর প্রয়োজন মিটানোর জন্য দিয়ে দিয়েছিল।

প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সুলতান মাহমূদ যখন খাওয়ারিজমের বিরুদ্ধে অভিযানের নির্দেশ দিলেন, তখন তার সেনাসদস্যের সংখ্যা অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলিয়ে এক লাখের উপরে এবং প্রশিক্ষিত জঙ্গী হাতির সংখ্যা পাঁচশতেরও বেশী।

সুলতান তাঁর সৈন্যদের বলখ পর্যন্ত নিয়ে থামতে বললেন। বলখে পৌঁছার পর তার সামনে ছিলো বিশাল বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী মরুময় অঞ্চল। মরুময় বিজন এলাকার যাত্রাপথের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য সুলতান পূর্ব থেকেই বিজন এলাকা দিয়ে প্রবাহিত তুরমুজ নামক স্থানে নদীর তীরে বিশ হাজার বড় নৌকা তৈরী করিয়ে রেখেছিলেন। অকসাস নামক এই নদীর প্রবাহ ছিলো খাওয়ারিজমের দিকে।

সুলতানের গোটা বাহিনী তাদের হাতি, ঘোড়া, উট, সৈন্য তথা আসবাবপত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামসহ বিশ হাজার জাহাজবাহী নৌকায় বোঝাই করা হলো।

নদীর ভাটির প্রবাহের সাথে বিশাল এই নৌকা বহর এগিয়ে চলল। এই নদীর ইতিহাসে এটিই ছিল কোন রাজশক্তির সবচেয়ে বড় সেনাভিযান ও নৌমহড়া।

সুলতানের এই নৌবহর হাজারাশীপ উপকূল অতিক্রম করে খাওয়ারিজমের রাজধানী জুরজানিয়ার অদূরে গিয়ে যাত্রাবিরতি করলো। সৈন্যরা নৌবহর থেকে নেমে ডাঙায় শিবির স্থাপন করলো।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, দখলদার আলাফতোগীনের কাছে সুলতান মাহমূদের বিশাল নৌবহর ও সেনাসমাবেশের খবর গেলো। তখন অনাক্রমণ চুক্তি করার জন্য একজন দূতকে দিয়ে সুলতান মাহমূদের কাছে পয়গাম পাঠালো।

কিন্তু ক্ষুব্ধ সুলতান আলাফতোগীনের সন্ধিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। সেই সাথে তিনি এমন কিছু কঠিন শর্তের উল্লেখ করে সন্ধিপ্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন, যার ফলে আলাফতোগীন ঘাবড়ে গেলো। অগত্যায় মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য আলাফতোগীন গোটা খাওয়ারিজমের সৈন্যদের এক জায়গায় জড়ো করে দেখে তাদের সংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ হাজার।

দখলদার আলাফতোগীন সেনাবাহিনীর সবচেয় যোগ্য ও অভিজ্ঞ পাঁচ-ছয়জন সেনাপতিকে হত্যা করিয়েছিলো শুধু আবুল হারেস ও আবুল আব্বাসের প্রতি আনুগত্যের অপরাধে। তাছাড়া সেনাবাহিনীর বহু তেজস্বী কমান্ডারকেও বিদ্রোহের আশঙ্কায় আলাফতোগীন হয় অন্তরীণ, নয়তো হত্যা করিয়ে ফেলেছিলো। ফলে খাওয়ারিজম বাহিনীতে সুলতানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো যোগ্য সেনাপতি ও কমান্ডারের অভাব দেখা দেয়। সার্বিক অবস্থা আন্দাজ করতে পেরে আলাফতোগীন প্রমাদ গুণতে শুরু করে।

কিন্তু পরাজয়ের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে- এটা বোঝার পর আলাফতোগীনের অনুসারীরা মরিয়া হয়ে মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হয়। যুদ্ধের প্রথম দিকের মোকাবেলা সুলতানের চড়া মূল্য দিতে হয়।

সুলতানের অগ্রবর্তী বাহিনী সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আলতাঈর নেতৃত্বে মূলশিবির থেকে অনেকটাই সামনে অবস্থান নিয়েছিলো।

আলতাঈর সৈন্যরা যখন ফজরের নামাযের জামাতে শরীক হলো এবং সকল সৈন্য একসাথে জামাতে নামায আদায় করছিলো, তখন আলাফতোগীনের সহযোগী সেনাপতি খমরতাশ তার গোটা বাহিনী নিয়ে আলতাঈ সহযোদ্ধাদের উপর হামলে পড়ে।

আলতাঈ ছিলেন ইতিহাসখ্যাত সেনাপতি। জীবনে অসংখ্যবার চরম দূরাবস্থার মধ্যেও তিনি পরাজয়কে জয়ে পরিণত করেছিলেন। কৌশলী ও অভিজ্ঞ সমরনায়ক হিসেবে ইতিহাস তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। যার নাম

সুলতান মাহমূদের সমপর্যায়ে উচ্চারিত হয়। সেদিন তিনি তার শিবিরে সকল যোদ্ধাদের নিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্তেই ফজরের নামায আদায় করছিলেন।

শত্রুবাহিনী হয়তো জানতো, সুলতানের সৈন্যরা রণাঙ্গনেও জামাতে নামায আদায় করে থাকে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য মদখোর খমরতাশ তার দলবল নিয়ে পূর্ব থেকে অদূরে অবস্থান নিয়েছিলো।

যেই দেখলো, আলতাঈর তামাম সৈন্য নামায পড়ছে, ঠিক তখন এক সাথে হাজার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে খমরতাশ নামাযরত সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সুলতানের এই সৈন্যরা ছিলো একেবারেই অপ্রস্তুত। তাদের কারো পক্ষেই প্রতিরোধ করা সম্ভব হলো না। ফলে সুলতানের নির্বাচিত চৌকস সৈন্যদের বিরাট অংশ নিহত হলো। সেনাপতি আলতাঈ মুষ্টিমেয় কয়েকজন কমান্ডার ও সহযোদ্ধা নিয়ে কোনমতে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হলেন।

সুলতান মাহমূদ এই অযাচিত অতর্কিত আক্রমণ ও হতাহতের খবর শুনে তার রিজার্ভ বাহিনীকে খমরতাশের বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। এরা অগ্রসর হয়ে জানতে পারলো, খমরতাশ আলতাঈর সহযোদ্ধাদের কচুকাটা করে চলে গেছে।

সুলতানের এই রিজার্ভ বাহিনী ছিলো তার একান্ত নিরাপত্তা ইউনিট। এই ইউনিটের প্রতিজন সদস্য যেমন ছিলো ভিন্নতর শক্তির অধিকারী, তেমনি তাদের সওয়ারীগুলোও ছিল অন্য সওয়ারীর চেয়ে তেজস্বী। এরা অগ্রসর হয়ে যখন দেখল, খমরতাশ আলতাঈর বাহিনীকে তছনছ করে চলে গেছে, তখন তারা ওদের পিছু ধাওয়া করলো। খমরতাশের সৈন্যরা তখনো খুব বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। আকস্মিক আক্রমণের অস্বাভাবিক সাফল্যের পর তাদের মনোবল দারুণ বেড়ে গিয়েছিল এবং অভিযান শেষে অনেকটা আয়েশে কিছু পথ অগ্রসর হয়ে খমরতাশের সৈন্যরা আরাম করার জন্য যাত্রাবিরতি করল।

এই এলাকাটি ছিল মরুময়। হঠাৎ পশ্চাৎদিকে ধূলি উড়ার আলামত দেখতে পেল খমরতাশ। সে বুঝে গেল সুলতানের বাহিনী হামলার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। খমরতাশ তার সৈন্যদেরকে জবাবী আক্রমণে প্রতিহতের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিল। প্রতিপক্ষ বাহিনীকে খমরতাশের সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়ে তৈরী হয়ে গেল।

সুলতানের সৈন্যরা খমরতাশের বাহিনীকে ঘেরাও করার চেষ্টা করলো আর খমরতাশের সৈন্যরা ঘেরাও ভাঙার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলো। কিন্তু সুলতানের এই বাহিনীর ঘেরাও থেকে বের হওয়া খমরতাশের সৈন্যদের পক্ষে সম্ভব হলো না।

চলন্ত ও দূরন্ত সুলতানের এই সৈন্যদের সংখ্যা নিরূপণ করা খমরতাশের পক্ষে সম্ভব হলো না। খমরতাশের সৈন্যরা ঘেরাও থেকে বের হওয়ার জন্য দৌড়-ঝাঁপ পাড়ছিলো আর সুলতানের বাহিনীর হাতে ঘায়েল হচ্ছিল। পলায়নপর সৈন্যদের সাথে গযনী বাহিনীর মোকাবেলা বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। অল্প সময়ের মধ্যে সকল শত্রু সৈন্যকে ঘায়েল করে খোদ খমরতাশকে পাকড়াও করে ফেললো সুলতানের সৈন্যরা। মুখোমুখী সংঘর্ষে খুবই করুণ পরিণতি বরণ করতে হলো খমরতাশের। গ্রেফতার হয়ে সে সুলতানের দরবারে নীত হলো।

* * *

রাতের বেলা সুলতান মাহমূদ সৈন্যদেরকে নতুনভাবে বিন্যাস করলেন। সৈন্যদের এক অংশকে নদীর তীরে মোতায়েন করে তাদেরকে নির্দেশের অপেক্ষায় রাখলেন। তিনি তাদের বললেন, নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে তোমরা নৌবহর নিয়ে রাজধানী জুরজানিয়ার নিকটবর্তী গিয়ে শিবির স্থাপন করো।

পরদিন সুলতান মাহমূদ কোন তৎপরতা না চালিয়ে নিষ্ক্রিয় রইলেন। তিনি শত্রুবাহিনীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, এখনই আক্রমণের জন্য তিনি প্রস্তুত নন।

আলাফতোগীন কোন বিশেষজ্ঞ সমরবিশারদ ছিল না। তার অন্যতম সেনাপতি খমরতাশ ছিল বন্দী। সেনাপতি আবু ইসহাককে আলাফতোগীন নদী তীরের কোন এক জায়গায় রিজার্ভ রেখেছিল। তাছাড়া সে গুরুত্বপূর্ণ ও অভিজ্ঞ সেনাপতিদের হত্যা করিয়ে ফেলেছিল।

আলাফতোগীন সুলতানের রণকৌশল বুঝতে সক্ষম হলো না। তাছাড়া সুলতানের সেনাবিন্যাস সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। সুলতানের সেনাবিন্যাসের কোন খোঁজখবর না নিয়েই নিজেকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান এবং

সুলতানের বাহিনী অপ্রস্তুত রয়েছে ভেবে আক্রমণ করে বসে। এই আক্রমণ ছিল ৪০৮ হিজরীর সফর মোতাবেক ১০১৭ সালের ৩ জুলাই।

'আছারুল উজারা' নামক ইতিহাস গ্রন্থে 'আলফজলী' এই যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনায় লিখেছেন, এই আক্রমণে আলাফতোগীন নিজে নেতৃত্ব দিয়েছিল। সে ছিল তার সেনাবাহিনীর সবচেয়ে সামনে। সে ডান বাম কোন দিকে খেয়াল না করেই আক্রমণ করে বসে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এই আক্রমণে আলাফতোগীনের সাধারণ যোদ্ধারা সাহসিকতার সাথে লড়াই করে। তারা গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে নানা শ্লোগান দিচ্ছিল এবং গযনী বাহিনীকে আল্লাহ্র প্রিয় দুই বুযুর্গের হন্তারক বলেও শ্লোগান দিচ্ছিল। তাদের হৃদয়ে খুবই সূক্ষ্মভাবে গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণা জন্মাতে সক্ষম হয়েছিল।

এই ঘৃণা ও ক্ষোভ শক্তিতে পরিণত হলো। শুধু বীরত্ব ক্ষোভ ও খুনের নেশায় যদি সামরিক লড়াইয়ে বিজয়ী হওয়া যেতো, তবে এই বিজয় পাওনা ছিলো আলাফতোগীনের। কিন্তু অপরিমেয় ক্ষোভ থাকার পরও নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখে সমরকৌশলে বিজয় নিশ্চিত করেছিলেন সুলতান। তাঁর রণকৌশল ছিল দূরদর্শী এবং সময়োচিত।

সুলতান মাহমূদ যুদ্ধের শুরুতে ঘোড়া থেকে নেমে দু'রাকাত নামায পড়লেন এবং নামায শেষে আলাফতোগীনের ডান বাহুতে হস্তিবাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন।

আলাফতোগীনের সৈন্যরা তখনো হস্তিবাহিনীর কোন সদস্যকে দেখেনি। হঠাৎ তাদের ডান বাহুকে হস্তিবাহিনী আক্রমণ করলো। জঙ্গী হাতিগুলো এগিয়ে আসার সাথে সাথে বিকট চিৎকার করছিল। হাতির চিৎকারে আকাশও যেনো কেঁপে উঠছিল।

খাওয়ারিজমের সৈন্যরা কখনো হস্তিবাহিনীর মোকাবেলা করেনি। বিশালদেহী জঙ্গি হাতির দানবীয় চিৎকার ও দৈত্যের মতো এগিয়ে আসার ভাব দেখেই আলাফতোগীনের সৈন্যরা ভড়কে গেল। তারা জানতো না হাতি দেখতে যদিও ভয়ানক; কিন্তু এদের দুর্বলতাও প্রকট।

সুলতান হস্তিবাহিনীর ডানে বামে পদাতিক সৈন্য এবং পেছনে অশ্বারোহী সৈন্যদের নিযুক্ত করলেন।

জঙ্গি হাতিগুলো যখন শত্রুসেনাদের দিকে দৌড়ে এগুচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল জমিন দুলছে। আলাফতোগীন তার সেনাদের উজ্জীবিত করার সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করলো। কিন্তু সৈন্যরা হাতির ভয়ানক চিৎকার ও কাণ্ডকারখানা দেখে ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ল।

হস্তিবাহিনীর দুটি হাতি শত্রুযোদ্ধাদের মধ্যভাগে চলে গেল। মধ্যভাগে অবস্থান করছিল সেনানায়ক আলাফতোগীন। আলাফতোগীনের মধ্যভাগের যোদ্ধারা বীরবিক্রমে মোকাবেলা করলো কিন্তু এক পর্যায়ে আলাফতোগীনের দেহরক্ষী বাহিনীর মধ্যে ভাঙন দেখা দিল।

দিন শেষে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধের অবসান হয়ে গেল। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ভেবে আলাফতোগীন পালিয়ে গেল; কিন্তু রণাঙ্গন থেকে তার পক্ষে নিষ্ক্রান্ত হওয়া সম্ভব হলো না। সুলতানের সৈন্যরা তাকে ঘেরাও করে পাকড়াও করে ফেলল।

* * *

জুরজানিয়া ছিল রাজধানী। বিদ্রোহী খলনায়ক আলাফতোগীন গ্রেফতার ও পরাজিত হলেও বিজয়কে অর্থবহ করার জন্য সুলতানের প্রয়োজন ছিল রাজধানী কব্জা করা।

নদীর তীরে অপেক্ষমাণ সৈন্যদেরকে তিনি নৌবহরে রাজধানী জুরজানিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সুলতানের সৈন্যরা প্রায় চারহাজার নৌকায় আরোহণ করে রাজধানীর দিকে রওনা হলো।

সুলতানের নৌবহর জুরজানিয়ার নিকটবর্তী হলে তারা দেখতে পেলো তাদের সম্মুখ দিক থেকে অন্তত ত্রিশহাজার সৈন্যের বিশাল এক নৌবহর এগিয়ে আসছে।

তখন ভোরের সূর্য পূর্বাকাশে উঁকি দিচ্ছে। ত্রিশ হাজার নৌকার আরোহীর এই বিশাল নৌবহর ছিল আলাফতোগীনের সহযোগী সেনাপতি আবু ইসহাকের নেতৃত্বে। আলাফতোগীন এই সৈন্যদের রিজার্ভ রেখেছিল। সুযোগমতো সে এদের তলব করতো। কিন্তু এদের তলব করার আর সুযোগ হয়নি। এর আগেই আলাফতোগীন সুলতানের সেনাদের হাতে ধরা পড়ে এবং তার বাহিনী শোচনীয় পরাজয়ের মুখোমুখী হয়।

সেনাপতি আবু ইসহাক খবর পেয়েছিল, সুলতানের একদল সৈন্য নদীতীরে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে। সে বুঝতে পারলো, এদের পথ ও গন্তব্য রাজধানী জুরজানিয়া। আবু ইসহাক ভাবলো, জুরজানিয়ার সাধারণ লোক তাদের বিদ্রোহে ক্ষুব্ধ।

এমতাবস্থায় প্রতিপক্ষের জুরজানিয়া আক্রমণ করলে স্থানীয় সৈন্যদের মধ্যে ভাঙন দেখা দিতে পারে। তাছাড়া রাজধানীতে অনেকের পক্ষে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে। এরচেয়ে বরং সকল সৈন্য নিয়ে রাজধানীর বাইরেই শত্রুবাহিনীর মোকাবেলা করা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। যেই চিন্তা সেই কাজ। সেনাপতি আবু ইসহাক ত্রিশহাজার নৌকায় তার অনুগত সৈন্যদের সওয়ার করে মোকাবেলার জন্য এগিয়ে এলো।

সুলতানের নৌবহর অগ্রসর হয়ে বুঝতে পারলো, শত্রুবাহিনী নৌযুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। বস্তুত উভয় নৌবহর মুখোমুখি হতেই নৌযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধের ধরন ছিলো অনেকটা মল্লযুদ্ধের মতো।

একটি নৌকা অপর নৌকার মুখোমুখি হলে শত্রুসেনাদের উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষ লাফ দিয়ে শত্রু নৌকায় গিয়ে মল্ল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছিল। নৌকা পরস্পর টক্কর দিচ্ছিল আর যোদ্ধারা একে অন্যের উপর আঘাত হানতে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। আর আহত ও নিহত যোদ্ধাদের তাজা রক্তে লাল হচ্ছিল নদীর পানি।

এক সংবাদবাহক এসে সুলতান মাহমূদকে খবর দিলো, জুরজানিয়ায় গযনী সৈন্যদের সাথে আলাফতোগীনের একাংশের নৌযুদ্ধ চলছে। খবর শোনামাত্রই সুলতান অশ্বারোহী বাহিনী এবং উষ্ট্রারোহী ইউনিটকে নৌসেনাদের সহযোগিতার জন্য অভিযানের নির্দেশ দিয়ে নিজেও অশ্বপৃষ্ঠে রওনা হলেন। এই সৈন্যরা যখন অকুস্থলে পৌছলো, তখন যুদ্ধ প্রায় স্তিমিত হয়ে এসেছে এবং নদীর মধ্যে উভয় সেনাদের মাল্লাবিহীন নৌকা পরস্পর টোকাটুকি করছে।

উষ্ট্রারোহী সৈন্যরা নদীর তীর থেকে শত্রুসেনাদের নৌকা চিহ্নিত করে শত্রুদের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। কোন কোন অশ্বারোহী তো এমন বীরত্ব প্রদর্শন করলো যে, ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দিলো, কিন্তু পানির পরিমাণ বেশী ও নদীতে স্রোত থাকার কারণে তারা তেমন সুবিধা করতে পারলো না।

সুলতান মাহমূদ নদীতীরে পৌঁছে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়া সকল অশ্বারোহীকে তীরে নিয়ে এলেন।

এদিকে সুলতান মাহমূদের বাহিনীর সাথে দখলদার আলাফতোগীন বাহিনীর যুদ্ধ এবং আলাফতোগীনের গ্রেফতারীর খবর শুনে রাজধানী জুরজানিয়ার সাধারণ অধিবাসীরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। এ সম্পর্কে তৎকালীন ঐতিহাসিক ইসকান্দারয়র লিখেছেন, 'রাজধানী জুরজানিয়ার মানুষ আলাফতোগীনের বারো মাসের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো।

জুরজানিয়ায় আইনের শাসন বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। ন্যায়নিষ্ঠা ও ইনসাফের নামগন্ধও ছিলো না আলাফতোগীনের সেনাশাসনে। প্রত্যেক নাগরিকের ঘাড়ের উপর গ্রেফতারীর খড়্গ সব সময় ঝুলন্ত থাকতো। সাধারণ সৈনিকের কথাও তখন রাজকীয় ফরমানের মর্যাদা পেয়েছিল।

নির্যাতিত-নিপীড়িত জুরজানিয়ার সাধারণ লোকজন যখন জানতে পারলো, খমরতাশ ও আলাফতোগীন গযনী বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছে এবং এখন আবু ইসহাকের অনুগত সৈন্যদের সাথে নদীতে গযনী সেনাদের যুদ্ধ চলছে।

এ খবর শোনার সাথে সাথে গযনীর আবাল-বৃদ্ধ হাতের নাগালে তরবারী-বল্লম-নেজা-দা-বটি-লাঠি যাই পেয়েছে নিয়ে নদীর তীরের দিকে দৌড়াতে শুরু করে দিলো এবং পথিমধ্যে নগররক্ষায় যেসব সৈন্য সামনে পেলো, তাদের উপর হামলে পড়লো।

দিনব্যাপী চললো এই নৌযুদ্ধ। সূর্য ডোবার কিছুক্ষণ আগে শহরের লোকেরা যখন গযনী সেনাদের সাহায্যের জন্য বেরিয়ে এলো এ খবর শোনামাত্র তীরে দাঁড়িয়ে নির্দেশদাতা সেনাপতি আবু ইসহাক পালোনোর উদ্যোগ নিল।

কিন্তু তার পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। পলায়নপর আবু ইসহাককে পাকড়াও করে তার সেনাবাহিনীর লোকেরাই গযনী বাহিনীর হাতে সোপর্দ করলো। আর সাধারণ লোকজন গিয়ে গযনী সেনাদের সহযোগিতা করতে শুরু করলো। তারা খাওয়ারিজম বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণেও কুণ্ঠাবোধ করলো না।

ঐতিহাসিক বায়হাকী ও ইবনে ইস্কান্দার লিখেছেন, দখলদারদের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন সুলতান মাহমূদ। ক্ষুব্ধ সুলতান নদীর তীরব্যাপী উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া

ছুটিয়ে তীরন্দাজদের আরো বেশী করে সঠিক নিশানায় তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। রাগে-ক্ষোভে তার মুখ থেকে ফেনা বেরিয়ে আসছিলো।

দিনের শেষে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও রাতভর চললো শত্রুসেনাদের গ্রেফতারী এবং গযনীর আহত ও নিহত সেনাদের একত্রিত করার কাজ। আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছিল।

রাতের বেলায়ই শহরের শীর্ষ কর্মকর্তা এবং গণমান্য লোকেরা এসে সুলতানের কাছে ওইসব অপরাধীদের পাত্তা জানিয়ে দিচ্ছিল যারা কোন না কোনভাবে আলাফতোগীনের বিদ্রোহের সাথে জড়িত ছিলো এবং আবুল আব্বাসকে হত্যার পেছনেও যাদের হাত ছিলো।

সেই রাত্রেই ওইসব চিহ্নিত অপরাধীদের পাকড়াও অভিযান শুরু হয়ে গেল।

* * *

পরদিন প্রথম প্রহরে দখলদার খলনায়ক আলাফতোগীন, সেনাপতি আবু ইসহাক ও সেনাপতি খমরতাশকে সুলতানের সামনে পেশ করা হলো। তৎকালীন ঐতিহাসিক বায়হাকী, উতবী এবং গরদীজী লিখেছেন, সুলতান মাহমূদকে ইতোপূর্বে এমন ক্ষুব্ধ অবস্থায় কখনো দেখা যায়নি।

ধৃত বিদ্রোহীদের নায়কদের তিনি যে শাস্তি দিলেন, তাতে হয় তো তার অন্তরাত্মাও কেঁপে উঠেছিলো। সুলতান মাহমূদকে কোন অবস্থাতেই অত্যাচারী বলার সুযোগ নেই। কিন্তু এদের অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে তিনি হয়তো নিজের ক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি।

হে জালেমের দল! তোমরা শুধু আবুল আব্বাসের হন্তা-ই নও। ক্ষুব্ধকণ্ঠে ধৃতদের উদ্দেশ্যে বললেন সুলতান। ক্ষুব্ধ সুলতান যখন কথা বলছিলেন, তার মুখ থেকে রাগে-ক্ষোভে থুতু বেরিয়ে আসছিলো। তার সারা শরীর ক্ষোভে থরথর করে কাঁপছিলো। তিনি ক্ষুব্ধকণ্ঠে আবারো বললেন–

এই দুই মুসলিম দেশের হাজারো নিরপরাধ সেনার জীবনহানির অপরাধে তোমরাও অপরাধী। তোমাদের ক্ষমতালিপ্সা আর বেঈমানীর কারণে এতোগুলো মানুষের জীবনহানী ঘটেছে। তোমাদের অনুগত সৈন্যদের

প্রাণহানির হিসেব করে দেখো, এরা না তোমাদের সৈন্য ছিলো, না আমার সৈন্য ছিলো। এরা ছিলো ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী সৈনিক। এরা ছিলো আল্লাহর সিপাহী। তোমরা ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত করতে এদের হত্যা করিয়েছো।

ক্ষুব্ধ সুলতান রাগে-ক্ষোভে বসা থেকে দাঁড়িয়ে বললেন, ওহে নিমকহারামের দল! তোমরা ওই খুন দেখোনি, যে খুন মরুর মাটি শুষে নিয়েছে। সেই রক্ত দেখোনি, যে রক্ত নদীর পানিতে ভেসে গেছে। তোমরা দেখোনি তোমাদের কারণে ময়দানে ক্ষতবিক্ষত যেসব সৈনিক তড়ফাতে তড়ফাতে মৃত্যুবরণ করেছে।

হে বিদেশী ফিরিঙ্গীদের পা-চাটা গোলামের দল! হে সত্যের ঝাণ্ডাবাহী সৈনিকের ঘাতক, হে ধোঁকাবাজ প্রতারক গোষ্ঠী! তোমরা হাতে পবিত্র কুরআন নিয়ে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়েছো। হে ভণ্ডের দল! নিজেদের সাচ্চা মুসলমান দাবী করে তোমরা সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকা দিয়েছো। তোমরা মহাপরাক্রম আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছিলে। ভুলে গিয়েছিলে মহান আল্লাহ্ কখনো মজলুমের ফরিয়াদ ফিরিয়ে দেন না।

হে হতভাগার দল! নিজেদের স্বকীয়তা ইহুদী-নাসারাদের হাতে বিকিয়ে দিয়ে তোমরা গোটা জাতির ভাগ্যকে বেঈমানদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলে। তোমাদের জ্ঞানবোধ ফিরিঙ্গী বেশ্যদের হাতে তুলে দিয়ে শুরার মাতলামীতে হারিয়ে গিয়েছিলে। তোমাদের দিল-দেমাগে ক্ষমতা ও মসনদের মোহ্ আসন গেড়ে বসেছিলে।

তোমরা ঈমান বিক্রি করে দিয়েছিলে? হে ঈমান বিক্রেতা বেঈমানেরা! আমি মূর্তি হন্তারক আর তোমরা সেই মূর্তির জীবন্ত প্রতীক! হিন্দুস্তানের মূর্তিগুলোকে আমি যেভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো করেছি, তোমাদেরকেও আমি সেভাবেই টুকরো টুকরো করে ফেলবো। হিন্দুদের মাটি-পাথরের দেবতাগুলোকে আমি যেভাবে ঘোড়ার পায়ে পিষেছি, তোমাদেরকেও সেভাবে পিষে ফেলবো।

হে বেঈমান নিমকহারামের দল! রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তোমাদের বিপুল অংকের ভাতা দেয়া হতো এইজন্য যে, তোমরা জনগণের সেবা করবে, নিজ দেশ ও দেশের মানুষের ঈমান-ইজ্জতের হেফাযত করবে, ইসলামের বিরুদ্ধে দুশমনদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাত করবে, ইসলামের হেফাযতের জন্য নিজের

জীবন বিলিয়ে দেবে। কিন্তু কর্তব্য ভুলে গিয়ে তোমরা নিজ দেশকেই দখল করেছো। ধর্মের দোহাই দিয়ে জাতির জীবন-সম্ভ্রম বিকিয়ে দিয়েছো। গণমানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছো, মানুষের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিয়েছো।

হে বেঈমানেরা, আমি যদি তোমাদের উচিত শিক্ষা না দিই, হাজারো মজলুমের বিদেহী আত্মা আমাকে অভিশাপ দেবে।' যাও এদেরকে ময়দানে নিয়ে চাবুক লাগাও।'

শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই ধৃত দেশদ্রোহীদের শাস্তি দেখার জন্য সেখানে ভিড় জমাল। গোটা ময়দান লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। আলাফতোগীন, আবু ইসহাক, খমরতাশ ও তাদের সহযোগীদের হাজারো জনতার বেষ্টনীর মধ্যে ময়দানের মাঝখানে নিয়ে সুলতানের কমান্ডোরা চাবুক দিয়ে পেটাতে শুরু করলে হাজারো মজলুমের হর্ষধ্বনিতে গোটা এলাকা কেঁপে উঠলো।

বিদ্রোহীদের চার চারজন করে ভাগ করে চাবুক লাগানোর পর তাদের সবাইকে একটি চৌবাচ্চায় দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো আর রাজধানীর লোকদের বলা হলো, তারা যেনো দল বেঁধে এদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে এবং ভর্ৎসনাস্বরূপ এদের উপর থুতু ছিটিয়ে দেয়। লোকজন এদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় কেউ কেউ তাদের উপর ঢিল নিক্ষেপ করল এবং কেউ কেউ পাথর ছুঁড়ে মারলো। অনেকেই তাদের গালি-গালাজ করে একপাশে দাঁড়ালো।

এরপর সুলতান মাহমূদ এমন নির্দেশ দিলেন, তাতে গোটা ময়দানে পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, সুলতান এমন কঠোর নির্দেশ দিতে পারেন!

সুলতান মাহমূদ এরপর নির্দেশ দিলেন, এদের প্রত্যেকের কাঁধ বরাবর বাজুসমেত হাত কেটে দাও। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই সুলতানের কমান্ডোরা তরবারী নিয়ে দৌড়ে এলে অপরাধীরা এদিক সেদিক দৌড়াতে চেষ্টা করলো এবং চিৎকার করে করে সুলতানের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলো। কিন্তু সুলতানের মনে তখনও ছেয়ে ছিলো নিরপরাধ সেইসব সিপাহীদের মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য, যারা এদের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে।

তাতে সুলতান ক্ষান্ত হলেন না। তিনি আগেই পনেরোটি জঙ্গীহাতি একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। এবার তিনি নির্দেশ দিলেন, জঙ্গী হাতিগুলোকে এদের পিষে মারার জন্য ছেড়ে দাও।

প্রতিটি হাতিকেই পরিচালনা করছিলো একেকজন মাহুত। তারা হাতিকে দৌড়ালো। অপরাধীদের সবার পায়ে ছিল ডাণ্ডাবেড়ী। ওরা এদিক সেদিক সরে যাওয়ার চেষ্টা করল বটে; কিন্তু মাহুতরা হাতিগুলোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওদের সবাইকে পিষে ফেললো।

এরপর এদের নিষ্পিষ্ট মৃতদেহগুলো গলায় রশি বেঁধে আবুল আব্বাসের কবরের পাশে নিয়ে যাওয়া হলো। আবু আব্বাসের কবরের পাশে আগেই কাঠের খুঁটি পুঁতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন সুলতান। দণ্ডিত দেশদ্রোহী হন্তারকদের মৃতদেহগুলোকে তিনি আবুল আব্বাসের কবরের পার্শ্ববর্তী কাঠের খুঁটিতে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

এদিকে শহরে সুলতানের ধরপাকড় আরো কয়েক দিন অব্যাহত থাকল। অভিযুক্তদের পাকড়াওয়ের পর অভিযোগ প্রমাণিত হলে একই শাস্তি দেয়া হলো। টানা কয়েকদিন ধরপাকড় করার পর সুলতান এই অভিযান বন্ধের নির্দেশ দিলেন।

সুলতান মাহমূদ সেনাপতি আলতানতাশকে খাওয়ারিজমের শাসক ঘোষণা করলেন এবং আরসালান জাযেবকে শাসকের সহকারী নিযুক্ত করলেন এবং খাওয়ারিজমকে গযনী সালতানাতের অধীন করে নিলেন। সেনাধ্যক্ষ আলতানতাশ ও তার ডেপুটি আরসালান জাযেব গোয়েন্দা তৎপরতা ও গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে খুবই দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছিলেন।

বর্তমান যুগে গোয়েন্দা বিভাগ বলতে যা বোঝায়, সুলতান মাহমূদের এ বিভাগ ছিল এরই পুরাতন রূপ। এ বিভাগের কর্মীদের মুশরেফ বলা হতো। শত্রু দেশে সে দেশেরই যেসব নাগরিককে গোয়েন্দা চর বানানো হতো, তাদেরকেও মুশরেফ নামে ডাকা হতো। ঐতিহাসিক বায়হাকী লিখেছেন, মুশরেফদেরকে সুলতান মাহমূদ মোটা অংকের ভাতা, উচ্চ প্রযুক্তি এবং আকর্ষণীয় পুরস্কার ও উপঢৌকন দিতেন। তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে তিনি ভিন্নভাবে ভাতা দিতেন। বায়হাকী লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ এমন দূরদর্শী ও বিচক্ষণ লোকদের গোয়েন্দা এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করতেন যে, তারা

শত্রুদেশে সেই দেশের শাসকগোষ্ঠী ও রাজা-বাদশাহর শ্বাস-প্রশ্বাসের খবরও বলে দিতে পারতো।

আলতানতাশ ও আরসালান জাযেব প্রাথমিক পর্যায়ে গযনী থেকে কয়েকজন গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে নিয়ে এলেন। এরপর এরাই স্থানীয়দের থেকে লোক নির্বাচন করে গোটা খাওয়ারিজমব্যাপী তাদের গোয়েন্দাজাল বিছিয়ে দিলো।

দূরদর্শী, অতিসতর্ক, তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন লোকদের ব্যবহার করে ইহুদী ও খৃস্টান কুচক্রীরা যেসব চক্রান্তের জাল বিস্তার করে রেখেছিল, অস্বাভাবিক কম সময়ের মধ্যে সকল দুষ্কৃতকারীকে চিহ্নিত করলেন আলতানতাশ ও আরসালান জাযেব। তারা মূল চক্রান্তকারী ও কুচক্রীদের স্থানীয় সহযোগীদের চক্রান্তের হোতাদের মতোই শাস্তি দিলেন।

শহর-বন্দর-গ্রাম-গঞ্জে বসবাসকারী সকল লোকদের আস্থা ফিরিয়ে আনা হলো। তাদেরকে সকল সামরিক শাসনতান্ত্রিক অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করা হলো এবং তাদের জীবন-সম্পদ ও ইজ্জত আব্রুর হেফাযতের দায়িত্ব সরকারের কাঁধে তুলে দেয়া হলো। ফলে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ফিরে এলো আস্থা ও বিশ্বাস।

খাওয়ারিজমের শাসনব্যবস্থা পুনর্বহালের পর সুলতান যখন গযনী ফিরে আসছিলেন, তখন যেখানে গযনী ও খাওয়ারিজম বাহিনীর প্রথম মোকাবেলা হয়েছিল। সেখানে এসে তিনি থেমে গেলেন।

জায়গাটিতে তখনো শিয়াল-শকুন এবং লাওয়ারিশ কুকুর মৃতদের হাড়-গোড় তালাশ করছিল। সুলতান মাহমূদ তার ঘোড়া থামিয়ে ফাতেহা পড়ে নিহত সৈন্যদের জন্য দুআ শুরু করলেন।

দীর্ঘক্ষণ পর তিনি যখন হাত নামিয়ে আনলেন, তখন তার চোখের পানিতে বুক ভেসে যাচ্ছিল এবং কণ্ঠ দিয়ে হেঁচকি দিয়ে কান্নার আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল। বস্তুত 'বেঈমান কাফেরদের জন্য অত্যন্ত কঠোর আর ঈমানদার স্বজাতির জন্য অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী' সেই ঐতিহাসিক শাশ্বত বাণীর বাস্তব নমুনা ছিলেন সুলতান মাহমূদ।

গযনীর তুফান

দিল্লী থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় দু'শ মাইল দূরে গঙ্গা নদীর তীরবর্তী একটি শহরের নাম কন্নৌজ। সুলতান মাহমূদের শাসনামলে কন্নৌজ ছিল একটি শক্তিশালী হিন্দুরাজ্যের রাজধানী। ওখানকার মহারাজা ছিল রাজ্যপাল। উত্তর হিন্দুস্তানে কন্নৌজের রাজকুমারদের অনেক কদর ছিল।

দিল্লী থেকে আশি মাইল দূরে যমুনা নদীর তীরবর্তী মাথুরা ছিল হিন্দুদের একটি মহাতীর্থস্থান। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্ব থেকে মাথুরা হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান। হিন্দুদের কৃষ্ণ মহারাজ নাকি মাথুরাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজো পর্যন্ত মাথুরায় প্রতিবছর হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর সমাবেশ ঘটে। তীর্থযাত্রীরা ওখানে গিয়ে পূজা-অর্চনা করে তাদের ভাষায় পাপের স্খলন ঘটায়।

মাথুরায় একটি কেন্দ্রীয় মন্দির ছাড়াও ছোট বড় আরো কয়েকটি মন্দির ছিল। এসব মন্দির শক্ত পাথরের গাঁথুনী দিয়ে তৈরী। এসব মন্দিরের ছিল বহু গোপন কক্ষ। এ মন্দিরের ভেতরের চোরাগলিতে হারিয়ে গেলে অজানা কারো পক্ষে বেরিয়ে আসা সহজ ব্যাপার ছিলো না।

মাথুরা শহরের চারপাশ ছিল শক্ত দেয়ালে ঘেরা। শহরের ভেতরে একটি মজবুত দুর্গ ছিল। মাথুরা কোন স্বাধীন রাজ্য ছিল না। মাথুরার নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল কন্নৌজের মহারাজা এবং পার্শ্ববর্তী মহাবন রাজ্যের রাজার উপর।

মহাবন রাজ্যের রাজার নাম ছিল কুলচন্দ্র। এরা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী আরো কয়েক রাজ্যের মহারাজারা মাথুরার নিরাপত্তা রক্ষায় তাদের কিছু সেনাসনদস্যকে এখানে নিয়োগ করেছিল।

মাথুরার নিকটবর্তী রাজ্য মহাবন ছিল একটি জঙ্গলাকীর্ণ রাজ্য। রাজধানীর নাম ছিল মহাবন। মহাবনের অবস্থান ছিল মাথুরা থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে যমুনা নদীর তীরে।

সুলতান মাহমূদের সময় এই রাজ্য ছিল খুবই শক্তিশালী ও বিত্তশালী। কিন্তু সুলতান মাহমূদ এসব রাজ্যের রাজাদের কাছে দানবের মতোই আতঙ্কে পরিণত হয়েছিলেন। সুলতান ইতোমধ্যে থানেশ্বর পর্যন্ত দখল করে সেখানে

নিজস্ব সেনা চৌকি স্থাপন করেছিলেন। পাঞ্জাবের মহারাজা ভীমপাল মুখোমুখী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সুলতানের সাথে মৈত্রীচুক্তি করেছিলেন। ছোট ছোট রাজ্যের রাজা ও রায়বাহাদুররা তো সুলতানের নাম শুনলেই ভয়ে কাঁপতো।

১০১৭ সালে সুলতান মাহমূদ যখন খাওয়ারিজমকে গযনী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন, তখন মাথুরাতে চলছিল বাৎসরিক তীর্থ উৎসব ও পুণ্যার্থী সমাবেশ। সে বছর মাথুরায় এতো বিপুল পুণ্যার্থীর সমাবেশ ঘটেছিল যে, মনে হচ্ছিল সারা ভারতের সকল হিন্দুই যেন মাথুরায় এসে জমায়েত হয়েছিল।

শহরের প্রধান মন্দির এবং যমুনা নদীর বিস্তীর্ণ তীরবর্তী এলাকায় সমবেত মানুষদের মনে হচ্ছিল যেন পিঁপড়ার চাক। পিঁপড়ার মতোই গোটা শহর এবং যমুনা তীরে লোকজন গিজ গিজ করছিল। হাজার হাজার নারী-পুরুষের পদভারে প্রকম্পিত ছিল মাথুরা নগরী।

শহরের কোন জায়গা খালি ছিল না। শহরের বাইরেও কয়েক মাইল পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের তাঁবু আর তাঁবু। দূরবর্তী এলাকা এমনকি বনবাদারের ধারে-পাশে রঙিন বাহারী তাঁবুগুলো ছিল রাজা-মহারাজাদের পরিবার-পরিজনের। কোন হিন্দু রাজা-মহারাজা এ বছরের মাথুরা গমন থেকে বিরত থাকেননি।

রাজা-মহারাজাদের তাঁবুগুলোর পাশেই ছিল তাদের নিরাপত্তাকাজে নিয়োজিত সৈন্য-সামন্তদের তাঁবু। তাদের সাথে জঙ্গী হাতি ও ঘোড়াও ছিল। রাজা-মহারাজারাও যমুনার পুণ্যস্নান এবং মাথুরার প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন।

সবচেয়ে বেশী বাহারী এবং বিশাল এলাকা জুড়ে তৈরী হয়েছিলো কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপাল এবং পাঞ্জাবের মহারাজা ভীমপালের তাঁবু। তাদের তাঁবুতে কেউ গিয়ে বলার অবকাশ ছিল না, এগুলো সাময়িক তৈরী বরং এসব তাঁবুর রাজকীয় গঠনশৈলী এবং জাঁকজমকে মনে হতো কোন রাজপ্রাসাদ। রাজকীয় তাঁবুগুলো নানা রঙের ফানুস, রেশমী কাপড়ের পর্দা ও ঝালরে সাজানো।

রাজা মহারাজাদের রাণী এবং তাদের রক্ষিতা সেবিকা দাসদাসীরাও তাদের সাথে ছিল। ছিল নাচ গান আমোদ ফূর্তির জন্য বাদক ও নর্তকী দল। কিন্তু মাথুরার প্রধান পুরোহিত ও পণ্ডিতদের হাভভাব দেখে কারো পক্ষেই নাচ

গানের মতো আমোদ ফুর্তির আসর গরম করা সম্ভব হলো না। অন্যান্য বছর কয়েক সপ্তাহব্যাপী এখানে মেলা বসতো। প্রতি রাতেই বসতো নাচগানের আসর। সাধারণ মানুষেরাও নাচ গানের আসর জমাতো।

রাজা-মহারাজাদের উদ্যোগে নাচ গানের পাল্লা হতো। কিন্তু এবারের হাজার হাজার মানুষের এই সমাবেশে কোন আনন্দ-ফুর্তির আমেজ ছিলো না। কেমন যেন উদাস উদাস ভাব, সবার মধ্যেই এক ধরনের চাপা বেদনার সুর। এক ধরনের যাতনার অভিব্যক্তি সবার চেহারায়।

তীর্থযাত্রী হিন্দুদের এই হতাশা ক্ষোভের মূল কারণ ছিলেন সুলতান মাহমূদ। সুলতান মাহমূদ ছিলেন হিন্দুদের জন্য জীবন্ত আতঙ্ক, ঘৃণা আর ত্রাসের নাম। মাথুরার প্রত্যেক পুরোহিতের কণ্ঠে ছিল এমন আওয়াজ-

"বিষ্ণুদেব আর কৃষ্ণদেবীর অভিশাপ থেকে তোমরা কেউ রেহাই পাবে না। দেবদেবীদের অপমান অপদস্থ করিয়ে তোমরা কি করে জীবন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছো? কি করে তোমরা রাতের বেলায় নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারো এবং পেটপুরে আহার করতে পারো? যে পর্যন্ত তোমরা গযনীর প্রতিটি ইট খুলে না নেবে আর মাহমুদ গযনবীর তাজা রক্ত দিয়ে কৃষ্ণমাতার পা ধুইয়ে না দেবে, ততোদিন পর্যন্ত তোমরা দেব-দেবীদের অভিশাপ থেকে রেহাই পাবে না। এখন গঙ্গাজল ও যমুনা জলও তোমাদের পাপ ধুইয়ে সাফ করতে পারবে না।"

পুরোহিতের এ ধরনের আতঙ্কজনক কথাবার্তার কারণে পূজারীরা সরাসরি কৃষ্ণমূর্তির চোখের দিকে তাকাতেও ভয় পেতো। পূজারীরা যখন মূর্তির পায়ে মাথা রেখে পূজা-অর্চনা করতো, তখন বিগলিত চিত্তে তাদের দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতো। মন্দিরের শাখাধ্বনি ও ঘণ্টাগুলোর আওয়াজও যেন উদাস হয়ে পড়েছিল। এগুলোর মধ্যে পূজারীরা অনুভব করতো এক ধরনের হতাশার সুর।

ছোট শিশু-সন্তানের মায়েরা তাদের শিশুদেরকে দেবদেবীদের অভিশাপ থেকে বাঁচানোর জন্য দেবদেবীদের পায়ে তাদের পরিধেয় অলঙ্কারাদি খুলে নজরানা দিতো। প্রত্যেকটি সামর্থবান পুরুষ পূজারী মূর্তিদের সামনে হাতজোড় করে শপথ করছিল, যে করেই হোক তারা মূর্তির অসম্মান ও দেবদেবীদের অমর্যাদার প্রতিশোধ নেবে। অনেকেই চিৎকার করে বলতো, এখন মাহমুদ হিন্দুস্তানে এলে আর তাকে ফিরে যেতে দেবো না।

কন্নৌজের রাজা রাজ্যপাল যখন পূজা করার জন্য কৃষ্ণমূর্তির সামনে গেলেন, তখন তার একান্ত নিরাপত্তারক্ষী জগন্নাথও সঙ্গে ছিল। জগন্নাথ ছিল শক্ত-সুঠাম-দীর্ঘদেহী সুদর্শন যুবক। তার চেহারা-ছবিতে যৌবনের দীপ্তি প্রস্ফুটিত ছিল। তার মুচকি হাসিতে দুর্নিবার আকর্ষণ এবং তার চাহনী ছিল জাদুময়।

জগন্নাথ ছিল আক্ষরিক অর্থেই একজন দক্ষ ক্ষণজন্মা যোদ্ধা। তরবারী চালনায় ও তীরন্দাজিতে তার পারদর্শিতা ছিল কিংবদন্তিতুল্য। কন্নৌজের মহারাজার কাছে জগন্নাথের প্রায় দু'বছর হয়ে গেছে। প্রথম দর্শনেই জগন্নাথ মহারাজার হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলো।

একবার এক জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় কন্নৌজের মহারাজা হরিণ শিকার করতে এসেছিলেন। মহারাজা একটি হরিণকে তাক করে তীর ছুঁড়লে তীর ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগেই হরিণ স্থান ত্যাগ করে। এ সময় হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হলো জগন্নাথ।

মহারাজার নিরাপত্তারক্ষীরা হরিণটিকে স্থানচ্যুত করার জন্য তাকে গালমন্দ করেই ক্ষান্ত হলো না, রীতিমতো হুমকি-ধমকিও দিলো। জগন্নাথ মুচকি হেসে মহারাজাকে বললো, আমি যদি দুরন্ত হরিণকে তীরবিদ্ধ করতে না পারি, তাহলে আপনি আমার ঘোড়া নিয়ে নেবেন এবং আমাকে পাহাড়ের উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবেন।

সবাই জানে, হরিণ যখন দৌড়াতে থাকে, তখন এতো দ্রুত ও দীর্ঘ লাফ দেয় যে, মনে হয় হরিণটি যেনো বাতাসে উড়ছে। একটি চলন্ত হরিণের একেকটি লাফের পরিধি হয় অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ গজ এবং মাটি থেকে সাত/আট হাত উপড়ে উঠে যায় হরিণ।

মহারাজা জগন্নাথের কথায় মজা করার জন্য তার নিজেরে ধনুক এবং একটি মাত্র তীর দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আবার কোন হরিণ আমাদের নজরে এলে আমরা সেটিকে তাড়িয়ে দেবো, তখন তুমি সেটি শিকার করবে। তুমি যদি এক তীরে হরিণটি শিকার করতে ব্যর্থ হও, তাহলে কিন্তু আমরা তোমার ঘোড়া ঠিকই ছিনিয়ে নেবো।

তাদের বেশী দূর যেতে হলো না। হঠাৎ এক জায়গায় সাত-আটটি হরিণ পেয়ে গেলেন তারা। মহারাজার নির্দেশে তার লোকেরা হৈ চৈ করলে হরিণ

দৌড়ে পালাতে লাগল। পলায়নপর হরিণের পেছনে জগন্নাথ ঘোড়া ছোটালো। তার পেছনে মহারাজাও ঘোড়া ছোটালেন। ছুটন্ত হরিণ যেন বাতাসে ভর করে উড়তে লাগল।

জগন্নাথ তার ঘোড়ার বাগ দাঁতে কামড়ে ধরল এবং ধনুক সামনে নিয়ে তাতে তীর ভরে নিক্ষেপ করল। একটি ছুটন্ত হরিণ মাটি স্পর্শ করে আর লাফ দিতে পারলো না। একটু উপরে লাফ দিয়েই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আর সঙ্গী হরিণগুলো দৌড়ে পালিয়ে গেল। ততক্ষণে জগন্নাথের ঘোড়াও আহত হরিণের পাশে এসে দাঁড়াল। উড়ন্ত হরিণের শিরদাঁড়ায় জগন্নাথের ছোঁড়া তীর বিদ্ধ হওয়ায় হরিণটি আর লাফ দিতে সক্ষম হলো না। অতঃপর মহারাজা রাজ্যপালও তার কাছে পৌঁছে গেলেন।

আমি বিজিরায়ের সেনাবাহিনীর একজন কমান্ডার ছিলাম মহারাজ। নিজের পরিচয় দিতে রাজ্যপালের উদ্দেশে বললো জগন্নাথ। বিজিরায় সুলতান মাহমূদের মোকাবেলায় এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করলেন যে, তার অর্ধেক সেনা মারা গেলো আর বাকী অর্ধেক মাহমুদের কাছে বন্দী হয়ে গেল। এতে আমার মন বিষাদে ভরে গেলো। আমি সেখান থেকে লাহোর চলে এলাম।

কিন্তু এখানকার সৈন্যরাও সুলতানের কাছে পরাজিত হলো। বর্তমানে লাহোরের রাজা সুলতান মাহমূদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ। আমি একজন সৈনিক। সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কমান্ডার ছিলাম।

আমি এখন কোন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন রাজার সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাই। আমি শুনেছি, কন্নৌজের রাজপুতদের আত্মমর্যাদাবোধ আছে। আজ আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্যই আমি এই জঙ্গলে প্রবেশ করেছিলাম।

মহারাজা তার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে বুঝতে পারলেন, এই সুদর্শন যুবক শুধু তীর-তরবারীতেই পারদর্শী নয়, তার মাথায় বুদ্ধিও আছে। সে যেমন মেধাবী, তেমনই দূরদর্শী। মহারাজা জগন্নাথের বুদ্ধিমত্তা ও সামরিক পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে জগন্নাথকে তার একান্ত নিরাপত্তারক্ষী দলে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

জগন্নাথ ছিলো গোড়া হিন্দুবাদী। সে মাহমুদ গযনবী ও অন্যান্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় গালমন্দ করতো এবং চরম শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে তোলার ব্যাপারে

সে ছিলো একজন তুখোড় বক্তা। বর্তমানে সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানদের যেমন একান্ত রাজনৈতিক উপদেষ্টা থাকে, জগন্নাথকেও কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপাল তার একান্ত উপদেষ্টার পদে আসীন করেছিলেন।

মহারাজা জগন্নাথের জন্য বিশেষ ধরনের চমকদার পোশাক তৈরী করালেন। মহারাজা যখন দরবারে আসীন হতেন, তখন জগন্নাথ মহারাজার পেছনে পূর্ণ রাজকীয় জাঁকজমক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, তার হাতে থাকতো স্বর্ণের প্রলেপ দেয়া বর্শা। মহারাজা যেখানে যেতেন, জগন্নাথ তার সাথে থাকতো। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, জগন্নাথ মহারাজের আভিজাত্যের অংশে পরিণত হলো।

রাজ্যপালের ছিলো তিন রাণী। রাণীদের নিরাপত্তার দায়িত্বও ছিল জগন্নাথের উপর।

কোন রাণী কোথাও গেলে জগন্নাথ ঘোড়ায় চড়ে রাণীর পিছু পিছু যেতো। রাণীমহলেও জগন্নাথ ছিলো রাজকীয় আভিজাত্যের প্রতীক।

মহরাজা রাজ্যপাল মাথুরার প্রধান মন্দিরে পূজার জন্য প্রবেশ করলেন। তার পিছু পিছু জগন্নাথও পূজামণ্ডপে প্রবেশ করল। মহারাজা মর্মর পাথরের তৈরী কৃষ্ণমূর্তির পায়ে মাথা রেখে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা করছিলেন আর শপথ করছিলেন তিনি মাহমুদ গযনবীর কর্তিত মস্তক এই মন্দিরে দেবীর পদতলে এনে রাখবেন। তখন পেছন থেকে মূর্তির প্রতি করজোড় নিবেদন করে জগন্নাথ বললো, আর আমি দেবীর শপথ করছি, যদি মাহমুদকে এখানে না আনতে পারি, তাহলে নিজের মাথা নিজেই দেবীর চরণে বলিদান করবো।

জগন্নাথের কথা শুনে চকিতে পেছন ফিরে মহারাজা জগন্নাথকে দেখলেন। জগন্নাথ দুচোখ বন্ধ করে হাতজোড় করে ভজন আওড়াচ্ছিল। এমতাবস্থায় মন্দিরের প্রধান পুরোহিত তাদের সামনে দিয়ে সুগন্ধি লোবানের তশতরীতে রাখা ধূপের পাত্র ঘুরিয়ে নিল। মহারাজা ধূপের পাত্র থেকে লোবানের ভস্ম নিয়ে কপালে লাগাল। মহারাজা গলা থেকে অত্যন্ত উচ্চে মূল্যের হারটি খুলে মূর্তির পায়ে রেখে দিলেন।

মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণের এই অচ্যুত হীরে-মোতির দরকার নেই, কৃষ্ণদেবীর প্রয়োজন তাজা টাটকা চমকানো রাঙা রক্ত। ভারতমাতা তার সুপুত্রদের কাছ

থেকে তাজা খুন প্রত্যাশা করে। ভারতমাতার সম্ভ্রমহানী ও বেইজ্জতির জন্য মহারাজাদের উচিত ছিল জগত-সংসার ত্যাগ করে বনবাসী হয়ে যাওয়া।

অবশ্যই আমরা এর প্রতিশোধ নেব। বললেন মহারাজা। মাহমুদ গযনবীর কর্তিত মস্তক এই মন্দিরের সদর দরজায় ঝুলন্ত দেখা যাবে। বললেন মহারাজা রাজ্যপাল।

* * *

দিনের বেলা মাথুরার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া গঙ্গা নদীতে তীর্থযাত্রী স্নানকারীদের এতোটাই ভিড় ছিল যে, কোথাও এক বিঘত ফাঁকও ছিলো না। ফলে মহিলাদেরকে অনেকটা দূরে গিয়ে গঙ্গাস্নানের পর্ব সারতে হতো। তীর্থযাত্রীদের মাথুরাগমন ও পূজা উদযাপনের অন্যতম একটি অংশ ছিল গঙ্গাস্নান। আজো হিন্দুদের ধর্মমতে গঙ্গা ও যমুনা নদী সকল পাপ ধুয়ে মুছে তীর্থযাত্রীদের পবিত্র করে দেয়। অনেক হিন্দু পুণ্যার্থী নাভী সমান গঙ্গাজলে নেমে পূজা-অর্চনার নানা মন্ত্র জপ করে।

এ বছরে রাজা-মহারাজাদের রাণীগণ এবং তাদের একান্ত রক্ষীতারা সাধারণ প্রজানারীদের সাথে দিনের বেলায় গঙ্গাস্নানে অংশগ্রহণকে অবমাননাকর মনে করে তারা রাতের বেলায় নিরিবিলি গঙ্গাস্নানের পর্ব সেরে নিতো।

এক সন্ধ্যায় কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপালের কনিষ্ঠা স্ত্রী চম্পাকলি মহারাজাকে বললেন, তিনি আজ সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করতে আগ্রহী। পুণ্যকাজে মহারাজা তাকে বারণ করতে পারেন না। তাই তিনি জগন্নাথকে বললেন, সে যেনো আজ রাত কিছুটা গভীর হলে ছোট রাণী চম্পাকলিকে গঙ্গাস্নানের জন্য যমুনায় নিয়ে যায়। বড় দুই রানীকে জগন্নাথ একরাত আগেই গঙ্গাস্নান করিয়ে এনেছে। বড় দুই রাণীকে নিয়ে জগন্নাথ যমুনা তীরে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। রাণীদ্বয় স্নান শেষ করে এলে তাদের নিয়ে জগন্নাথ তাঁবুতে ফিরে আসে।

চম্পা বড় দুই রাণীর সাথে যায়নি। সে যুবতী ও সুন্দরী। অপর দুই রাণী বয়স্কা। মহারাজ তাদেরও সাথে এনেছিলেন। কারণ, তারা উভয়েই ছিলেন তার সন্তানের মা। মহারাজার উপর চম্পার প্রভাব ছিল বেশী। অন্য দুই রাণী এজন্য চম্পার প্রতি ঈর্ষাকাতর ছিল।

এ ঘটনার প্রায় দু'বছর আগে কোন এক ব্যবসায়ীর উপঢৌকন হিসেবে চম্পা মহারাজার কাছে আসে। চম্পা কোন কুলীন ঘরের কন্যা ছিল না। কিন্তু বংশগতভাবে সে ছিল সুন্দরের অধিকারিণী। বংশে সৌন্দর্যের প্রতীক ছিল চম্পাকলি।

মহারাজার এক জায়গীরদারের নজর পড়েছিল চম্পার প্রতি। সে চম্পাকে পাওয়ার জন্য চম্পার বাবাকে বিপুল অর্থসম্পদ উপঢৌকন দিয়ে চম্পাকে স্ত্রী হিসেবে রাখার অঙ্গীকার করে হাতিয়ে নেয়। জায়গীরদার রীতিমতো শাদীর উৎসব আয়োজনও সম্পন্ন করে।

কিন্তু সবশেষে সে চম্পাকে কন্নৌজ নিয়ে গিয়ে মহারাজাকে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করে। মহারাজা চম্পাকে দেখে রাজপ্রাসাদে রক্ষিতা হিসেবে রাখার পরিবর্তে প্রথা অনুযায়ী চম্পাকে বিয়ে করে ফেলেন। মহারাজার বয়স তখন পঞ্চাশেরও বেশী। আর চম্পার বয়স মাত্র সতেরো-আঠারো।

অস্বাভাবিক সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী চম্পা প্রথম দিন থেকেই অর্ধবয়স্ক রাজার হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আর আগের রাণীদ্বয় প্রাসাদে পুরনো আসবাবপত্রের মতোই শুধু শোভা বর্ধনের পর্যায়ে উপনীত হলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হতেই চম্পাকলি তাদের প্রাসাদোসম রাজকীয় তাঁবু থেকে বের হলো। তার সাথে ছিল একজন একান্ত সেবিকা। জগন্নাথ চম্পার জন্য বাইরে অপেক্ষমাণ ছিল। চম্পা তাঁবু থেকে বেরিয়ে সেবিকাকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে যেতে থাকলে জগন্নাথ তাদের অনুসরণ করলো। তারা যেতে যেতে মাথুরার চারপাশে সাময়িকভাবে তৈরী হাজারো তাঁবু এলাকা পেরিয়ে গঙ্গা নদীর সেই স্থানে এসে পৌছল, যেখানে চম্পাকলির গঙ্গাস্নান করার করা।

এই জায়গাটি ছিল সাধারণ মানুষের জন্য নিষিদ্ধ। এখানটায় কোন জনমানুষের সমাগম ছিলো না। চম্পাকলি তার একান্ত সেবিকাকে বললো, তুমি ওখানে চলে যাও, যেখানে সাধারণ প্রজাদের কন্যা-জায়া-বধূরা স্নান করে। জগন্নাথ নদীর পানি থেকে কিছুটা দূরেই থেমে গেল।

সেবিকা অন্ধকারে দূরে চলে গেল। চম্পাও স্নানের উদ্দেশ্যে পানির দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু সে স্নান না সেরে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো।

"এদিকে এসো জগন! আমার সেবিকা চলে গেছে। ওকে আমি দেরী করে আসতে বলেছি।" জগন্নাথকে ডেকে বলল চম্পা।

চম্পার ডাকে জগন্নাথ তার পাশে এগিয়ে গেল। জায়গাটি ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। তদুপরি ঝোপঝাড়ে ভরা। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছিল এক শ্মশানের চিতায় কোন হিন্দুর মরদেহ সৎকারের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তার সামনে দিয়ে নদীর বুক চিড়ে এগিয়ে যাচ্ছিল দুটি নৌকা। নৌকাগুলোকে মনে হচ্ছিল জ্বলন্ত মশাল যেনো পানির উপর সাঁতার কেটে এগুচ্ছে। চম্পা জগন্নাথকে দুর্বাঘাসের উপর বসিয়ে নিজের মাথা জগন্নাথের উরুতে রেখে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

"জগন! তুমি পাশে না থাকলে আমি এই রাজাকে হয় বিষ খাওয়াতাম, নয়তো নিজেই বিষ পান করতাম। জগন্নাথের আঙুলে বিলি কেটে চম্পা বলল। কিন্তু আমি দেখছি, রাজাকে তুমি এতোটাই ভালোবাসো যে, তুমি কোন অবস্থাতেই তাকে ছাড়তে চাও না।

এই রাজমহল আর তার রাজার চাকরীই কি তোমার কাছে জীবনের সবচেয়ে প্রিয়? কিন্তু আমার কাছে এই রাজপ্রাসাদ, এই রাজকীয়তা, রাণীর বেশ একেবারেই পানসে, অসহ্য। তুমি আমার সঙ্গে থাকলে আমি জগতের মানুষকে দেখিয়ে দিতাম, জীবনের কাছে এসব রাজপ্রাসাদ-রাজকীয়তা নেহায়েতই তুচ্ছ। তুমি সাথে থাকলে আমি বনবাসেও থাকতে রাজি। মাটির ডেড়াও আমার কাছে এই প্রাণস্পন্দনহীন প্রাসাদের চেয়ে উত্তম।

আচ্ছা জগন! তুমি এই বন্দিশালা থেকে কেন বের হও না? তুমি কেনো আমাকে এই প্রাসাদের ঘেরাও থেকে মুক্ত বাতাসে নিয়ে যাও না? কতো দিন পর্যন্ত আমরা এভাবে চুরি চুপকি করে মিলিত হবো?"

"একথা তো তুমি আমাকে শতবার বলেছো। আর আমি প্রতিবারই তোমাকে বলেছি, একটু ধৈর্য ধরো, সুযোগের অপেক্ষা করো; সময়-সুযোগ হলে আমি ঠিকই তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবো। চম্পাকলির চেহারায় আলতোভাবে হাত বোলাতে বোলাতে বললো জগন্নাথ।

আজ আবারো আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এসব আবেগ বেশীক্ষণ থাকে না। আজ যদি তুমি আমার হাত ধরে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাও, তবে কদিন পরেই তুমি আবার এই প্রাসাদ ত্যাগের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠবে। জানো, পৃথিবীতে আমার দুহাত জমিনও নেই। আমার হাতে কোন অর্থকড়িও

নেই। বলতে গেলে আমার অবস্থা অনেকটা অপরাধীর মতো। এমতাবস্থায় আমাকে যেখানেই পাকড়াও করা হবে, সেখানেই হত্যা করা হবে।'

তুমি তো ভেরা থেকে এসেছো, সেখানে মুসলিম শাসন চলছে। আমরা যদি পালিয়ে ওখানে চলে যাই আর সেখানে গিয়ে মুসলমান হয়ে যাই, তাহলে মুসলমানরা কি আমাদের ঠাঁই দেবে না?

আমার এখন ধর্মের প্রতিও বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। বলে উঠে বসতে বসতে চম্পাকলি বললো, জানো আমি ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে মহারাজাকে বিষ পান করাতে পারি। মরে গেলে তুমি আমাকে নিয়ে চলে যাবে। রাজা মরে গেলে আমাদের আর পাকড়াও করার কে থাকবে?

ওই যে চিতায় আগুন দেখতে পাচ্ছো, দূরের শ্মশানে মরদেহ পোড়ানোর আগুনের দিকে ইশারা করে চম্পাকে জগন্নাথ বললো, মহারাজা মারা গেলে তোমাকে চিতার আগুনে পুড়ে সতীদাহ হতে হবে। তোমাকে জীবন্ত মহারাজের চিতায় তুলে দেয়া হবে। আমার উপর বিশ্বাস রাখো চম্পা, আমি তোমাকে ধোঁকা দেবো না।'

তুমি তো ভেরাতে গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো, তাই না? আচ্ছা, ওরা কি খুব বেশী শক্তিশালী আমাদের রাজপুতরা তাদের পরাজিত করতে পারছে না কেন?'

"হ্যাঁ, গযনীর সৈন্যরা খুবই শক্তিশালী। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা যতো কম থাকে, তাদের শক্তি ততোই বেশী থাকে। মুসলমান সৈন্যরা মহারাজা ভীমপালের হাঁটু ভেঙ্গে দিয়েছে। এখন তার কাছ থেকে খিরাজ নিচ্ছে।

কাশ্মীরে পরাজিত হয়ে ফেরার সময় সুলতান মাহমূদের হাতে সৈন্য খুব কম ছিল এবং সবাই ছিল আহত। কিন্তু এসব মুষ্টিমেয় আহত সৈন্য মহারাজ ভীমপালের এলাকা দিয়ে অতিক্রম করার সময়ও অর্ধমৃত এই সৈন্যদের উপর আক্রমণ করে সুলতান মাহমূদসহ তাদের বন্দী করার সাহস হয়নি ভীমপাল মহারাজার।

জগন্নাথ, তুমি তো ধর্মের খুবই ভক্ত। যদি কিছু মনে না করো, তাহলে আমি আজ তোমাকে দু'টি কথা বলতে চাই। জগন্নাথের কোমর পেঁচিয়ে ধরে বললো চম্পাকলি। দেখো জগন! পুরোহিতরা আমাদেরকে দেবদেবীদের অভিশাপের ভয় দেখায়। তারা বলে, মুসলমানরা আমাদের যেসব দেবদেবীর

মূর্তি ধ্বংস করে দিয়েছে, যেসব মন্দির মিসমার করে দিয়েছে, সেইসব আমাদের অভিশাপ দেবে।...

কিন্তু এতোটা সময় পেরিয়ে গেলো, আমি তো কোথাও দেবদেবীদের অভিশাপ পড়ার কথা শুনলাম না। বরং আমি তো দেখছি গযনী বাহিনী আমাদের উপর অভিশাপ হয়ে আসছে।

আমি শুনেছি, মুসলমানরা এমন প্রভুর ইবাদত করে, যিনি নিরাকার, কেউ তাকে দেখতে পায় না। আমার তো মনে হয় সেই খোদা-ই হয়তো সত্য খোদা। আমরা ছোটকাল থেকে থানেশ্বরের বিষ্ণুদেব সম্পর্কে শুনেছি, যারা বিষ্ণুদেবের পূজা করে, তারা কখনো পরাজিত হয় না। কিন্তু গযনী সুলতানের আক্রমণ থেকে সেই বিষ্ণুদেবকেও কেউ রক্ষা করতে পারলো না। পূজারীদেরও বাঁচাতে পারলো না কেউ।

দেবতা নিজেও পারল না নিজেকে রক্ষা করতে। তুমি কি এসব দেবদেবীকে বিশ্বাস করে পূজা করো।'

'তুমি জীবনবিমুখ হয়ে বিষিয়ে উঠেছো। ফলে ধর্ম সম্পর্কে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছো। এজন্য ধর্ম সম্পর্কে যাচ্ছেতাই বলছো চম্পা।' চম্পার রেশমী চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললো জগন্নাথ। ধর্ম সম্পর্কে তোমার মনে যা ইচ্ছা বলো, কিন্তু আমার ভালোবাসায় সন্দেহ পোষণ করো না।'

"তোমার প্রতি আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। তুমি প্রেমের প্রশ্নে আমাকে যতো কঠিন পরীক্ষায়ই করো না কেন, আমি ঠিকই শতভাগ উতরে যাবো। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে আমি কোন ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি নই।' জগন্নাথকে বললো চম্পা।

ইত্যবসরে সেবিকা গলা খাকারী দিয়ে তার উপস্থিতি জানান দিল। চম্পা রাণী বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করল। জগন্নাথ তার জায়গায় বসে রইল। কিছুক্ষণ পর রাণী জগন্নাথকে ডাকার উদ্দেশ্যে রাণীদের ব্যবহার্য বিশেষ আওয়াজ দিল এবং সেবিকাকে নিয়ে আগে আগে হাঁটতে শুরু করল।

* * *

পরদিন মহারাজা রাজ্যপাল জগন্নাথকে ডেকে বললেন, জগন্নাথ, আজ তোমার ছুটি। তুমি স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াতে পারো।'

জগন্নাথ মহারাজার অনুমতি নিয়ে রাজকীয় পোশাক পরিধান করে কোমরে তরবারী ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

মাথুরা জুড়ে লাখো মানুষের সমাগম। চতুর্দিকেই মানুষ আর মানুষ। গোটা মাথুরা এলাকা যেনো এক বিশাল মেলায় পরিণত হলো। উৎসব উপলক্ষে জায়গায় জায়গায় গনক, জ্যোতিষী ও সাধু-সন্ন্যাসীরা তাদের মজমা বসিয়ে মানুষদের গোল লাগিয়ে লাগল। অনেক জায়গায় কবিয়ালরা গানের আসর জমালো, নর্তকীরা নাচের আসর জমালো, কেউ বা শারীরিক নানা কসরত খেলা দেখিয়ে দর্শক শ্রোতা ও আগত লোকদের মাতিয়ে রাখল।

লোকজন জ্যোতিষী ও গণকদের কাছে তাদের হাত দেখিয়ে তাদের ভাগ্য জানার চেষ্টা করছিল। সাধুরা মজমা জমিয়ে পুণ্যার্থীদের প্রসাদ বিতরণ করছিল। জগন্নাথ প্রতিটি মজমাতে একটু উঁকি দিয়ে ঘটনা আঁচ করে আবার অন্যখানে উঁকি দিচ্ছিল।

যেতে যেতে সে একটি গাছের নিচে দু' সাধু সন্তুকে বসা দেখল। তাদের শুধু আব্রুটুকু ঢাকা আর সারা শরীর উলঙ্গ। গা জুড়ে ধূপ ভস্মের প্রলেপ। মাথায় দীর্ঘ চুল। চুলগুলো ছাই-ভস্মে জটবাঁধা। তাদের দীর্ঘ দাড়িও জটবাঁধা। জটাধারী এই সাধু সন্তুদের ঘিরে বহু লোকের মজমা।

জগন্নাথ এই মজমায় গিয়ে উঁকি দিল। সে ভেতরের অবস্থা দেখা ও বোঝার জন্য দাঁড়াতেই এক লোক সাধুদের জিজ্ঞেস করল–

'সাধুবাবা! আমাদেরকে ওই দুরাচার ম্লেচ্ছাদের কথা কিছু বলুন, যারা পাহাড়ের ওপাশ থেকে এসে আমাদের মন্দিরগুলোকে ধ্বংস করে চলে যায়?"

"মুসলমানরা.......। এরা লোভী। সম্পদের লোভেই এরা ভারতে আসে। তাই এরা আমাদের মন্দিরের সম্পদ লুট করে চলে যায়। এরা আমাদের কোন দেবদেবীকে ভয় করে না। ওরা জানে না, মহাভারতে বাসুদেব ও বিষ্ণুদেবের যে ক্রোধের কথা বলা হয়েছে তা সত্য।

দেবদেবীর ক্রোধ অবশ্যই মুসলমানদের উপর পড়ছে যদিও এখন তা আমাদের উপর পড়ছে। গযনীর বাদশা মাহমুদ খুবই জালেম ও আগ্রাসী। সে যেদিকে অভিযান চালায়, বানের পানির মতো আসতে থাকে, তার সামনে কেউ

দাঁড়াতে পারে না, জঙ্গীহাতিও পালিয়ে যায়। নদীর তীব্র স্রোতও তার পথ রুখতে পারে না। পাহাড়ও তার অগ্রাভিযান থামাতে পারে না।

এই সন্ন্যাসী মুসলমানদের বদনাম করছিল। কিন্তু মুসলমানদের সম্পর্কে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিচ্ছিল। এই সন্ন্যাসী তীর্থযাত্রীদেরকে গযনী বাহিনীর এমন কিছু ভয়াবহ অভিযানের কথা বললো, যা শুনে আতঙ্কে শ্রোতাদের চোখ উল্টে যাওয়ার অবস্থা হলো।

জগন্নাথ নীরবে দাঁড়িয়ে সবকিছুই শুনছিল। কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে জগন্নাথের উপর সন্ন্যাসীর চোখ পড়লে হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে সন্ন্যাসীর যবান বন্ধ হয়ে গেলো এবং কালবিলম্ব না করেই আবার সন্ন্যাসীর কথা চলতে থাকল।

এক পর্যায়ে সন্ন্যাসী দেবদেবীদের ক্রোধ থেকে বাঁচার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করল। কিছুক্ষণ পর জগন্নাথ ওখান থেকে সরে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে একটি পুরনো মন্দিরের সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়াল জগন্নাথ। সেখানে দাঁড়িয়ে সেই দুই সন্ন্যাসীকে জগন্নাথ আসতে দেখতে পেলো। তাদের দেখেও জগন্নাথ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল। এই মন্দিরটি ছিল পরিত্যাক্ত। এর কিছু অংশ ভগ্নস্তূপে পরিণত হলো। হঠাৎ সে শুনতে পেল 'তাশ!'

ডাক শুনেও সে থামল না এবং পেছনে ফিরেও দেখলো না, আবার সে শুনতে পেল, 'তাশ! তাশকীন!'

একমনে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল জগন্নাথ। উভয় সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে উঠতে বললো, 'আরে' আমীর বিন তাশকীন!' এবার দাঁড়াল জগন্নাথ এবং তার চেহারায় ক্ষোভের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো।

'আরে এখানে কেউ শুনতে পাবে না। ভয় করো না।' বললো দুই সন্ন্যাসী।

জগন্নাথরূপী তাশকীন সন্ন্যাসী হিশাম সমরকন্দীর কানে কানে বললো, 'হিশাম সমরকন্দী! কেউ না শুনলেও আমার নাম ধরে ডাকা তোমাদের উচিত হয়নি। তোমরা নির্বোধ হয়ে গেলে নাকি? এখানে বসো। আমি আমার হাত দেখাচ্ছি।

আমার হাত ধরে দেখতে থাকবে এবং কথা বলতে থাকবে। তোমরা দুজন ছাড়া এখানে আরো কি কেউ আছে?”

“আরো দু’জন আছে। জবাব দিল সন্ন্যসীরূপী হিশাম। ওরাও কায়সের মতোই মুশরেফ তথা গোয়েন্দা। তারাও সন্ন্যাসীরূপেই অবস্থান করছে।’

বহির্দিশে গোয়েন্দাকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে গযনী সালতানাতে ‘মুশরেফ’ বলে ডাকা হতো। সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা বিভাগের অভিজ্ঞ কর্মকর্তারা স্থানীয় লোকদেরও তাদের পক্ষে চর নিয়োগ করতো এবং তাদেরকে বিপুল আর্থিক ভাতা দিতো।

সন্ন্যাসীরূপী এই দুজনের নেতা ছিল গযনীর গোয়েন্দা বিভাগের অন্যতম কর্মকর্তা হিশাম সমরকন্দী। মাথুরায় ভারতের বিপুলসংখ্যক হিন্দু সমাবেশ ঘটতে যাওয়ার খবর শুনে তাকে মুলতান থেকে মাথুরায় পাঠানো হয়। সে স্থানীয় লোকদের সাথে নিয়ে সন্ন্যাসীরূপে তীর্থযাত্রী হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে আরো আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে লাগল।

হিশামের সঙ্গী সন্ন্যাসীরূপী অপর গোয়েন্দা ছিল মুলতানের অধিবাসী কায়েস। তারা দু’জন ছাড়াও আরো দু’জন মুলতানী মাথুরায় তৎপর ছিল। তারা হিন্দু সমাবেশের কোথাও ছদ্মবেশ ধারণ করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

হিশাম ভিড়ের মধ্যে জগন্নাথরূপী আমীর বিন তাশকিনকে চিনে ফেলে। কারণ, তারা উভয়েই ছিল গযনীর অধিবাসী। কিন্তু কর্মসূত্রে হিন্দুস্তানে এই তাদের প্রথম সাক্ষাত। কিন্তু কায়েস তাশকীনকে চিনতো না। এরা প্রত্যেকেই স্থানীয় হিন্দুদের রীতি-রেওয়াজ ও কৃষ্টিকালচার নিপুণভাবে রপ্ত করেছিল। হিন্দু ধর্মের খুটিনাটি সম্পর্কেও তারা ছিল জ্ঞাত।

‘তোমার ঠিকানা কোথায়? তাশকীনকে জিজ্ঞেস করল হিশাম। কাজের কাজ কিছু করতে পেরেছো?

“আমি চলে যাচ্ছি! হিন্দুর বেশ ধারণ করে এখানে এসেছিলাম, এখন কাজ শেষ করে চলে যাচ্ছি।” বললো তাশকীন।

আরে! তুমি আমাদের কাছে নিজেকে আড়াল করছো কেন? হেসে বললো হিশাম। আমি তোমাকে মহারাজা কন্নৌজের সাথে দেখেছি। তুমি হয়তো তার নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছো। তোমাকে দেখে কিন্তু তুমি যে

আমাদের তাশকীন তাতে মোটেও সন্দেহ হয়নি। তোমাকে তো আমি উস্তাদ মনে করি।"

"আমাদের তিনজনের একসঙ্গে এক জায়গায় বসে থাকা ঠিক হচ্ছে না।" বললো তাশকীন। কায়স! তুমি একটু ঘোরাফেরা করো। রাতে আবার আমরা একসঙ্গে মিলিত হবো।"

কায়েসের চলে যাওয়ার পর আমের বিন তাশকীন হিশামের উদ্দেশ্যে বললো, হিশাম! তুমি তো আস্ত একটা বোকা দেখছি। তুমি স্থানীয় লোকদের উপর এতোটাই আস্থা ও বিশ্বাস রাখো যে, আমার মতো স্পর্শকাতর অবস্থানে থাকা ব্যক্তির কথাও তুমি তাকে জানিয়ে দিলে? তাকে কি তুমি গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরীক্ষা করেছো? সে কি কোন জটিল কাজ সমাধা করেছে?'

"লোকটি নির্ভরযোগ্য। অবশ্য তাকে এখনো স্পর্শকাতর কোন কাজে ব্যবহার করিনি।" বললো হিশাম।

"আল্লাহ যেনো তাকে নির্ভরযোগ্য রাখেন। বললো তাশকীন। তবে মনে রাখবে হিশাম! আমাদের কাজ খুবই স্পর্শকাতর ও জটিল। তুমি তো জানো এ কাজে নিজের আবেগ, উচ্ছ্বাস, অনুভূতিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আর এই আবেগ সে-ই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যার মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমান আছে এবং যারা আমাদের মতো জাতির প্রতি দায়বদ্ধ।

হিন্দুস্তানের কোন মুসলমানের উপর এতোটা ভরসা করা যায় না। এসব লোক দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত। এরা হিন্দুদের প্রভাবে খুব অল্প সময়েই প্রভাবিত হয়ে যায়। এরা হিন্দুদের কুসংস্কার ও হিন্দু কালচার খুব সহজেই গ্রহণ করে ফেলে। নিজেদের অক্ষমতা ও নানা অসুবিধার শিকার হলে এরা হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার জন্য উদগ্রীব হয়ে যায়।

এখানকার কোন মুসলমানকে নির্ভরযোগ্য মনে হলেও আমার মতো জটিল কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের তথ্য দেয়া ঠিক নয়। কারণ, এখানকার হিন্দু শাসকরা সামান্য সন্দেহ হলেই মুসলমানদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়, তাদের নির্বিচারে হত্যা করে।'

'ঠিক আছে, আমি ওকে আরো পাকাপোক্ত করে নেবো।' বললো হিশাম।

'হিশাম, এ লোক আমাকে কন্নৌজের মহারাজার সাথে দেখেছে। এখন সে আমার পরিচয়ও জেনে গেছে। সে যদি কোন কারণে হিন্দুদের হাতে ধরা পড়ে

অথবা হিন্দুদের পক্ষ থেকে লোভনীয় কোন উপঢৌকনের টোপ পায়, তাহলে সে আমাকে ধরিয়ে দিতে পারে। যে কোন অবস্থায় তার জন্য আমি মোটা অংকের শিকার।

একটু ভেবে দেখো! আমি কন্নৌজের মহারাজার একান্ত নিরাপত্তা রক্ষী। সবাই আমাকে জগন্নাথ বলেই জানে। এমতাবস্থায় আমাকে যদি কেউ স্বরূপে ধরিয়ে দিতে পারে, তাহলে মহারাজা তাকে তার দেহের ওজন পরিমাণ হীরা-জহরত উপঢৌকন দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না।'

'তুমি যদি তাকে সন্দেহ করো, তাহলে আজই আমি তাকে হত্যা করে লাশ গায়েব করে ফেলবো।' বললো হিশাম। আমি এখন আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। আমি দুঃখিত।'

'না, সংশয়ের বশীভূত হয়ে কারো জীবনহানি ঘটানো ঠিক হবে না।' বললো তাশকীন। এর চেয়ে বরং তার উপর কড়া দৃষ্টি রাখো এবং তাকে ঈমান ও উদ্দেশ্যে সম্পর্কে আরো পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করো।'

'আমরা যা করছি, তা তোমার কাছে কি ভালো লেগেছে?' তাশকীনের কাছে জানতে চাইলো হিশাম। এখানকার সাধারণ মানুষজনকে মন্দিরের পুরোহিত এবং পণ্ডিতরাই আতঙ্কিত করে ফেলেছিল। এর উপর আমরা আতঙ্কের মাত্রাটি আরো বাড়িয়ে দিলাম।

এখানকার লোকেরা হিন্দু সাধু-জ্যোতিষী-সন্ন্যাসী- গণকদের সর্ব্যৈব মিথ্যা কথাগুলো সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আমরা সন্ন্যাসীরূপ ধারণ করে তাদের বোঝাচ্ছি, মাহমূদ গযনবীর কাছে জিন ভূত থাকে। এসব জিন-দানবেরা সামরিক-বেসামরিক সব ধরনের প্রতিপক্ষকে গ্রাস করে আর সামনে দুর্গ-দেয়াল-পাহাড়-পর্বত যাই থাকুক না কেন সবকিছু তছনছ করে ফেলে...।

এর ফলে এখানকার মা-বোন-স্ত্রীরা তাদের স্বামী-পুত্র ভাইদের সেনাবাহিনীতে যেতে দেবে না। তারা কিছুতেই চাইবে না, তাদের ঘর উজাড় করে আপনজনেরা বেঘোরে মুসলমানদের হাতে প্রাণ বিজর্সন দিক...। আচ্ছা তুমি ওখানে কী করছো তাশকীন?"

"কন্নৌজের মহারাজার ভবিষ্যত পরিকল্পনা জানার ও বোঝার চেষ্টা করছি।' বললো তাশকীন। মহারাজা সুলতানের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ। যেসব

রাজা-মহারাজা গযনী বাহিনীর হাতে পরাজতি হয়েছে, তাদের খুবই গালমন্দ করে। এখানে ভারতের অধিকাংশ রাজা-মহারাজারা এসেছে। তাদের একটা বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে তারা ভবিষ্যত কর্মসুচী ঠিক করবে। তখন বোঝা যাবে, তারা কী করতে চায়?"

"সুলতানের পক্ষে এখনই কোন অভিযানে বের হওয়া সম্ভব নয় তুমি কি সেই খবর জানো তাশকীন? বললো হিশাম।

'হ্যাঁ, খাওয়ারিজমে সুলতানের খুবই রক্তক্ষয়ী একটি যুদ্ধ করতে হয়েছে। হিশামের অসমাপ্ত কথা পূর্ণ করে বললো তাশকীন। এসব খবর যথাসময়েই আমি পেয়েছি।

সুলতানও জানেন, লাহোরের মহারাজা ভীমপাল কন্নৌজের মহারাজাকে সুলতানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য উৎসাহ দিচ্ছে। আমার এখানে আসতে হয়েছে কন্নৌজের মহারাজার তৎপরতা জানার জন্য।

এরা কি গযনী আক্রমণ করতে চায়? না ভারতের সব রাজা মহারাজারা ঐক্যবদ্ধ সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে সুলতানকে হুমকি দিতে চায়? এরা হয়তো সম্মিলিতভাবে সেনা সমাবেশ করে সুলতানকে পরাজতি করার চেষ্টা করবে। আমার কাজ হলো এখানকার রাজা মহারাজাদের সামরিক শক্তির আন্দাজ করা এবং এরা কি সামরিক কৌশল নেয় তা জানা।"

"ও, এজন্যই হয়তো আমাদের বলা হয়েছে, মাথুরার হিন্দু সমাবেশে জনগণের মধ্যে গযনী বাহিনী সম্পর্কে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে।"

"এখন তুমি চলে যাও। বললো তাশকীন। মনে রেখো, স্থানীয় গোয়েন্দা মুশরেফদের উপর এতোটা নির্ভরশীলতা ঠিক নয়। এদেরকে কৌশলে ব্যবহার করো।"

* * *

সে দিন সন্ধ্যায় চতুর্দিক অন্ধকার করে কাকের চোখের মতো নীল হয়ে গেল আকাশ। সেদিন মাথুরায় আগত সকল রাজা-মহারাজাদের দাওয়াত ছিল কন্নৌজের মহারাজার আস্তানায়।

মহারাজা কন্নৌজের রাজকীয় তাঁবুতে নানা বর্ণের ফানুস ও বাহারী শামিয়ানা দিয়ে সাজানো হলো। কন্নৌজ মহারাজার তাঁবু ছিলো বিশাল জায়গা

জুড়ে। এর ভেতরে নিরাপত্তারক্ষী, রাণীদের থাকার কক্ষ, রাজার বৈঠকখানা, মহারাজার আরামের কক্ষ, সেবক সেবিকাদের থাকার কক্ষ, নর্তকী, গায়ক বাদকদলের জন্য আলাদা থাকার রুম ছিল। তাঁবু তো নয়, যেন বিশাল ময়দান জুড়ে এক রাজমহল।

জিয়াফত অনুষ্ঠানে রাজা মহারাজাদের শরাব পান করানোর জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল সুন্দরী যুবতী ও প্রশিক্ষিত তরুণী। এরা অর্ধনগ্ন পোশাকে সজ্জিত হয়ে রাজ-মহারাজাদের আপ্যায়ন করছিল।

অধিকাংশ রাজা-মহারাজাদের সাথে ছিলো দু-তিনজন করে রাণী। অনেক রাজা-মহারাজার একান্ত নিরাপত্তারক্ষীও তাদের সাথেই ছিল। আমীর বিন তাশকীন একান্ত নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কন্নৌজের মহারাজার পেছনে সশস্ত্র অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল। খাবার-দাবার চলার সময় চম্পারাণী আড়চোখে বারকয়েক জগন্নাথরূপী আমীর বিন তাশকীনকে দেখে নিল। কিন্তু তাতে তাশকীনের কোন ভাবাবেগ ঘটলো না, সে মন্দিরের পাথুরে মূর্তির মতোই নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল।

আহারপর্ব শেষ হলে বাদ্যযন্ত্রের বাজনা শুরু হলো। বাজনার আওয়াজ যখন উচ্চাঙ্গে উঠলো, তখন মঞ্চের এক কোণ থেকে সাদা ওড়না গায়ে জড়িয়ে পায়রার মতো পাখনা মেলে নাচের মুদ্রায় দৃশ্যমান হলো এক নর্তকী।

ঠিক এই সময়ে বজ্রপাতের মতো গর্জে উঠলো এক রাশভারী কণ্ঠ– "বন্ধ করো এসব পাপাচার!"

সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেলো বাদকদলের উন্মাতাল বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আর নিমিষেই অদৃশ্য হয়ে গেলো নর্তকী।

সবাই অবাক চোখে দেখলো মঞ্চের মাঝখানে মাথুরার বড় মন্দিরের প্রধান পুরোহিত অগ্নিমূর্তি ধারণ করে দণ্ডায়মান। ক্ষোভে তার ঠোঁট কাঁপছে। দুচোখে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। প্রধান পুরোহিতের এই অগ্নিমূর্তি দেখে রাজা-মহারাজা ও রাণীদের এই প্রমোদ মহলে নীরবতা নেমে এলো। আবারো ধ্বনিত হলো গম্ভীর কণ্ঠ "স্বঘোষিত নির্ভীক মহারাজা ভীমপাল গযনীর সুলতানের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজতি হয়ে তার সাথে অধীনতামূলক চুক্তি করেছে। তোমরা কি এর জন্য উৎসব করছো?' ক্ষুব্ধ পুরোহিত কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে বললো।

তোমরা কি দেবদেবীদের অপমানের আনন্দ-উৎসব করছো? তোমাদের ধর্মালয় মন্দিরগুলোর উপর দিয়ে মুসলমানরা তাদের জঙ্গী ঘোড়া ছুটিয়েছে এজন্য কি তোমরা নর্তকীদের সাথে নিয়ে এসেছো?

রাজপুতদের তাজা রক্ত বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এজন্য আনন্দ করছো তোমরা? নর্তকী নাচিয়ে কী আনন্দ করবে, তোমরা নিজেরাই পায়ে নূপুর আর হাতে চুড়ি পরে নাচো... ।"

"আমাদের ক্ষমা করে দিন পণ্ডিত মহারাজ।" এক রাজা দাঁড়িয়ে দু'হাত জোড় করে বললো। আজ আমরা এই ফায়সালা করার জন্যই একত্রিত হয়েছি– গযনী বাহিনীকে কী করে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দেয়া যায়?"

"তোমাদের সবার উপর শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেবের গজব আসি আসি করছে। তোমাদের কারণেই আবারো ভারতের মাটিতে অগণিত মুহাম্মদ বিন কাসিম জন্ম নিচ্ছে। এ কারণে তোমরা দেবদেবীদের অভিশাপ থেকে রেহাই পাবে না।"

পণ্ডিতের কথা শেষ হতে না হতেই আকাশে তুমুল মেঘের গর্জন শোনা গেল। সন্ধ্যার আগ থেকেই আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছিল এবং চারদিকে নেমে এসেছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। হালকা বিজলীও চমকাচ্ছিল। কিন্তু মেঘের তর্জন গর্জন বেড়ে দেখতে দেখতে তীব্র হয়ে উঠলো আকাশের গর্জন। এরই মধ্যে পণ্ডিত রাজা-মহারাজাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছিল এবং তাদেরকে সনাতন ধর্ম রক্ষায় অবহেলা ও উদাসীনতার জন্য দোষারোপ করছিল। রাজা মহারাজাদেরকে পণ্ডিত দেবদেবীদের অভিশাপের ভয় দেখাচ্ছিল।

হঠাৎ ঝুলন্ত ঝাড়বাতিগুলো খুব জোরে দুলে উঠলো এবং টাঙানো শামিয়ানার সাথে হোঁচট খেলো। শামিয়ানাগুলো উপরে উঠে গেল তীব্র বাতাসের ধাক্কায়। দেখতে দেখতে এমন তীব্র বাতাস বইতে শুরু করলো যে, তাঁবুগুলোকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে তীব্র বাতাস রূপ নিলো প্রচণ্ড ঝড়ের। ঝড়ের তাণ্ডবে জ্বলন্ত ফানুসগুলো নিচে আছড়ে পড়ল এবং চতুর্দিকে তেল ছড়িয়ে পড়ল, শামিয়ানাগুলো ছিঁড়তে শুরু করলো। জ্বলন্ত ফানুস ও জ্বলন্ত মশালের আগুনে ছিড়ে পড়া শামিয়ানা ও তাঁবুতে আগুন ধরে গেল। প্রচণ্ড ঝড়ের সাথে এমন তীব্র বিজলী ও কানফাটা মেঘের গর্জন ও বজ্রপাত শুরু হলো, যেনো আসমান ভেঙে পড়তে শুরু করেছে।

ভেঙেপড়া ফানুস এবং মশালের আগুনে ছিঁড়ে যাওয়া তাঁবুর কাপড়ে আগুন ধরে গেলে বাতাস তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল ; আগুনের ধোঁয়া আর তীব্র ঝড় ও ঘুটঘুটে অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখার উপায় ছিলো না।

এরই মধ্যে পণ্ডিতের কণ্ঠে শেষবাক্য উচ্চারিত হলো, এই দেখো বিষ্ণুদেবের অভিশাপ ঝড়ের রূপে এসে গেছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব ও আতঙ্কিত সকল রাজা-মহারাজা নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য যে যেদিকে পারল দৌড়াতে শুরু করল। কিন্তু ততক্ষণে বজ্রপাত ও বিজলীর সাথে শুরু হয়েছে ভারি বর্ষণ।

তীব্র ঝড়ের শনশন আওয়াজ, ভারি বৃষ্টি আর মেঘের গর্জনের সাথে বর্জপাতের আওয়াজ মিলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হলো।

অদূরে বাঁধা রাজা-মহারাজাদের হাতি ও ঘোড়াগুলো আতঙ্কিত চিৎকার ও হ্রেষারব করতে লাগল। অবস্থা আরো গুরুতর হয়ে উঠলো। প্রবল বৃষ্টি যখন তাঁবুর জ্বলন্ত আগুন নিভিয়ে দিল এবং তুফানে ছেঁড়া-ফাটা তাঁবুর খুঁটি উড়তে শুরু করলো।

রাজা-মহারাজাদের একান্ত নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের মনিবদেরকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণবাজী রেখে সবাই দৌড়ে অকুস্থলে পৌঁছালো। এরই মধ্যে শোনা যাচ্ছিল মহারাজা কন্নৌজের দরাজ কণ্ঠ, জগন্নাথ! যেখানেই থাকো, চম্পারাণীকে মন্দিরে নিয়ে যাও।'

সেখান থেকে মন্দির ছিল অনেক দূরে। সবাই যে যার মতো করে শহরের দিকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটছিল। গোটা তাঁবু এলাকায় দৌড় ঝাপ শুরু হয়ে গেল।

এমতাবস্থায় তুফানের আঘাতে ঘন গাছগাছালীতে আকীর্ণ মাথুরার গাছপালগুলো ভেঙে পরতে শুরু করেছে। ভাঙা গাছের ডাল মাটিতে আঁছড়ে পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। তাশকীন রাজার বলার আগেই চম্পাকে তার আয়ত্ত্বে নিয়ে এসেছিল এবং কাঁধে তুলে মন্দিরের দিকে ছুটছিল।

শহরের চতুর্দিকে আগত লাখো হিন্দু তীর্থযাত্রীর অস্থায়ী তাঁবু ছিল। অনেক লোক তাঁবু ছাড়াই খোলা আসমানের নিচে আসবাবপত্র নিয়ে অবস্থান নিয়েছিল। এসব লোক তাদের আসবাবপত্র ঝড়ের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে

জীবন বাঁচাতে ঝড়ের শুরুতেই শহরের দিকে দৌড়াতে শুরু করে দিল। শহরবাসী তীর্থযাত্রীদেরকে আশ্রয় দেয়ার জন্য ঘরবাড়ীর দরজা খুলে দিয়েছিল। মাথুরার প্রতিটি মন্দির ছিল খোলা। মানুষজন মন্দিরেও আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করছিল।

ঝড়ের তাণ্ডব তখন বেড়েই চলছে। সেই সাথে তীব্র বৃষ্টি, বিজলী আর বজ্রপাতের সাথে আহত-আতঙ্কিত মানুষের আর্তচিৎকার শুরু হয়ে গেল।

আতঙ্কিত শিশু, নারী ও আহতদের চিৎকারে গোটা মাথুরা এলাকা যেনো নরকে পরিণত হলো।

দৃশ্যত এ তুফান যেনো কেয়ামত হয়ে উঠেছিল। এই তুফানের মধ্যে হিশামের সহযোগী মুলতানের অধিবাসী কায়েস নদীর তীর থেকে শহরের দিকে আসছিল। সে ছিল একাকী। তীব্র তুফানের আওয়াজ, বিজলীর ঝলক আর মেঘের গর্জনের মধ্যে অতি নিকট থেকে তার কানে ভেসে এলো কোন নারী বা শিশুর আর্তচিৎকার।

বিজলীর আলোয় তার সামনের একটি গাছের গোড়ায় একটি নারীর মতো নজরে পড়লো এবং ওখান থেকে আবারো আর্তচিৎকার শোনা গেল। আর্তচিৎকার শুনে তীব্র বাতাসের ধাক্কা সামলে কায়েস সেদিকে দৌড়াল। গিয়ে ডালপালা উড়ে যাওয়া একটি গাছের গোড়ায় এক মহিলাকে আতঙ্কিত অবস্থায় দেখতে পেল। মহিলা ভয়ে তীরবিদ্ধ পাখির মতো কাঁপছে।

ভয় পেয়েছো? তুমি এখন আর একা নও, আমি তোমার সাথে আছি। আতঙ্কিত নারীকে অভয় দিতে বললো কায়েস।

এই আতঙ্কিত নারী ছিল এক পুণ্যার্থী কিশোরী। সন্ধ্যায় সে গঙ্গাস্নান করতে নদীতে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় ঝড় শুরু হয়ে যায়। সবাই যখন জীবন বাঁচানোর জন্য দৌড়াতে লাগলো, তখন অন্ধকারের মধ্যে সে সঙ্গীদের হারিয়ে ফেলেছিল। কায়েসকে দেখে আতঙ্কিত কিশোরী তাকে জড়িয়ে ধরলো।

আকাশের তীব্র গর্জন, চোখ ধাঁধানো বিজলী ও ঝড়ের প্রচণ্ডতায় কায়েসের মতো টগবগে যুবকের চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলার উপক্রম হলো। এমন সময় তাদের অতি কাছে একটি গাছের উপর ঘটলো তীব্র শব্দে বজ্রপাত। আতঙ্কিত তরুণী বজ্রপাতের আওয়াজে মা বলে চিৎকার করে কায়েসের শরীরে এভাবে লেপ্টে গেলো, যেনো সে কায়েসের শরীরে বিলীন হয়ে নিজেকে রক্ষা করবে।

তীব্র ঝড়কে দেবতার ক্রোধ বিশ্বাস করে মাথুরার মন্দিরগুলোতে একটানা ঘন্টা ও শাখা বাজতে শুরু করল। ঝড়ের এই বিপদে মন্দিরের শিঙ্গাগুলোর বেসুরো আওয়াজ যেন আক্রান্ত বাঘের গর্জন।

মন্দিরের পূজারী ও পণ্ডিতেরা কৃষ্ণ ও বাসুদেব মূর্তির পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মন্দিরগুলোর পণ্ডিতেরা 'হরি হর মহাদেব' জয় হরিহর জগদিশ' ধ্বনি করছিল। সকল হিন্দুই এই ঝড়কে দেবতাদের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ বলে বিশ্বাস করেছিল।

ঘরে ঘরে হিন্দুদের যেসব মূর্তি ছিলো, অধিবাসীরা সেইসব ক্ষুদ্র মূর্তির সামনে হাতজোড় করে আবেদন নিবেদন করছিল। বস্তুত এটি দেবতাদের ক্রোধ, না আল্লাহ্র ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ এটা বুঝার ক্ষমতা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী হিন্দুদের ছিলো না। বেসুরো সিংগার আওয়াজ ঝড়ের ভয়াবহতাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল।

সকল রাজা-মহারাজা, তাদের সেনাবাহিনীর বীর সেনাপতি ও কমান্ডাররাও এই ঝড়ের ভয়াবহতায় থরথর করে কাঁপছিল। তারা এই ঝড়কে মনে করেছিল জিনভূত ও দেও-দানবদের সংহারী যুদ্ধ। মনে হচ্ছিল, এই ঝড় দুনিয়াকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবে।

* * *

কায়েস আতঙ্কিত তরুণীকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঝড়ের মধ্যেই একটি জরাজীর্ণ মন্দিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তরুণী কায়েসের গলা জড়িয়ে ধরে কায়েসের গালের সাথে তার চেহারা মিশিয়ে রেখেছিল। তরুণী ছিল অনেকটাই অচেতন। বিজলীর চমক আর বজ্রপাতের শব্দে সে খানিকটা হুঁশ ফিরে পেতো।

তীব্র ঝড়ের মধ্যে কায়েস তরুণীকে কাঁধে নিয়ে এগুতে পারছিলো না, তার পা উপড়ে যাচ্ছিল। ঝড়ের ঝাপটায় গাছের ডালপালা নুয়ে পড়ে কায়েসকে আঘাত করার উপক্রম হল। বারবার সে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, তবুও সে তরুণীকে কাঁধ থেকে ফেলে দেয়নি।

এমন সময় প্রচণ্ড এক বজ্রপাত ঘটলো। সেই সাথে কাছে এমন এক ভয়ানক চিৎকার শোনা গেল, যাতে কায়েসেরও জ্ঞান হারানোর উপক্রম হলো।

সম্পূর্ণ বেহুঁশ না হলেও কিছুটা অপ্রকৃস্থ অবস্থায় কায়েস বিজলীর আলোকে তার সামনে দেখতে পেলো দু'টি আতঙ্কিত হাতি শূর উঁচিয়ে এদিকে দৌড়ে আসছে। অবস্থা এমন যে, তার অবস্থান থেকে হাতির দূরত্ব ছিল মাত্র বিশ/ত্রিশ গজ।

আতঙ্কিত হাতি দুটো পাশাপাশি আসছিল। এর আগেই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে কাঁধে বোঝা নিয়ে কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হতে গিয়ে কায়েসের চলৎশক্তি ফুরিয়ে আসছিল। আতঙ্কিত হাতি দু'টো ভয়াবহ তীব্রতায় চিৎকার করে পাশাপাশি দৌড়ে আসছিল।

অবস্থা বেগতিক দেখে হাতির পায়ে পিষ্ট হওয়া থেকে বাচতে কায়েস শরীরের অবশিষ্ট সবটুকু শক্তি দিয়ে ডান দিকে দৌড় দিল। কিন্তু কয়েক কদম এগোতেই পা পিছলে পড়ে গেল এবং কাঁধের তরুণীকে দূরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

নিজে হাতির পায়ে পিষ্ট হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েই গড়িয়ে কিছুটা সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। এমন সময় হাতি তার উপর দিয়ে চলে গেল। ছুটন্ত হাতির একটি পা এসে পড়ল তার পাঁজরে।

বিজলীর ঝলকানিতে সহায়তাকারী হাতির পদপিষ্ট হয়েছে দেখে তরুণী চিৎকার দিয়ে এসে কায়েসের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং পরম মমতায় কায়েসের মাথাটা কোলে নিয়ে বললো, 'তুমি ঠিক আছো? ঠিক আছো কি না বল, কথা বলো। তরুণীর মমতাময়ী স্পর্শে কায়েস চোখ মেলে তাকাল এবং উঠে বসল! কিছুক্ষণ পর কায়েস তরুণীকে বলল, ঠিক আছে, আমার কিছু হয়নি।

* * *

অনেকক্ষণ পর তারা একটি ভগ্নস্তূপের মতো পুরনো মন্দিরে পৌঁছল। মন্দিরটি ছিল জমিন থেকে অনেক উঁচুতে। কায়েস ও হিশাম, আমীর বিন তাশকীনের সাথে এই ভগ্নমন্দিরেই মিলিত হয়েছিল।

তরুণীকে বগলদাবা করে নিয়ে কায়েস মন্দিরের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে থাকল। এক পর্যায়ে তরুণী কায়েসের পাঞ্জা ছাড়িয়ে বলল, আমাকে ছাড়, আমি নিজেই উঠতে পারব।

তখনো তুফানের তীব্রতা এতটুকু কমেনি। কিন্তু কায়েসকে স্বেচ্ছায় হাতির পদতলে পড়তে দেখে তরুণীর সাহস বেড়ে গিয়েছিল। তারা দু'জন পরস্পর কোমর পেঁচিয়ে ধরে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে অন্ধকারের মধ্যেই একটি পরিত্যক্ত কক্ষে প্রবেশ করল।

কক্ষে পৌছে ঝড় তুফানের তীব্রতা থেকে নিরাপদ বোধ করলে তরুণী অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়ে কায়েসের পা জড়িয়ে ধরে পায়ে মাথা রেখে কৃতজ্ঞতা জানাল।

'আরে, একি! আমাকে গোনাহগার বানিও না তুমি! পরম আদরে পা থেকে তরুণীর মাথা তুলতে তুলতে বললো কায়েস। ঘটনার আকস্মিকতা এবং ঘোরতর জীবনহানিকর বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে কায়েসের আবেগ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গেল।

সে নিজের পরিচয় গোপন রাখার ব্যাপারটি একদম বিস্মৃত হয়ে তরুণীকে এমন ভাষায় কথা বললো যে, তার আত্মপরিচয় এক নিমিষেই উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। কায়েস আরো বললো, 'আমাদের ধর্মে মানুষ মানুষকে সিজদা করা পাপ। মানুষ মানুষের পায়ে সিজদা দিতে পারে না। মানুষ একমাত্র নিরাকার আল্লাহ্কে সিজদা দিতে পারে।"

'তুমি কি মুসলমান?" বিস্ময়াভিভূত হয়ে বললো তরুণী।

"আমি যদি বলি যে, আমি মুসলমান, তাহলে তুমি আমাকে তেমনই ঘৃণা করবে, যেমন একজন হিন্দু মুসলমানকে ঘৃণা করে?"

'ঘৃণা? তোমাকে ঘৃণা করবো আমি? তুমি না হলে তো আজ আমি বেঁচেই থাকতাম না...। আচ্ছা, তুমি মুসলমান হলে তো এই তুফান যে দেবতাদের অভিশাপ তা বিশ্বাস করবে না।"

"আমি তোমার ধর্মকে অসম্মান করতে চাই না।" বললো কায়েস। এটা আসলে আমার প্রভুর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। সে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ পাথরের তৈরী মূর্তির পূজারীদের উপর বর্ষিত হচ্ছে। এই ঝড় আল্লাহ্র নির্দেশে হচ্ছে। সেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আমি শক্তি ও সাহস পেয়েছি। যার ফলে এমন কঠিন অবস্থার মধ্যেও আমি তোমাকে কাঁধে তুলে এখানে নিয়ে আসতে পেরেছি।

কায়েস সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে গঙ্গাতীরে গিয়েছিল। তার পরনে ছিল একটি লেঙ্গুট মাত্র। তার মুখে ছিল কৃত্রিম দাড়ি এবং সারা শরীরে ছাইভস্ম মাখানো ছিল। ঝড়োবৃষ্টি তার শরীরের কৃত্রিম সব আবরণ ধুয়ে ফেলল এবং লেঙ্গুট কোথাও খুলে পড়ে গেল।

তরুণী তা'কে জিজ্ঞেস করল, তুমি বিবস্ত্র কেন?

সে তরুণীর প্রশ্নের জবাবে জানাল, তুফানের আগমুহূর্তে সে নদীতে গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিল। তীরে কাপড় রেখে সে গঙ্গাস্নানে নেমেছিল। এরপরই তুফান শুরু হয়ে যায় এবং ঝড় তার তীরে রাখা কাপড় উড়িয়ে নিয়ে যায়। অতঃপর জীবন বাঁচাতে সে এদিকে দৌড়াতে শুরু করে।

কায়েস তরুণীকে জানালো, সে মাথুরায় মেলা দেখতে এসেছিল। সে তরুণীকে জিজ্ঞেস করল, তোমার বাড়ী কোথায়?"

জবাবে তরুণী বুলন্দ শহরের কোন একটা জায়গার নাম বললো। তরুণী আরো জানালো, তাদের গোটা পরিবারই এই উৎসবে এসেছে। তার বাবাও তাদের সাথে আছে। শহরের বাইরে ছিল তাদের তাঁবু।

কায়েস তরুণীকে জানাল, এখন আর সেখানে কোন তাঁবু পাওয়া যাবে না এবং গোত্রের কোন লোককেও সেখানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আজ রাত এখানেই কাটাতে হবে।

যদি কিছু মনে না করো, তাহলে আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আবেদনের সুরে থেমে থেমে বললো তরুণী।

'তুমি একজন তরুণ যুবক। আর আমি তরুণী। এখনো আমার বিয়ে হয়নি...। রাতটা আমাদের এখানেই কাটাতে হবে।'

তরুণীর কণ্ঠে ছিল নিজেকে সমর্পণের আবেদন।

কায়েস বলল, দেখো, আমি নিজের জন্য তোমাকে তুলে আনিনি। তোমার মা-বাবার কাছে তোমাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যই তোমাকে এনেছি...। আমি তোমার কাছ থেকে একটা প্রতীজ্ঞা নিতে চাই।... আমি যে মুসলমান একথা কাউকে জানাতে পারবে না। আমি মুসলমান জানতে পারলে হিন্দুরা আমার সাথে খুবই দুর্ব্যবহার করবে। আমি জগদিশ নামে পরিচয় দেবো।'

তরুণীর নাম ছিল ঊষা। ইতোমধ্যে তাদের উভয়েই উভয়ের প্রকৃত নাম জেনে গেছে। ঊষা কায়েসের প্রতিটি শর্ত এবং প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য শপথ করে নিল।

অতঃপর তারা সেই ভগ্নমন্দিরেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল। ক্লান্ত-শ্রান্ত যুবতী ঊষার দুচোখ ভেঙে ঘুম আসলেও বারবার তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। তুফানের ভয়ে ভাঙেনি, ভাঙছিল পরিচয় পাওয়া এই ভিন্নধর্মী মুসলমান যুবকের সংস্পর্শে রাতযাপনের ভয়ে।

আধো ঘুম আধো জাগ্রত অবস্থায় রাতের দ্বিপ্রহর কাটিয়ে শেষ প্রহরে ঊষার এমন ভারী ঘুম এলো যে, সে যখন ঘুম থেকে চোখ খুললো, তখন তার কক্ষ দিনের আলোয় আলোকিত হয়ে গেছে।

কায়েস সেই কক্ষের দরজায় বসে ঘুমন্ত ঊষাকে দেখছিল। রাতের ঝড় রাতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সকাল বেলায় সূর্য উঠলো ঝলমলে আকাশে প্রখর রৌদ্র-প্রতাপ নিয়ে। গত রাতের কেয়ামতের আলামত দিনের বেলার আকাশে মোটেও ছিল না।

ঘুম থেকে উঠে অনেক বিস্ময়ে ঊষা কায়েসকে দেখছিল এবং কায়েসও মুগ্ধনয়নে ঊষার দিকে তাকিয়ে ছিল। কায়েস অবাক হচ্ছিল ঊষার রূপ-সৌন্দর্য দেখে। জীবনে সে এমন সুন্দরী মেয়েলোক দেখেনি।

আর ঊষা অবাক হচ্ছিল কায়েসের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও তার রূপ-যৌবন, দৈহিক সৌন্দর্য ও সুঠাম-সবল দেহসৌষ্ঠব দেখে। সবচেয়ে বেশী বিস্ময়ের কারণ ছিল, এমন একটি টগবগে তরুণ তার মতো তরুণীকে কাছে পেয়েও একটু স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। অথচ কোন হিন্দু যুবকের বেলায় এমনটি ভাবা যেতো না।

বিস্ময়ের ঘোর দূর হতেই নীরবতা ভেঙে কায়েস ঊষার উদ্দেশে বললো, এখন তোমার বাবা-মাকে খুঁজে বের করার পালা। উঠো, এখন তাদের খুঁজতে বের হই।

ঊষার তখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। সে শোয়া থেকে উঠার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলো না। ঊষার চোখে কৃতজ্ঞতাবোধ ছাড়াও অন্য ব্যাপার ছিল। কায়েস তাকে আবারো তাড়া দিল। কিন্তু তবুও সে উঠলো না। কায়েস তার দিকে অগ্রসর হয়ে কাছে গিয়ে বসল। পূর্ববৎ শোয়া অবস্থায়ই ঊষা বললো,

"তুমি আমাকে জীবন দিয়েছো। তুমি কি এভাবে বাকী জীবনটা আমাকে নিরাপত্তা ও সুখ দিতে পারো না?"

উষার এ কথায় কায়েস কোন জবাব দিলো না।

"দেখো, তুমি আমাকে রাতের বেলায় আকস্মিক পেয়েছো, এটা আমার কাছে স্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়।" বললো উষা। এটাও আমার কাছে স্বাভাবিক ঘটনা নয় যে, তুমি এরপরও আমার গায়ে হাত দাওনি।

তুমি আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেও সেই বুড়োটার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না, যার সাথে আমার বিয়ের কথা পাকাপোক্ত হয়ে রয়েছে। দয়া করে তুমি আমাকে সাথে নিয়ে যাও...। হিন্দু নারীদের জীবন পুরুষের পদতলেই থাকে।

হিন্দু মেয়েদের পিতা-মাতা যার সাথে ইচ্ছা বিয়ে দিয়ে দেয়। স্বামী যদি মারা যায়, তাহলে সহমরণ হিসেবে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিতে হয়। যদি তা না করে, তাহলে আজীবন বিধবার বেশ ধারণ করে এই মাথুরার মন্দিরে কাটাতে হয়।

এখানে আসার পর এক বিধবা বান্ধবীর সাথে আমার দেখা হয়েছে। স্বামী মারা যাওয়ার পর দু'বছর যাবত সে এখানে আছে। মুখে সবাই বলে সে সতী-সাধ্বী জীবন যাপন করছে। কিন্তু বান্ধবীটি আমাকে জানিয়েছে, প্রতি রাতেই তাকে কোন না কোন পুরোহিতের সাথে থাকতে হয়। কায়েস...! তুমি আমাকে সাথে নিয়ে চলো। আমি বাকী জীবন তোমার সেবাদাসী হয়ে কাটিয়ে দেবো।

কায়েস ছিল টগবগে যুবক। একটি যুবককে এক পরমা সুন্দরী নিজেকে সমর্পণ করছে। দীর্ঘ সময় বহু কষ্টে সে নিজেকে নীরব এই মোমের কাছে না গলে ধরে রেখেছিল। কিন্তু সরব আগুনের শিখায় কায়েসের না-গলা ধৈর্যের শিকল গলে গেলো।

সে তরুণীকে এড়ানোর জন্য বললো, না, আমি আমানতের খেয়ানত করতে পারি না। তবে তোমার এই আবেদনও প্রত্যাখ্যান করতে পারছি না। ... আমার হৃদয়টা চিরে যদি দেখো, তাহলে সেখানে একমাত্র তোমারই ছবি আঁকা হয়ে গেছে, এখানে আর কারো ঠাঁই নেই। তোমাকে আমি আর কারো হাতে তুলে দিতে পারবো না। ঠিক আছে, এখন উঠো, চলো।"

ওরা টিলাসম মন্দির থেকে বের হয়ে বাইরের অবস্থা দেখে হয়রান হয়ে গেল। গত রাতের ঝড় ভয়ানক অবস্থা ঘটিয়ে গেছে। গত সন্ধ্যায়ও যেখানে ছিল তাঁবুর সারি, সেখানে আজ আর তাঁবুর কোন চিহ্ন নেই। লোকজন এদিক-সেদিক তাদের আসবাব পত্র তালাশ করছে। সকল তাঁবু লণ্ডভণ্ড। এলোপাতাড়ি গাছপালার ভাঙ্গা ডালপালা সারা এলাকা জুড়ে ছড়ানো। আর চতুর্দিকে শুধুই ধ্বংসের চিহ্ন, আর থৈ থৈ পানি।

কায়েস উষাকে সাথে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরের উপর থেকে নিচে নেমে এলো। তারা উষার বাবা-মার খোঁজে কিছুদূর এগোতেই উচ্চকণ্ঠে ভেসে এলো, "উষা, উষা"!!

উষা চিৎকার শুনে ওখানেই দাঁড়িয়ে গেল। সে কায়েসকে বললো, এই তো আমার বাবা! এখন আর আমাদের পক্ষে পালানো সম্ভব নয়।"

দীর্ঘদেহী, চওড়া বুকওয়ালা, বিশাল গোঁফধারী শক্ত সামর্থবান এক মধ্যবয়সী লোক দৌড়ে এসে উষাকে জড়িয়ে কোলে তুলে নিলো। উষাও তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললো, বাবা এর নাম জগদীশ। সেই গত রাতে আমার জীবন বাঁচিয়েছে। গতরাতে সে আমাকে নদীর তীর থেকে বেহুঁশ অবস্থায় তুলে এনে এই মন্দিরে রেখে রাতভর জাগ্রত থেকে পাহারা দিয়েছে। উষা এক নিঃশ্বাসে গতরাতের পুরো ঘটনা তার বাবাকে জানাল।

উষার কথা শুনে তার বাবা জগদীশরূপী কায়েসকে জড়িয়ে ধরে বললো, বলো বাবা, তুমি কী চাও? তোমাকে আমি উপহার দেবো। তুমি স্বর্ণ চাইতে পারো, ইচ্ছা করলে আমার ঘোড়াটিও চাইতে পারো। যাই চাও, আমি তোমাকে দিয়ে দেবো।"

"আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। একাজ আমি কোন পুরস্কারের লোভে করিনি। পুরস্কার যদি দিতেই চান, তবে আপনার এই মেয়েটিকেই আমাকে দিয়ে দিন। বললো কায়েস। কারণ, কাউকে না কাউকে তো আপনার এই মেয়ে দিতেই হবে। এটাই হবে আমার জন্য সবচেয়ে দামী পুরস্কার। আমি কেমন মানুষ তা এই সময়ের মধ্যে আপনার মেয়ে ঠিকই জেনে গেছে।

কায়েসের কথা শুনে উষার বাবা নীরব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো, তোমার মতো বীর বাহাদুর যুবকদের আমি সম্মান করি। তোমার দেহ সৌষ্ঠব খুবই সুন্দর। যথার্থ অর্থেই তুমি সুপুরুষ। আমি সেনা অফিসার।

বংশগতভাবেই আমরা সৈনিক। তোমার মতো সুপুরুষ যুবকের হাতে আমার মেয়েকে তুলে দিয়ে আমি তোমাকে সেনাবাহিনীতে চাকরী দিতে পারি। কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনীর এক উচ্চ কর্মকর্তার সাথে আমার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, এ প্রস্তাবকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। এ দাবী ছাড়া তুমি অন্য কিছু বলতে পারো।"

"আপনি কোন সেনাবাহিনীতে আছেন?" জানতে চাইলো কায়েস।

"আমি বুলন্দশহরের রাজার সেনাবাহিনীতে আছি।" জবাব দিল ঊষার বাবা।

কায়েস উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই ঊষার বাবার সাথে সেনাবাহিনী সম্পর্কে আলাপ শুরু করে দিল। এক পর্যায়ে ঊষার বাবা সুলতান মাহমূদ সম্পর্কে কথা বলতে লাগল। সে বললো, তাকে পরাজিত ও বন্দী করার জন্যই ভগবান এখনো আমাকে জীবিত রেখেছেন।

বংশগতভাবে এবং পেশাগতভাবে সৈনিক হওয়ার কারণে যুদ্ধ ও সেনাবাহিনী সম্পর্কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা বলছিল ঊষার বাবা। কিন্তু কায়েসের মনে তখন এসব বিষয়ের চেয়ে ঊষার আগ্রহই প্রবল। ঊষার বাবা কায়েসের সাথে ঊষার বিয়ের ব্যাপারে যখন অসম্মতি জানালো, তখন কায়েস একেবারে চুপসে গেল। তার চেহারা মলিন হয়ে গেলো। মনে হচ্ছিল তার দেহ থেকে যেনো আত্মা বের করে নেয়া হয়েছে।

কায়েস ভাবতে লাগলো। কুড়িয়ে পাওয়া রত্ন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে ঊষার বাবা।

ঊষাকে হারানোর যন্ত্রণা কায়েসের বোধজ্ঞান ও কর্তব্য চিন্তাকে ছাপিয়ে তার মানসিক দুর্বলতাকে তুঙ্গে তুলে আনলো এবং তাকে আবেগতাড়িত করে ফেললো।

ঊষার বাবা যদি কায়েসকে বিদায় করে দিতো কিংবা ঊষাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতো, তাহলে কায়েস হয়তো এতোটা প্রভাবিত হতো না। কিন্তু অনিন্দ্যসুন্দরী ও নিবেদিতা কান্তিময় চেহারার অধিকারিনীক ঊষা তার চোখের সামনেই আবেদনময়ী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল। ঊষার বাবা খুবই সৌজন্য এবং সৌহার্দ্য মনোভাব নিয়ে কায়েসের সাথে কথাবার্তা বলছিল আর কায়েস ভাবছিল ঊষাকে পাবার ফন্দি কীভাবে করবে।

এক পর্যায়ে উষার বাবা গযনীর গোয়েন্দা প্রসঙ্গে আলাপ শুরু করে দিল। বললো, 'এরা খুবই ভয়ানক, আমাদের মেলার মধ্যেও এরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা আমাদের দুর্বলতাগুলো সময়ের আগেই মাহমুদকে জানিয়ে দেয়। ফলে মাহমূদ আমাদের দুর্বল জায়গাগুলোতেই আঘাত করে।

আমাদের সেনাবাহিনীতে গযনীর গোয়েন্দা পাকড়াও করার জন্য মোটা অংকের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আমি যদি কোন মুসলিম গোয়েন্দাকে ধরতে পারি, তাহলে তাকে আমি জীবিতাবস্থায় আমার রাজার কাছে পেশ করবো না। তার মাথাটা কেটে নিয়ে যাবো।

একথা শুনে চিন্তিত কায়েসের চিন্তার অবসান হয়ে গেল। সে এবার উষাকে পাবার একটা সোজা পথ পেয়ে গেল। এদিকে উষা একথা শুনে তার বাবার আড়ালে দাঁড়িয়ে কায়েসের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মুচকি হাসল।

এই মুচকী হাসি উষাকে পাবার কায়েসের আকাঙ্ক্ষাকে আরো তীব্র করে তুললো। কায়েস বলে বসলো, "আমি যদি আপনাকে দু'-তিনজন মুসলিম গোয়েন্দা ধরিয়ে দিই, তাহলে কি আমি আপনার কাছে যা দাবী করেছি তা দেবেন?"

আরে তুমি গযনীর গোয়েন্দা পাকড়াও করবে কিভাবে?"

"এ ব্যাপারে আপনি আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।" বললো কায়েস। আপনি তাদের ধরবেন এবং তাদের জীবিত রাখবেন। তাদের জীবিত রাখলে এদের দেয়া তথ্য দিয়ে আপনি গযনীর আরো গোয়েন্দাদেরকে ধরতে পারবেন।"

"কবে ধরিয়ে দেবে তুমি?" জানতে চাইলো উষার বাবা। ওরা কোথায় আছে?"

"এখনই ধরিয়ে দেবো...। আজকের মধ্যেই।" জবাব দিল কায়েস।

"ওরা এই মেলাতেই আছে। যদি আমি তাদের ধরিয়ে দিতে না পারি, তাহলে আপনি আমার মাথা উড়িয়ে দেবেন।"

"সত্যিই যদি তুমি তাদের ধরিয়ে দিতে পারো এবং ধরা পরার পর ওরা গযনীর গোয়েন্দা প্রমাণিত হয়, তাহলে মাথুরার বড় মন্দিরে অনুষ্ঠান করে আমার মেয়েকে আমি তোমার হাতে তুলে দেবো। কিন্তু রাজার কাছ থেকে

পুরস্কার কিন্তু আমি নেবো। তাতে আমার প্রমোশন হবে। আমি আরো বেশী সৈন্যের কমান্ডার হয়ে যাবো।"

"ঠিক আছে, আমি রাজি। আমার সাথে চলুন।"

* * *

গত একটি রাত কায়েসের সাথে হিশাম ও তাশকীনের কোন দেখা-সাক্ষাত হয়নি। হিশাম ও তার আরো দুই সহকর্মী দিনের বেলায় হন্যে হয়ে কায়েসকে খুঁজছিল। তারা সাধুর বেশ ধারণ করেই তুফানের মধ্যে এক মন্দিরে রাতযাপন করেছে।

সন্ধ্যায় কায়েস তাদের আস্তানায় ফেরেনি। তাই দিনের বেলায় তার সহকর্মীরা তাকে তালাশ করতে লাগল। গত রাতের তুফান সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়ার ফলে সেখানে কাউকে খুঁজে পাওয়া সহজ ছিলো না। সারা শহরের গলি ঘুপছিতে হাজার হাজার মানুষ ঠাঁই নিয়ে ছিলো। শহর ও শহরতলী কাদা পানিতে একাকার হয়ে পড়েছিল।

দুপুরের দিকে এক সঙ্গীর সাথে হিশামের দেখা হলো। সে হিশামকে জানালো কায়েসকে সে দেখেছে। সে সাধুর বেশে নেই। সে এমন পোশাক গায়ে জড়িয়েছে যে, দেখে এটিকে তার নিজের পোশাক মনে হয়নি। তার সাথে আরেকজন লোক আছে। লোকটির অবয়ব ও শারীরিক গঠন থেকে বোঝা গেছে সে সেনাবাহিনীর কোন কর্মকর্তা। তার কোমরে তরবারী ঝুলানো। পোশাকে কয়েকটি পদবীর চিহ্ন। লোকটিকে দেখে আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছে। একথা শুনে হিশাম তার সঙ্গীকে বললো, "তুমি আমাদের সাথীদেরকে লুকিয়ে যেতে বলো।"

কায়েসের এক সঙ্গী কায়েসকে দূর থেকে দেখেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। কারণ, কায়েসের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল সন্দেহজনক। তার সঙ্গে থাকা লোকটির ভাবভঙ্গিতে সন্দেহ আরো প্রকট হয়ে উঠেছিল। এসব গোয়েন্দাদের স্বভাব হলো এরা সবকিছুকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। কায়েসের অবস্থা সংশয়পূর্ণ হওয়ায় সে কায়েসের দৃষ্টির আড়ালে থেকে সেখান থেকে সটকে পড়েছিল।

উষার বাবা কায়েসকে সাথে করে তাদের স্বজনদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তারা ঝড়ের মধ্যে যেখানে রাতযাপন করেছিল। সেখানে সে কায়েসকে তাদের কাপড়-চোপড় পরিয়ে তার সঙ্গীদের ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

সঙ্গীর কাছে কায়েসের সন্দেহজনক অবস্থার কথা শুনে তাশকীনের সতর্কবাণী মনে পড়ল হিশামের। তাশকীন তাকে স্বপক্ষের স্থানীয় গোয়েন্দাদের উপর বেশী আস্থা ও নির্ভরতা না রাখার পরামর্শ দিয়েছিল। কারণ, এখানকার মুসলমানরা দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুদের শাসনাধীনে থাকার ফলে হিন্দুদের খাতির তোয়াজ করার অভ্যাসের কারণে সহজেই হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়।

হিশাম তার গোপন আস্তানায় গিয়ে শরীর থেকে সন্ন্যাসীর বাহ্যিক রূপ খুলে ফেলল। শরীরে লাগানো ছাই-ভস্মের প্রলেপ ধুয়ে ফেলল এবং হাজার দানার মালা, ত্রিশূল, লাঠি এবং জটবাঁধা কৃত্রিম দাড়ি খুলে কাপড় বদল করে হিন্দু সৈনিকের পোশাক গায়ে জড়াল। সে একটি খঞ্জর কোমরে গুঁজে কায়েসের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর হিশাম কায়েসকে দেখতে পেল। উষার বাবার সাথে একটি পুরনো দালানের বাইরে আঙিনার একটি খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে সে বসে আছে। হিশাম ভিন্নপথে পুরনো দালানের ভেতরে প্রবেশ করে এদিকে এলো যে কক্ষের বাইরে কায়েস বসে আছে।

কক্ষের একটি জানালার দিকে পিঠ দিয়ে কায়েস ও উষার বাবা বসা ছিল। তারা বাইরের দৃশ্য এবং গমনাগমনরত লোকজনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। হিশাম নিঃশব্দে সেই জানালার কাছে গিয়ে বসে পড়ল। হিশামের বসার জায়গা থেকে কায়েস ও উষার বাবার দূরত্ব তিন-চার হাত মাত্র।

"আপনি হতাশ হবেন না। আমরা ওদেরকে অবশ্যই পেয়ে যাবো। ওরা তিনজন। তিনজনকেই ধরে ফেলা যাবে।" উষার বাবার উদ্দেশ্যে বললো কায়েস।

এ তিনজনের কথা আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু চতুর্থজনের কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।" বললো উষার বাবা। তুমি দাবী করছো, কন্নৌজের মহারাজার একান্ত নিরাপত্তা রক্ষী দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিটিই গযনীর চর। তাছাড়া তুমি তার সামনে না যাওয়ার কথা বলছো।

আমি ভাবছি, মহারাজার একান্ত লোকের বিরুদ্ধে কিভাবে অভিযোগ করবো যে, সে গযনীর চর! কারণ, কন্নৌজের মহারাজা খুবই দূরদর্শী ও পরাক্রমশালী মহারাজা।"

"তাকে পাকড়াও করার ব্যাপারেও আমি আপনাকে কৌশল বলে দেবো।" বললো কায়েস।

"জানালার আড়ালে বসে হিশাম তার জামার নিচ থেকে ধীরে ধীরে খ রটি বের করল। খঞ্জরের আগা বিষে ডোবানো ছিল। এমন বিষ যে কারো শরীরে এর একটু আঁচড় লাগলেই মুহূর্তের মধ্যে মারা যাবে সে।

হিশাম খঞ্জরটি হাতের আড়াল করে দাঁড়াল এবং পূর্ণশক্তি দিয়ে খঞ্জরটি ছুঁড়ে মারল। খঞ্জরটি সোজা গিয়ে কায়েসের পাঁজরে বিদ্ধ হলো। খঞ্জরবিদ্ধ কায়েস উহ্ বলে দাঁড়াল বটে; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল। হিশাম এক মুহূর্ত দেরী না করে জানালার পাশ থেকে সটকে পড়ল এবং অন্য কক্ষে চলে গেল।

ঊষার বাবা ছিল প্রশিক্ষিত সেনাকর্মকর্তা। সে বুঝে ফেলল খঞ্জর কোন দিক থেকে আসতে পারে। সে পুরনো দালানের ভেতরের দিকে দৌড়াল। কিন্তু ততক্ষণে হিশাম অন্য দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে কায়েসের পাঁজর থেকে খ রটি তুলে নিয়ে রাস্তার মানুষের মধ্যে মিশে গেল।

ঊষার বাবা পুরনো দালানের মধ্যে হত্যাকারীকে তালাশ করতে লাগল। আর এদিকে হিশাম যেদিক থেকে এসেছিল ওদিকে চলে গেল। ঊষার বাবা হয়রান হয়ে পুরনো দালানের ভেতরে-বাইরে হত্যাকারীকে তালাশে ব্যস্ত রইল। ততক্ষণে কায়েস মরে গেছে।

* * *

সেই রাতে প্রধান মন্দিরের পুরোহিত সকল রাজা-মহারাজাদের মন্দিরে ডেকে পাঠালো। রাজা-মহারাজাদের ডেকে এনে প্রধান পুরোহিত বললো, 'আমি আপনাদেরকে এই সোনা-রুপার স্তূপ দেখাতে এনেছি।

সোনা-রুপা ও নগদ টাকার বিশাল স্তূপ রাজাদের দেখিয়ে পুরোহিত বললো, গত রাতে তুফানের সময় আমি আপনাদের মাহফিলে ছিলাম। সেই সময় সম্পর্কে মন্দিরে পূজারত পুরোহিতরা আমাকে জানিয়েছে, কৃষ্ণ দেবতার

চোখ প্রথমে নীল বর্ণ ধারণ করে, পরে সাদা এবং রক্তবর্ণ ধারণ করে। এরপরই তার চোখ থেকে এই ভয়াবহ তাণ্ডব ছড়িয়ে পড়ে। মন্দিরের সকল শাখা-ঘণ্টা নিজে থেকেই বাজতে শুরু করে। এর পরপরই শুরু হয়ে যায় ভয়াবহ তুফানের তাণ্ডব।...

"আপনারা কি দেবতাদের ইঙ্গিত বোঝেন না? গত রাতের তুফান ছিল দেবতাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। রাতেই মন্দিরে লোকজন জড়ো হয়ে গিয়েছিল। হাজারো পূজারী দেবীর পদতলে মাথা রেখে কান্নাকাটি করেছে। আমি পরিষ্কার ইঙ্গিত পেয়েছি, যে পর্যন্ত মাহমুদের মাথা কেটে কৃষ্ণদেব ও বাসুদেবের পদতলে রাখা না হবে, ততোদিন পর্যন্ত দেবতাদের ক্ষোভ প্রশমিত হবে না।

গত রাতে এখানে বহু লোক হতাহত হয়েছে। আপনাদেরও হয়তো এমন পরিণতি বরণ করতে হবে। আমি সকল পূজারীকে বলে আসছি, যে পর্যন্ত হিন্দুস্তানে ইসলামের ক্রমসম্প্রসারণের পথ রুদ্ধ করা না হবে, ততোদিন দেবতাদের অভিশাপ আসতেই থাকবে।

আমি পূজারীদের বলেছি, মুসলমানদেরকে চিরদিনের জন্য পরাজতি করার জন্য বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। মন্দিরে আসা সকল নারী তাদের পরনের অলংকার এবং পুরুষেরা তাদের নগদ অর্থের স্তূপ করে ফেলেছে।

এ অর্থ এখনই আমি আপনাদের হাতে তুলে দেবো না। আপনাদের সেনারা যখন গযনীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে, তখন সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার বহন করার বোঝা থেকে আমি আপনাদের নিষ্কৃতি দেবো।

যুদ্ধের পুরো ব্যয়ভার বহন করবে মাথুরার প্রধান মন্দির। কারণ, আপনাদের জয় আমার জয়, আপনাদের পরাজয় আমার পরাজয়। ভগবান আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি আপনাদের অন্তরে সনাতন ধর্মের মর্যাদা, ভালোবাসা এবং ইসলামের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি কি না!"

মনে রাখবেন, সেই দলই বিজয় লাভ করে, যাদের হৃদয়ে শত্রু ও শত্রুবাহিনীর ধর্মের প্রতি ঘৃণা আছে। ঘৃণা একটি বিরাট শক্তি। এতো দূরে এসেও মুসলমানরা আপনাদের পরাজিত করে যায় এর মূল কারণ হলো তাদের অন্তর আপনাদের প্রতি ঘৃণায় ভরা থাকে।

মুসলমানরা আমাদের ধর্মকে মিথ্যা মনে করে। এখন আপনাদেরই প্রমাণ করতে হবে আমাদের ধর্ম সত্য। আপনাদেরকে গযনী সেনাদের উপর আসমানী গযব হয়ে উঠতে হবে।"

দীর্ঘ জ্বালাময়ী বক্তৃতায় প্রধান পুরোহিত রাজা মহারাজাদের অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা এবং ইসলাম বিদ্বেষে উস্কে দেয়ার পব আশ্বাসবাণী শোনালো, "ভগবান আমাকে ইশারা দিয়েছে মুসলমানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে।"

দীর্ঘ ভাষণের পর পণ্ডিত বসে পড়লে লাহোরের মহারাজা জয়পাল, কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপাল, মহাবনের রাজা কুয়াল চন্দ্র ছাড়াও বুলন্দশহরসহ ছোট বড় সকল রাজা-মহারাজাদের সেই ঐতিহাসিক বৈঠক হলো, যে বৈঠকের কারণে মুসলমান মাহমুদকে ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিল। সুলতান মাহমূদ রাজাদের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের বিপরীতে এমন ঐতিহাসিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, সমরবিশারদগণ সেই অভিযানকে অভাবনীয় বলে অভিহিত করেন।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিক স্যার আর্লস্টেন লিখেছেন, "সুলতান মাহমূদ গযনী থেকে মাথুরা পর্যন্ত প্লাবনের মতো একটির পর একটি দুর্গ জয় করে এগিয়ে এলেন এবং শেষ পর্যন্ত কন্নৌজের মাথুরাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করলেন।"

তৎকালীন ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তার এই অবিস্মরণীয় সাফল্য ও বিজয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তার গোয়েন্দা বাহিনীর। তিনি ভারতের রাজা মহারাজাদের সমর প্রস্তুতির পূর্ণ খবর জায়গায় বসেই পেয়ে যেতেন। যার ফলে তিনি বিদ্যুদ্বেগে অগ্রাভিযান চালাতেন এবং প্রতিপক্ষকে অপ্রস্তুত অবস্থায় এসে চেপে ধরতেন।

* * *

লাহোরের মহারাজা ভীমপাল এবং কালাঞ্জর (কোটলী কাশ্মীর) এর রাজা জানকি বাহ্মী সুলতান মাহমূদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল যে, ভীমপাল গযনীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার সামরিক তৎপরতা চালাবে না। হিন্দুস্তানে গযনী সৈন্যদের যতো ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন

হবে সেই সহযোগিতা দিতে বাধ্য থাকবে। কোটলী কাশ্মীরের রাজারও সুলতানের সাথে একই ধরনের চুক্তি হয়েছিল।

১০১৭ সালের বর্ষা মওসুমের পূজা উৎসবে হিন্দুস্তানের অন্যান্য রাজাদের মতো এই দুই রাজাও মাথুরার প্রধান মন্দিরে বসে গযনী বাহিনীকে পরাজিত করে গযনীকে ধ্বংস করার নীলনক্সা প্রণয়নে শামিল ছিল।

রাজা ভীমপাল সেই রাজাদের বৈঠকে পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি প্রকাশ্যে থাকবেন না, কিন্তু অন্তরালে সবধরনের সহযোগিতা করবেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, তিনি ও তার খান্দান এ পর্যন্ত সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে তিনবার লড়াই করেছে, আর কেউ তা করেনি।

এসব যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির সবই তার নিজস্ব তহবিল থেকে নির্বাহ করতে হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়েই তাকে সুলতান মাহমুদের সাথে অধীনতামূলক চুক্তি করতে হয়েছে।

এই মহাপরিকল্পনার শীর্ষ দায়িত্ব দেয়া হলো কন্নৌজের মহারাজার উপর। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এই মহাপরিকল্পনার দায়িত্ব পালনের সবচেয়ে উপযুক্ত ছিলেন কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপাল।

তিনি ছিলেন দক্ষ সমরবিশারদ। তার সামরিক শক্তিও ছিলো অন্যদের চেয়ে বেশী। উত্তর ভারতে কন্নৌজের মহারাজাকে সম্মানের চোখে দেখা হতো। বস্তুত তাই সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ডারের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো কন্নৌজের মহারাজার উপর।

মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রত্যেক রাজা-মহারাজা তাদের অর্ধেক সৈন্য সম্মিলিত বাহিনীতে দেবে আর বাকী অর্ধেক সৈন্য নিজেদের হাতে বিভিন্ন দুর্গের সুরক্ষা এবং সুলতান মাহমুদের জবাবী আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

সম্মিলিত বাহিনী পেশোয়ারের দিকে অগ্রাভিযান চালাবে এবং সুলতান মাহমুদকে খায়বর দুর্গের পার্শবর্তী ময়দানে মুখোমুখি হতে বাধ্য করা হবে। এর আগে সৈন্যদের কিছু অংশ বিভিন্ন পাহাড়ী গিরিপথে নিয়োগ করা হবে। যাতে সুলতান মাহমুদের বাহিনীকে আগমন পথেই চোরাগুপ্তা আক্রমণ করে দুর্বল করে দেয়া হবে।

এই পরিকল্পনায় সবাই ঐক্যমত্য পোষণ করে। সব রাজা-মহারাজা কৃষ্ণ ও বাসুদেব মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রত্যেকেই নিজেদের জীবনও সম্পদ অকাতরে ব্যয় করবে।

আমীর বিন তাশকীন কন্নৌজের মহারাজার একান্ত নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে বৈঠকে হাজির ছিল। শুধু কন্নৌজের মহারাজা নয়, আরো কয়েকজন রাজা মহারাজার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীও নির্বিকার মূর্তির মতো নিজ নিজ রাজাদের পেছনে দণ্ডায়মান ছিল।

মাথুরা থেকে প্রায় একশ মাইল দূরে পূর্ব-উত্তরে রামগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত বুলন্দশহর। তখন এটি ছিল একটি রাজ্যের রাজধানী। বলন্দ শহরের রাজা হরিদত্ত এই মহাবৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের এক পর্যায়ে রাজা হরিদত্ত বললেন, মুসলমানরা কেন প্রতিবারই সাফল্য পায়, প্রতিক্ষেত্রেই তাদেরই কেন জয় হয়।

আমাদেরকে ভাবতে হবে কোন জাদু বলে মুসলমানরা জয়লাভ করে, আর আমাদের মধ্যে কী ঘাটতি রয়েছে....। আজ আমি আপনাদেরকে তাদের একটি গুণ সম্পর্কে অবহিত করতে চাই। গযনীর গোয়েন্দাব্যবস্থা খুবই জোরদার। গোয়েন্দারাই গযনী বাহিনীর সবচেয়ে বড় শক্তি।

আমি আপনাদের একথাও বলে দিতে পারি, এখানেও গযনীর গোয়েন্দা রয়েছে এবং আমাদের সব কথাই সে শুনছে। গতরাতের ঝড়ে বেশ কিছু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে, জানা গেছে, আজ একজন গযনী গোয়েন্দাকে তার সহকর্মীরাই হত্যা করেছে।

আমার এক সেনাকর্মকর্তা ঘটনাক্রমে এক গযনীর গোয়েন্দার আসল রূপ জানতে পেরেছিল। সেই গোয়েন্দা তার তিন সহকর্মীকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে এক খঞ্জরের আঘাতে সে মারা যায়। হত্যাকারীকে ধরা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তা থেকেই আপনারা বুঝতে পারেন মুসলমানদের গোয়েন্দাব্যবস্থা এবং তাদের শক্তি কত। রাজা হরিদত্ত ঊষার বাবার কাছে শোনা কায়েসের ঘটনা সবিস্তারে ব্যক্ত করলেন এবং ঊষা ও কায়েসের মধ্যে ঘটে যাওয়া আকস্মিক আকর্ষণ, উদ্ধার ও একজন অপরজনকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতার কথাও সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। অবশেষে রাজা হরিদত্ত বললেন, 'মৃত গোয়েন্দা এমন

এক গযনী গোয়েন্দার কথা জানিয়েছে, যার নাম উল্লেখ করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। কারণ, সেই গোয়েন্দা এমন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, যদি অভিযোগ সত্য না হয়, তাহলে আমাদের মধ্যে শত্রুতা, ভুল বোঝাবুঝি ও অনৈক্য সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

রাজা হরিদত্ত আড়চোখে একবার আমীর বিন তাশকীনের দিকে তাকালেন। আমীর বিন তাশকীন নির্মোহ নির্বিকার চিত্তে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। হরিদত্তের কথায় সে ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল বটে; কিন্তু দৃশ্যত ভাবলেশহীন নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েকজন রাজা-মহারাজা হরিদত্তকে আলোচিত গোয়েন্দার নাম উল্লেখ করার তাকীদ দিলেন। কিন্তু রাজা হরিদত্ত বললেন, বিষয়টি তিনি আগে ব্যক্তিগতভাবে নিরীক্ষা করবেন। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হলে সেই গোয়েন্দাকে সবার সামনে হাজির করবেন।'

রাজা-মহারাজাদের সেই ঐতিহাসিক বৈঠক শেষে কন্নৌজের মহারাজা রাজা হরিদত্তকে বললেন, যেহেতু তাকে সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর চীফ কমান্ডার এর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, এজন্য এতো উঁচু পর্যায়ে কোথায় গযনীর গোয়েন্দা রয়েছে বিষয়টি তার জানা খুবই দরকার।

রাজা হরিদত্ত বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ, আমীর বিন তাশকীন তাদের সাথেই আসছিল। ঝড় মহারাজাদের তাঁবুগুলো উড়িয়ে নেয়ার পর শহরে তাদের জন্য বাড়ি খালি করানো হলো।

মহারাজা কন্নৌজের জন্য যে বাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছিল, তিনি সেই বাড়িতে রাজা হরিদত্তকে নিয়ে গেলেন এবং জগন্নাথরূপী আমীর বিন তাশকীনকে ছুটি দিয়ে দিলেন।

চম্পা ছিলো কন্নৌজ মহারাজার সবচেয়ে প্রিয় রাণী। সে মহারাজার আগমন অপেক্ষায় প্রহর গুণছিল। রাজা হরিদত্তকে সাথে নিয়ে মহারাজা তার কক্ষে প্রবেশ করলে চম্পারাণী আপ্যায়নের শুরুতেই তাদের শরাব ঢেলে দিল এবং মহারাজার সান্নিধ্যে বসে গেল। রাজা হরিদত্ত সন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতে চম্পার দিকে তাকালে মহারাজা রাজ্যপাল হরিদত্তের সংশয়পূর্ণ দৃষ্টি বুঝে ফেললেন। কারণ, চম্পার উপস্থিতিতে রাজা হরিদত্ত আসল কথা না বলে প্রসঙ্গ ঘোরানোর চেষ্টা করছিলেন।

মহারাজা চম্পার উদ্দেশে বললেন, 'আমরা দুজন একটা জরুরী বিষয়ে কথা বলবো, তুমি কিছুক্ষণের জন্য অন্য ঘরে থাকো।

চম্পা মহারাজার নির্দেশে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো বটে; কিন্তু কী কথা হবে তাদের মধ্যে? এই কৌতূহলে সে দরজার আড়ালে তাদের কথাবার্তা শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল।

'আমি আপনাকে এই কথাই বলতে চাই যে, মন্দিরে আমি যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিলাম' বলে কথা শুরু করলো রাজা হরিদত্ত। আমার এক সামরিক কর্মকর্তা আমাকে জানিয়েছে, জগন্নাথ নামের আপনার একান্ত নিরাপত্তারক্ষী আসলে জগন্নাথ নয়, আমীর বিন তাশকীন। সে গযনীর উচ্চ পর্যায়ের একজন দক্ষ গোয়েন্দা। যে গোয়েন্দা ওদেরই কারো হাতে নিহত হয়েছে, সেই আমার কর্মকর্তাকে একথা বলেছিলো। হয়তো আমার একথা আপানার পছন্দ নাও হতে পারে। তবে...।

'আপনার কথা আমার কাছে মোটেও মন্দ মনে হয়নি' হরিদত্তের অসম্পূর্ণ কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দিলেন মহারাজা। কিন্তু ব্যাপারটি আমার কাছে বিস্ময়কর লাগছে যে, কোন ভিনদেশের গোয়েন্দা আমাকে এভাবে ধোঁকা দিতে পারে। আমি আপনার এই অভিযোগকে মোটেও অস্বীকার করবো না, বিষয়টি আমি এখনই যাচাই করবো।"

রাজা হরিদত্ত আরো বললেন, সুন্দরী নারী আপনার জন্য অভাব হওয়ার কথা নয়। আমি এ কথাও জানতে পেরেছি, আপনার প্রিয় চম্পারানী ও আপনার এই ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীর মধ্যে গোপন সম্পর্ক রয়েছে। সেদিন আপনার ছোট রাণীর যে সেবিকা রাণীর সাথে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল, তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেই আপনি এর সত্যতা যাচাই করতে পারবেন। আমার সন্দেহ হয়, চম্পা ও এই নিরাপত্তারক্ষী দু'জনে আপনার জন্য একটা মায়াবীনি প্রতারণা হয়ে বিরাজ করছে।"

'হরিদত্ত! আমাকে বিষয়টি একটু খোলাসা করে বলুন। আমি এখনই সেবিকাকে আপনার সামনে ডেকে আনছি। আর সকালেই আপনি নিরাপত্তারক্ষী ও চম্পার লাশ দেখতে পাবেন।'

বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর জন্য আমি আমার সেই সামরিক কর্মকর্তাকে সাথেই নিয়ে এসেছি। সে বাইরে দাঁড়ানো আছে। আপনি গোয়েন্দা

সম্পর্কে তার মুখেই শুনতে পারেন, বলে রাজা হরিদত্ত চম্পা ও তাশকীনের গোপন সম্পর্কের বিস্তারিত বলতে শুরু করলো।

দুই রাজার একান্ত কথোপকথন দরজার আড়াল থেকে শুনে চম্পা পা টিপে টিপে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে এলো এবং বিদ্যুদ্বেগে তাশকীনের কক্ষে প্রবেশ করল।

"এখনই বের হও এবং ঘোড়া বের করো'। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তাশকীনকে বললো চম্পা। আমাদের দু'জনের গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে।"

"কী রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে? কী বলছো তুমি?" চম্পাকে উৎসুক্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো তাশকীন।

"আরে এতোকিছু জানতে চেয়ো না, আগে পালানোর ব্যবস্থা করো। আবারো উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো চম্পা। বুলন্দশহরের রাজা হরিদত্ত মহারাজাকে বলেছে, তুমি জগন্নাথ নও গযনীর মুসলমান আমীর বিন তাশকীন।... সে মহারাজাকে আমাদের দু'জনের গোপন সম্পর্কের কথাও জানিয়ে দিয়েছে। মহারাজা এখনই আমার একান্ত সেবিকাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

"তুমি কি আমাকে ধরিয়ে দিতে এসেছো, না আমাকে এখান থেকে বের করে দেয়ার জন্য এসেছো?" চম্পাকে জিজ্ঞেস করল তাশকীন।

"বেশী কিছু জিজ্ঞেস করে সময় নষ্ট করো না। জলদি করো। আমি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে এসেছি। তাড়াতাড়ি করো। আমাকে একটা চাদর দাও। আমি আমার শরীর ঢেকে ফেলবো। জলদি করো, ওরা হয়তো তোমাকে খুঁজতে এখানে এসে যাবে।"

"ওরা যা বলছে, তা ঠিকই আছে চম্পা।" এতোদিন আমি তোমার কাছেও আমার প্রকৃত পরিচয় গোপন করেছিলাম। আমি মুসলমান। আমার নাম আমীর বিন তাশকীন। এ কথা শোনার পরও কি তুমি আমার সাথে যাবে? ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাবে?"

"আমি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে এবং তোমার সাথেই মরতে এসেছি। ধর্ম আমার কাছে বড় বিবেচ্য বিষয় নয়। এখন তুমিই আমার সব। তুমি যা বিশ্বাস কর আমিও তাই করি। আর দেরী নয়, জলদি কর, আমাকে চাদরটা দাও।'

তাশকীন একটি চাদর চম্পার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে কোমরে তরবারী ঝুলিয়ে নিল এবং তার বিশেষ খঞ্জরটিও কোমরে গুঁজে নিল। এরপর চম্পাকে নিয়ে আস্তাবলের দিকে অগ্রসর হলো।

এদিকে মহারাজা ক্ষুব্ধকণ্ঠে তার দ্বাররক্ষীদের নির্দেশ দিলেন, এক্ষুনি চম্পা ও তার একান্ত নিরাপত্তারক্ষী জগন্নাথকে হাজির করা হোক।

তাশকীন একটি অন্ধকার জায়গায় চম্পাকে দাঁড় করিয়ে রেখে যেখানে সামরিক ঘোড়া বাঁধা থাকে, সেদিকে অগ্রসর হলো। সেনাদের মধ্যে জগন্নাথরূপী তাশকীনের মর্যাদা এমন ছিল যে, তার নির্দেশ কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই সবাই মানতে বাধ্য ছিল। এই অবস্থান সে অনেকটা নিজের আচরণ, বুদ্ধিমত্তা এবং পদবী দিয়ে তৈরী করে নিয়েছিল।

সে ঘোড়ার সহিসকে বললো খুব তাড়াতাড়ি তুমি ঘোড়াটিকে জীন বেধে দাও।

এদিকে রাজমহল তল্লাশি করে মহারাজাকে জানানো হলো, চম্পা রাণীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ বলতে পারছে না তিনি কোথায় আছেন।

মহারাজা নির্দেশ দিলেন, জগন্নাথ ও চম্পারাণীকে দ্রুত খুঁজে বের করো। ওরা যদি পালাতে চেষ্টা করে, তবে যেখানেই পাবে সেখানেই ওদের খতম করে দেবে।

মহারাজার নির্দেশ পেয়ে তার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দশবারজন সৈনিক দৌড়াল। তখন রাত অন্ধকার হয়ে গেছে। একটি জ্বলন্ত মশাল থেকে তারা আরো তিন-চারটি মশাল জ্বালিয়ে নিল।

এদিকে তাশকীনের ঘোড়ায় তখন জীন বাঁধা হয়ে গেছে। সে দ্রুত ঘোড়াটিকে নিয়ে চম্পাকে যেখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, ওখানে পৌছল। সে চম্পাকে তার পেছনে আরোহণ করিয়ে যেই পালানোর জন্য ঘোড়াকে ঘুরালো, তখন দেখতে পেল চার-পাঁচটি মশাল জ্বালিয়ে একদল অশ্বারোহী দৌড়ে এদিকে আসছে।

শহরের প্রধান গেট খোলা ছিল বটে; কিন্তু এ মুহূর্তে প্রধান গেট দিয়ে তাদের বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। তাশকীন আবার ঘোড়া ঘুরিয়ে ছুটতে শুরু করলেই রাজার নিরাপত্তা রক্ষীরা তাকে হুমকি দিল।

দাঁড়িয়ে যাও, নয়তো এক্ষুনি তীর ছোঁড়া হবে। কিন্তু তাশকীন দাঁড়াবার পাত্র নয়। সে থামল না, ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। একটু এগুতেই চম্পা আর্তচিৎকার দিয়ে উঠলো। চিৎকার দিয়ে চম্পা বললো, আমার পিঠে দুটি তীর বিদ্ধ হয়েছে। বলেই সে ঘোড়া থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল।

আরো একটু এগুতেই তাশকীনের ঘোড়া হ্রেষারব করে উঠলো এবং তার গতি শ্লথ হয়ে গেল। তাশকীন বুঝতে পারল ঘোড়াও তীরবিদ্ধ হয়েছে। ঘোড়া যখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল তখন ছুটন্ত ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল তাশকীন। তার দু'পাশ দিয়ে শোঁ শোঁ করে দুটি তীর ছুটে গেল। ভাগ্যগুণে তার মাথা অক্ষত রয়ে গেল।

এরপর একটি সংকীর্ণ গলিতে ঢুকে পড়ল তাশকীন এবং পশ্চাদ্ধাবনকারীদের আগেই গলির দু-তিনটি মোড় পেরিয়ে গেল। এ সময়ে চম্পার কথা তার ভাবার অবকাশ ছিল না। কারণ, বিষাক্ত তীরের আঘাতে ততোক্ষণে বেচারী হয়তো মরে গেছে। চম্পার খুনের বদলা নেয়ারও তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ, সে এসেছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে, এজন্য নিজেকে রক্ষা করে যে করেই হোক গযনী পৌঁছাই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য।

তাশকীন জানতো, শহরের সীমানা প্রাচীরের একটি অংশ একেবারে নদীর তীর ঘেঁষে রয়েছে। তখন বর্ষাকাল, এমনিতেই নদীতে পানি ছিল বেশী। তদুপরি পূর্বরাতের প্রবল বর্ষণে নদীর পানি সীমানা ছুঁই ছুঁই করছিল। তাশকীনকে পশ্চাদ্ধাবনকারীরা ধর ধর, গেল গেল, ওই দিকে, এ দিকে, ইত্যাকার চিৎকার ও চেঁচামেচি করে আসছিল।

তাশকীন ইতোমধ্যে একটি দালানের উপরে উঠে গেল, যে দালানের ছাদ সীমানা প্রাচীরের বরাবর যুক্ত ছিল। নীচে নিরাপত্তা রক্ষীদের হৈ চৈ শুনে সীমানা প্রাচীরের উপরে অবস্থানরত দুই প্রহরী তাশকীনের পথ আগলে দাঁড়াল। তাশকীন এক প্রহরীর কাছে গিয়ে তরবারী ওর পেটে ঢুকিয়ে দিলে অপর প্রহরী দৌড়ে পালাল।

এদিকে মশালধারী সৈন্যরা সীমানা প্রাচীরের কাছে চলে এলো। তাশকীন দেয়ালে উঠে নদীর দিকে অগ্রসর হলো এবং যেখানে দেয়াল একেবারে নদীর তীর ঘেঁষে সেখানে পৌঁছে, সে সীমানা প্রাচীরের উপর থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পশ্চাদ্ধাবনকারীরা আর তার নাগাল পেল না।

* * *

মাথুরা থেকে গযনীর দূরত্ব প্রায় সাতশ মাইল। পথিমধ্যে অন্তত সাতটি বড় নদী রয়েছে। তাছাড়া বেশীর ভাগ পথই ছিল পাহাড়ী। তৎকালীন ঐতিহাসিকদের মতে একজন সক্ষম মানুষের পক্ষে এ পথ পাড়ি দিতে অন্তত তিনমাস সময়ের প্রয়োজন ছিল।

* * *

সুলতান মাহমূদ গযনবী এর আগেই খাওয়ারিজমকে গযনী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। খাওয়ারিজমের অনুগত সৈন্যদেরকে তিনি গযনী সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাছাড়া খাওয়ারিজম যুদ্ধে লোকবলের ঘাটতি পূরণে তিনি সেনাবাহিনীতে ভর্তির বিষয়টিতে জোর দেন।

তিনি মসজিদে মসজিদে এই ঘোষণা জারি করেন যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময় হিন্দুস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হতে চলেছিল। কিন্তু সেখানকার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর মুসলমানরাও এখন পৌত্তলিকতার পদতলে পিষ্ট হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, মুসলমানদের আয়ের উৎসগুলোকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য সেখানে প্রতিনিয়ত সামরিক শক্তি সঞ্চয় করছে।

ইসলামের পয়গামকে দুনিয়ার কোণে কোণে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত।

সেই সাথে হিন্দুস্তানের বুতখানাগুলো থেকে বুত অপসারণ করে অগণিত বনী আদমকে পৌত্তলিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করাও আমাদের ঈমানী কর্তব্য। পৌত্তলিকতা এমন এক ভয়ানক চক্র, এদেরকে যদি ধ্বংস করে দেয়া না যায়, তবে এরা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কঠিন মুসীবত হয়ে দেখা দেবে।'

মসজিদগুলোতে ইমাম ও খতীবগণ সুলতানের এই ঘোষণার আলোকে মানুষকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে উৎসাহিত করতেন। কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে আবেগময়ী ভাষায় প্রদত্ত খতীব ও ইমামদের এসব উজ্জীবনীমূলক বক্তব্য শুনে সাধারণ মুসলমানরা উজ্জীবিত হলেন এবং দেশের প্রতিটি জনপদে তার এই ঘোষণা আলোচনার প্রধান বিষয়ে পরিণত হলো।

সুলতান আরো ঘোষণা করলেন, রাষ্ট্র পরিচালনা খুবই স্পর্শকাতর এবং কঠিন কাজ। এই কঠিন দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা আমার উপর অর্পণ করেছেন। শুধু শাসন করা সুলতানের কাজ নয়। জাতি ও গণমানুষের জীবন-জীবিকা সুচারুরূপে চালানোর জন্য সহায়তা করা, তাদের সঠিক নিরাপত্তা দেয়া এবং জাতির মান-মর্যাদা সমুন্নত রাখা সুলতানের অন্যতম কর্তব্য। তবে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো, এই পরিমাণ সামরিক শক্তি সঞ্চয় করা দরকার ইসলামের শত্রুরা যতো শক্তিশালী হোক না কেন যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। কোন মুসলিম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর যদি জুলুম-অত্যাচার হতে থাকে, তবে যে কোন মুসলিম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উচিত মজলুমদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া এবং দেশ ও জাতিকে নিয়ে মজলুমদের নিরাপত্তা বিধানে জিহাদ করা।

এই মুহূর্তে আমার খুব দরকার জাতির সিংহ-শার্দূলদের সহযোগিতা। হে গযনীর সিংহ শার্দূলেরা! তোমরা এসো! আমি তোমাদের নিয়ে মৃত্যুর আগে এই কর্তব্য পালন করতে চাই।"

সুলতান মাহমূদ যেমন ছিলেন একজন বিচক্ষণ ক্ষণজন্মা সমরনায়ক, তেমনই ছিলেন একজন দক্ষ শাসক। হিন্দুস্তানের বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি যে সহায়-সম্পদ কব্জা করতেন, এগুলোর একটি অংশ তিনি সেনাদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন এবং একটি বড় অংশ খরচ করতেন শিক্ষা ও জনগণের সেবায়, গণমানুষের জীবন-মান উন্নয়নে। তার শাসিত সালতানাতে যেহেতু গণমানুষ সুখ-সাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করতো। এজন্য সুলতানের প্রতিটি নির্দেশেই ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করত।

১০১৭ সালের শেষ দিকে তিনি সেনাবাহিনীতে নতুন লোক ভর্তির জন্য দেশব্যাপী মহড়া শুরু করে দিলেন। তিনি তার সেনা কমান্ডারদের বলতেন, আমাকে আমার পিতার উপদেশ পালন করতে হবে।

তিনি বলতেন, তোমাকে হিন্দুস্তানের বুতখানাগুলো ধ্বংস করে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। আমি স্বপ্নেও বারবার এ কাজের জন্য তাগিদ পেয়েছি। আমার পীর ও মুর্শিদ শায়খ আবুল হাসান খিরকানীও এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। মনে হয় আমার জীবন আর বেশী দিন নেই। মৃত্যুর আগে আমি এই কাজটি শেষ করে যেতে চাই।

* * *

বেশ কিছু দিন থেকে সুলতান হিন্দুস্তান থেকে নতুন খবরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি একথা জানার জন্য উদগ্রীব ছিলেন যে, হিন্দুস্তানের রাজা মহারাজারা তার বিরুদ্ধে জঙ্গী তৎপরতা চালাচ্ছে। ১০১৭ খৃষ্টাব্দ শেষ হলো। ১০১৮ সাল শুরু হয়ে গেলো। কিন্তু তখনও তিনি নতুন কোন সংবাদ পাচ্ছিলেন না।

একদিন তাকে খরব দেয়া হলো, হিন্দুস্তান থেকে আমীর বিন তাশকীন নামের একজন লোক এসেছে।

'তাশকীন এসেছে!' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন সুলতান। তাকে জলদি এখানে নিয়ে এসো।

তাশকীন যখন সুলতানের কক্ষে প্রবেশ করল, তখন তাকে দেখে বিস্ময়ে সুলতান পেছনে সরে গেলেন। তার চেহারা নীল হয়ে গিয়েছিল এবং তাকে মনে হচ্ছিল একটি জীবন্ত কংকাল।

তার শরীরে ধুলোর আস্তরণ। চেহারা দেখে মোটেই চেনা যাচ্ছিল না, এটিই তুখোড় গোয়েন্দা আমীর বিন তাশকীন। তার কোমর ভেঙে গিয়েছিল। সে পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে পারছিলো না। সুলতান তাকে একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসালেন এবং শীঘ্রই তার জন্য খাদ্য পানীয় আনার জন্য নির্দেশ দিলেন।

'আমি তিন মাসের পথ দেড় মাসে অতিক্রম করেছি সুলতান। কাঁপা কাঁপা ক্ষীণকণ্ঠে বললো তাশকীন। মাথুরাতে আমার ধরা পড়ার উপক্রম হয়েছিল। আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতে আমি বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি।

আমি এক পর্যায়ে একটি ঘোড়া চুরি করে মরতে মরতে বেঁচে গেছি এবং পালিয়ে এসেছি। ঘোড়ার প্রয়োজনে একটি নিরপরাধ লোককে হত্যা করতে হয়েছে। সাঁতরে প্রমত্তা নদী পার হতে হয়েছে। দেড় মাস পর্যন্ত আমি ঘোড়ার উপরই খেয়েছি এবং ঘোড়ার উপর বসেই ঘুমিয়েছি...। আপনি একটি হিন্দুস্তানের মানচিত্র আনান।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাশকীনের জন্য খাদ্য-পানীয় হাজির করা হলো। সুলতানের নির্দেশে তাশকীন কিছুটা খাদ্য এবং পানীয় পান করে শরীরটাকে একটু তাজা করে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে বসলো।

হিন্দুস্তানের সকল রাজা-মহারাজারাদের নাম ধরে ধরে তাশকীন বলতে লাগল, যারা ম.থুরার মন্দিরের বিশেষ বৈঠকে শরীক হয়েছিল। তাশকীন সুলতানকে তাদের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা জানিয়ে মানচিত্রে হাত দিয়ে দেখাতে লাগল, কোথায় কন্নৌজ মাথুরা, বুলন্দশহর এবং মহাবন।

তাশকীন সুলতানকে জানাল, এলাকাটি ঘন জঙ্গলাকীর্ণ হওয়া ছাড়াও প্রমত্তা গঙ্গা ও যমুনা নামের দু'টি নদী খুবই ভয়ানক। অতঃপর মাথুরা ও মহাবন। বুলন্দশহরের আশে পাশের ছোট ছোট দুর্গগুলোর অবস্থান দেখিয়ে বললো, এগুলোতে সম্মিলিত বাহিনীর বাইরে প্রত্যেক রাজা-মহারাজারা তাদের অর্ধেক সৈন্যকে প্রহরায় নিয়োগ করবে।

আপনি ভীমপালের পিতা জয়পালকে পেশোয়ারের যে ময়দানে পরাজিত করেছিলেন, সম্মিলিত বাহিনী এখানে এসে আপনার মোকাবেলা করতে চায়। তারা লুঘমান পর্যন্ত প্রতিটি গিরিপথে ওদের সৈন্য বসিয়ে রাখবে, আমাদের সেনাদের ঘায়েল করতে এবং চোরাগুপ্তা হামলা করে আমাদের জনবল ধ্বংস করে দিতে। তারপরও যদি আমাদের সৈন্যরা বাঁধা পেরিয়ে এগিয়ে যায়, তবে ছোট ছোট দুর্গগুলোর রিজার্ভ সৈন্যরা আমাদের সেনাদের পথরোধ করবে।'

'লাহোরের ভীমপালের ইচ্ছা কী?' তাশকীনকে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

"ভীমপাল আপনাকে খুব ভয় করে। তবে নেপথ্যে সে ওদের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতায় আছে।" বললো তাশকীন।

"এমনটি তো তার করা উচিত।' বললেন সুলতান। কারণ, পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করতে কে না চাইবে? হিন্দুস্তানের রাজপুতরা খুবই সাহসী ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। তাশকীন! তুমি কি বলতে পারো কবে নাগাদ সম্মিলিত বাহিনী একত্রিত হবে এবং অভিযান শুরু করবে?'

'ওদের প্রস্তুত হতে কমপক্ষে এক বছর লাগবে সুলতান। অবশ্য মাথুরার প্রধান পুরোহিত দ্রুত অভিযানের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে তাকীদ দিচ্ছে।

'ওরা লুঘমান আর পেশোয়ারে পৌছার জন্য আমরা অপেক্ষা করবো না।' বললেন সুলতান। আমরা মাথুরা ও কন্নৌজেই ওদের মুখোমুখি হবো...। তাশকীন। তুমি পুরো একমাস বিশ্রাম করো। তোমার শরীরের উপর দিয়ে মারাত্মক ধকল গেছে। এ কাজের জন্য তোমাকে মোটা অংকের পুরস্কার দেয়া হবে। অচিরেই পুরস্কার তোমার বাড়ীতে পৌছে দেয়া হবে। বললেন সুলতান।

তুমি চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে শরীরটাকে ঠিক করে নাও। এরই মধ্যে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি।

সুলতান মাহমূদ সব সময় তার সেনাপতি ও সেনা কমান্ডারদের বলতেন, শত্রুদেরকে তাদের প্রস্তুতিরত অবস্থাতেই গিয়ে আক্রমণ করবে। এবারও তিনি সেনাপতি এবং কমান্ডারদের ডেকে বললেন, শত্রুদেরকে প্রস্তুতরত অবস্থায় গিয়ে পাকড়াও করতে হবে।

শত্রুদের কখনো আক্রমণের সুযোগ দেয়া যাবে না। আমি আপনাদের আগেই বলেছি, হিন্দুস্তানের সকল রাজা-মহারাজা আমাদের বিরুদ্ধে মহা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা তাদেরকে এমন অবস্থায় গিয়ে পাকড়াও করতে চাই, যখন তারা সম্মিলিত বাহিনী তৈরীর জন্য সফরে থাকবে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে মাথুরা।

আমীর বিন তাশকীন আমাকে জানিয়েছে, মাথুরার বুতকে নাকি খুবই পবিত্র মনে করা হয় এবং মাথুরাই হলো তাদের প্রধান দেবতা শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি। শ্রীকৃষ্ণকে হিন্দুরা পয়গম্বর মনে করে।

তাশকীন আমাকে বলেছে, মাথুরায় শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বানানো হয়েছে মর্মর পাথর দিয়ে এবং কৃষ্ণমূর্তির দুটো চোখ নাকি খুবই দামী হীরের তৈরী। গোটা হিন্দুস্তানের হিন্দুরাই নাকি কৃষ্ণমূর্তির পূজার জন্য মাথুরা গমন করে।'

আমাদেরকে দ্রুত অভিযানে নামতে হবে। এবার আমরা পাঞ্জাব হয়ে যাবো না। পাঞ্জাবের মহারাজা আমাদের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সে পূর্বের অবস্থানে নেই। রাজা ভীমপালও নাকি এই আক্রমণ প্রস্তুতিতে পুরোপুরি সহযোগিতা দিচ্ছে।

এবার আমাদের সফর হবে কাশ্মীর হয়ে। পাঞ্জাবের পাশ দিয়ে অবস্থিত কাশ্মীরের পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে আমরা অগ্রসর হবো।

তোমাদের মনে রাখতে হবে, পথে আমাদের অন্তত সাতটি নদী পার হতে হবে। ছোট বড় অনেক পাহাড় ও জঙ্গল দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। আরো মনে রাখতে হবে, আমরা নিজের দেশ থেকে অনেক দূরে গিয়ে লড়াই করবো। সেখানে আমাদের কোন রসদ সাহায্য মিলবে না এবং কোন আসবাবপত্রের চালানও আমরা পাবো না। রাস্তা থেকেই আমাদের রসদ সংগ্রহ করতে হবে।

সুলতান মাহমূদ হিন্দুস্তানের মানচিত্র সামরিক কর্মকর্তাদের দেখিয়ে বললেন, 'আমরা এই পথ দিয়ে অগ্রসর হবো। মাথুরা আমাদের লক্ষ্যবস্তু হলেও শুরুতে আমরা মাথুরাকে এড়িয়ে যাবো। মাথুরা আক্রমণের আগে আশপাশের ছোট ছোট রাজ্য ও দুর্গগুলোকে দখল করে নেবো।

আমাদের এ অভিযান কিন্তু সহজ হবে না। বললেন সুলতান। আমাদেরকে জীবন বাজি রাখতে হবে। কন্নৌজের মহারাজা, ভীমপালের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুনেছি, সে নিজে যেমন লড়তে পারে, তেমনি সৈন্যদেরকেও লড়তে জানে।

আমাদের যেসব গোয়েন্দা মাথুরার উৎসবে উপস্থিত হয়েছিল, তারা গণমানুষের মধ্যে গযনী সৈন্যদের সম্পর্কে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। সেখানে লাখো মানুষের জমায়েত হয়েছিল। সাধারণ লোকেরা এতোটাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে, গযনী সৈন্যদের আগমন খবর শুনলে ওরাই মানুষজনকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলবে।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, কারো ধর্মীয় পবিত্র স্থানে আক্রমণ হলে অনুসারীরা জীবন বাজি রাখতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করে না।"

সুলতান মাহমূদ সেনাপতি ও কমান্ডারদের জরুরী দিক-নির্দেশনা দিয়ে মাত্র তিন দিন প্রস্তুতির সময় দিয়ে চতুর্থ দিন রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন।

১০১৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার মোতাবেক ৪০৯ হিজরী সনের ১৩ জুমাদিউল আউয়াল গযনী থেকে তাঁর সৈন্যরা রওনা হয়। এই অভিযানে তার সৈন্যসংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য পাওয়া যায়। উতবী লিখেছেন, এই অভিযানে সুলতান মাহমূদের নিয়মিত সৈন্য ছিল এগারো হাজার আর স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা কুড়ি হাজার। কিন্তু বাস্তবতার বিচারে তা যৌক্তিক মনে হয় না।

ঐতিহাসিক ফারিশ্‌তা লিখেছেন, মাথুরা অভিযানে সুলতান মাহমূদের সৈন্যসংখ্যা ছিল একলাখ অশ্বারোহী এবং বিশ হাজর পদাতিক। এই বিশাল বাহিনী তিনি তুর্কিস্তান, খাওয়ারিজম, খুরাসান এবং প্রতিবেশী মুসলিম রাজ্যগুলো থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। গবেষক প্রফেসর মুহাম্মদ হাবীব বলেছেন, মাথুরা অভিযানে সুলতান মাহমূদের সৈন্যসংখ্যা ছিল একলাখ সওয়ারী ও পদাতিক এবং বিশহাজার ছিল স্বেচ্ছাসেবী।

বিশাল এই সেনাবহর প্রায় কয়েক মাইল দীর্ঘ ছিল। বিশাল এই বাহিনী সিন্ধু ও ঝিলম নদী ভরা বর্ষায় পার হয়েছিল। গরুগাড়ী ও ঘোড়াগাড়ী এবং মালবাহী গাড়ীগুলোকে নদী পারাপারের জন্য নৌকার সেতু বানানো হয়েছিল।

এই অভিযানে সুলতান একজন দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন অনুভব করলেন। তিনি বর্তমান কোটলী কাশ্মীর (কালাঞ্জর) এর রাজার কাছে এই পয়গাম দিয়ে দূত পাঠালেন যে, কন্নৌজ পর্যন্ত পৌঁছাতে তার একজন দক্ষ রাহবার (পথ প্রদর্শক) এর প্রয়োজন। কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীও দূতের সাথে পাঠালেন সুলতান।

'গযনীর সুলতান আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।' কোটলী কাশ্মীরের (কালাঞ্জর) রাজার দরবারে হাজির হয়ে রাজার উদ্দেশ্যে বললো সুলতানের প্রেরিত দূত। সুলতান আপনাকে সেই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যে চুক্তিতে আপনি গযনীবাহিনীর যে কোন প্রয়োজন পূরণে সহযোগিতা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সুলতান আরো বলেছেন, আমার গন্তব্য অন্যদিকে, আপনি আমার এই বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আপনার রাজ্যে আসতে বাধ্য করবেন না। আপনি যদি স্বাধীনতা ও স্বাধিকার বজায় রাখতে চান, তবে দ্রুত আমার প্রয়োজন পূরণ করে দিন।

আমাকে এমন একজন রাহ্বার দিন, যে কোন অবস্থাতেই আমাকে ধোঁকা দেবে না। তার যে কোন ধরনের ধোঁকাবাজী বা চালাকীকে আমি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা মনে করবো।'

সুলতানের পয়গাম শুনে রাজা চিন্তায় পড়ে গেলেন। দূত আবারো বললো, সুলতানের সাথে যে পরিমাণ সেনা রয়েছে, আপনার রাজ্যে হয়তো এ পরিমাণ মানুষও নেই।

কোটলী কাশ্মীরের রাজা চিন্তা দীর্ঘায়িত না করে তখনই তার ছেলে শাহীকে কারো মতে মালীকে দূতের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। রাজার ছেলে সুলতানের কাছে পৌঁছালে তিনি শাহীকে বললেন, তুমি সবচেয়ে কম সময়ে যাওয়া যায় এমন পথ দিয়ে আমাদের নিয়ে চল।

পথিমধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট দুর্গ পড়লো। সুলতান এগুলোকে অবরোধ করে দুর্গপতিদের বললেন, তোমরা দুর্গ আমাদের কাছে হস্তান্তর করে দাও। অধিকাংশ দুর্গপতি অবরোধের আগেই সাদা পতাকা উড়িয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল।

সুলতান মাহমূদ প্রত্যেক দুর্গ থেকে প্রয়োজন মতো মালসাম্রগী নিয়ে প্রতিটি দুর্গে কিছুসংখ্যক নিয়ন্ত্রণকারী রেখে সামনে অগ্রসর হলেন এবং এসব দুর্গের হিন্দু সৈন্যদেরকে ঠেলাগাড়ি ও রসদ পরিবহনের কাজে লাগালেন।

ইবনুল জাওযী লিখেছেন, মাথুরা অভিযানে সুলতানের সামনে যতো ছোট এবং মাঝারী দুর্গ পড়েছিল, সবই জয় করে তিনি সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ঐতিহাসিক স্যার আর্লস্টিন লিখেছেন, যেসব বনভূমিতে বাতাসও পথ হারিয়ে ফেলতো, সেইসব বনভূমি দিয়ে অনায়াসে সুলতান তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। পাঞ্জাব এলাকার পাঁচটি নদী যেনো তিনি উড়াল দিয়ে পেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং প্লাবনের মতোই বুলন্দ শহরে উপনীত হন।

পূর্বপরিকল্পনা মতো মাথুরাকে এড়িয়ে গেলেন সুলতান। ১০১৮ সালের ২ ডিসেম্বর তিনি যমুনা নদী পার হলেন। যমুনা পার হওয়ার পর তার সামনে এলো সারসভা দুর্গ। তিনি দুর্গ অবরোধের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু দুর্গ অবরোধ সম্পন্ন হওয়ার আগেই দুর্গপতি তার পরিবার-পরিজন নিয়ে পালিয়ে গেল। দুর্গপতি পালিয়ে গেলে দুর্গের সৈন্যরা কোনরূপ বাধাবিপত্তি না দিয়ে সবাই হাতিয়ার ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করলো। এতে সুলতান ত্রিশটি জঙ্গীহাতি পেলেন।

এ পর্যন্ত এসে তার একটি ক্যাম্প দরকার ছিল। সুলতান বিনাযুদ্ধেই কাঙ্ক্ষিত ক্যাম্প পেয়ে গেলেন। এই দুর্গকে সুলতান তার রসদাগার বানিয়ে নিলেন এবং দুর্গের ধনাগার থেকে তিনি খাজনা হিসেবে পেলেন দশ লাখ দিরহাম।

সারসভাকে রসদাগার করে সুলতান বুলন্দশহরের দিকে রওনা হলেন। তাদের অবস্থান থেকে বুলন্দশহর অন্তত একশো মাইল দূরে ছিল। সেখানে পৌছাতে তাদের দুটি নদী পেরিয়ে যেতে হবে। একটি গঙ্গা, অপরটি গঙ্গা নদীর শাখা রামগঙ্গা। সুলতান রসদপত্র রাখার জন্য সুরক্ষিত দুর্গ হাতে পাওয়ার কারণে তিনি রসদপত্রকে আর টেনে নেয়া সমীচীন মনে করলেন না। তিনি শুধু অস্ত্র ও সেনাদের সাথে নিলেন। কয়েদীদের দিয়ে নৌকার সেতু তৈরী করিয়ে সৈন্যসামন্ত পার করে বুলন্দশহর অবরোধ করলেন।

বুলন্দ শহরের শাসক ছিল হরিদত্ত। এই হরিদত্ত কন্নৌজের মহারাজাকে বলেছিলেন, তার একজন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা জানিয়েছে, কন্নৌজের মহারাজার একান্ত কর্মকর্তা জগন্নাথ আসলে মুসলমান এবং গযনী সুলতানের

দক্ষ গোয়েন্দা। চম্পারাণীর সাথে তার গোপন সম্পর্ক রয়েছে। হরিদত্ত হিন্দুস্তানের অন্যান্য রাজা-মহারাজাদের মতোই মন্দিরের বৈঠকের পর অঙ্গীকার করেছিল হিন্দুধর্ম ও মহাভারতের পৌত্তলিকতা বজায় রাখতে সে জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করবে। কিন্তু বুলন্দশহরের অধিবাসীরা যখন জানতে পারলো, গযনীর সৈন্যরা অবরোধ করেছে, তখন সাধারণ লোকজনের মধ্যে দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়ে গেল। শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক। চারদিকে দেখা দিল হৈ চৈ। এই আতঙ্ক ছড়িয়েছিল গযনীর কৌশলী গোয়েন্দারা।

সুলতান মাহমূদ দুর্গের প্রধান ফটকে তার লোকজন পাঠিয়ে ঘোষণা করালেন, শহরের সকল সশস্ত্র লোকেরা যদি হাতিয়ার ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে শহরকে ধ্বংস্তূপে পরিণত করা হবে।

জঙ্গীহাতিগুলোকে প্রধান ফটকে ধাক্কা মেরে ফটক ভাঙার জন্য সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিলেন সুলতান। রাজা হরিদত্ত এই অবস্থা দেখে দুর্গের প্রধান ফটক খুলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। তার পেছনে দশ হাজার সেনাও হাতিয়ার ফেলে দিয়ে হাত উঁচু করে এসে রাজার পেছনে দাঁড়াল। হরি দত্তকে সুলতানের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে সুলতানের উদ্দেশ্যে সে বললো–

"আমি নিজের, আমার জাতিগোষ্ঠী ও জনগণের নিরাপত্তা চাই। আমি এবং আমার এই দশ হাজার সৈন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণে আগ্রহী। দয়া করে আপনি আমাদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করুন।"

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, আসলে এই দশ হাজার সৈন্য ছিল না। এদের অধিকাংশই ছিল সাধারণ নাগরিক। তারাই হরিদত্তকে বাধ্য করেছিল শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যেনো তিনি শান্তিচুক্তি করেন। যদি রাজা তা না করেন, তাহলে নাগরিকরা তাদের অনুগত সৈন্যদের দিয়ে প্রধান ফটক খুলে দেয়ার ব্যবস্থা নেবে। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, রাজা হরিদত্ত ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

* * *

সুলতান মাহমূদ দশ হাজার লোকের এই বাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণ করলেন এবং রাতের বেলায় গঙ্গা নদী পারাপারে তাদের ব্যবহার করলেন। নদী পেরিয়ে তিনি মাথুরাকে পাশ কাটিয়ে মহাবনের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি

আগেই খবর পেয়েছিলেন মহাবনের রাজা কুয়ালচন্দ্র যুদ্ধের জন্য তার সৈন্যদেরকে প্রস্তুত করে রেখেছেন। ঘন জঙ্গল ছিল স্থানীয় শাসক কুয়াল চন্দ্রের বিরাট সহায়ক। তার সেনারা জঙ্গী হাতিগুলোকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল।

সুলতান মাহমূদ জঙ্গলকে এড়িয়ে তার সেনাদের একটি বড় অংশকে জঙ্গলের দুই প্রান্তে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি শুধু অগ্রবর্তী দলকে জঙ্গলের ভেতরে এমনভাবে প্রবেশ করালেন দেখে মনে হবে তারা মহাবনের সেনাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে একেবারেই বেখবর।

সুলতানের অগ্রবর্তী সেনারা যখন জঙ্গলের মাঝামাঝি স্থানে পৌছল তখন কুয়ালচন্দ্র তার সৈন্যদেরকে আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে দিল। সুলতানের অগ্রবর্তী দলের সকল সৈন্য ছিল অশ্বারোহী। আক্রমণ শুরু হতেই তারা সবাই জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল। জঙ্গল ছিল খুব ঘন। এখানে তীরন্দাজদের তীর তেমন কার্যকর কোন ভূমিকা রাখার সুযোগ ছিল না। ওরা যখনই তীর ছুঁড়তো সুলতানের যোদ্ধারা খুব সহজেই তাদের লক্ষ্যচ্যুত করে ফেলতো।

এমতাবস্থায় হঠাৎ করে কুয়াল চন্দ্রের সৈন্যদের উপর ডানবাম এবং পেছন দিক থেকে অতর্কিত আক্রমণ শুরু হলো। শত্রুদের উপর স্বগোত্রীয়দের ত্রিমুখী আক্রমণ শুরু হতেই সুলতানের অগ্রবর্তী সৈন্যরা এদিক ওদিক সটকে পড়ল। হিন্দু সৈন্যদের তখন সুলতানের সৈন্যদের হাতে কাটা পড়া নয়তো পালিয়ে প্রাণ বাঁচানো ছাড়া বিকল্প কোন পথ ছিল না।

ঐতিহাসিক স্যার আর্লস্টিন এই যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে লিখেন, এতো বিশাল জঙ্গল হওয়ার পরও গযনীর হাজার হাজার সৈন্য কুয়ালচন্দ্রের সৈন্যদের খোঁজে জঙ্গলে চিরুণী অভিযান চালাল। জঙ্গলের পিছনে ছিল গঙ্গানদী। যে গঙ্গানদী পেরিয়েই পথ ঘুরে সুলতানের বাহিনী কুয়ালচন্দ্রের বাহিনীকে পেছন দিক থেকে ঘিরে ফেলে। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে কুয়াল চন্দ্রের সৈন্যরা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল; কিন্তু তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় ছাড়া অধিকাংশই সুলতানের সৈন্যদের হাতেই প্রাণত্যাগ করল।

রাজা কুয়ালচন্দ্রকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। মুসলিম সৈন্যরা যখন বিজয়ী বেশে তার প্রাসাদে প্রবেশ করল, তখন রাজপ্রাসাদের পাহারাদার তাদের জানাল, রাজার ছিল একজনই মাত্র স্ত্রী ও একটি মাত্র সন্তান। তিনি তরবারী দিয়ে উভয়কে হত্যা করে নিজেই নিজের তরবারী বুকে বিদ্ধ করে আত্মহত্যা করেন।

রাজমহলের পাহারাদার মুসলিম সৈন্যদেরকে প্রাসাদের ভেতরে নিয়ে তাদের মৃতদেহ দেখাল। মহাবন থেকে একশ পঁচাশিটি হাতি এবং বিপুল পরিমাণ সোনাদানা সুলতানের হস্তগত হলো।

মাথুরা সম্পর্কে সুলতানের দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা আমীল বিন তাশকীন তাকে জানিয়ে দিয়েছিল, মাথুরা শহরের প্রতিরক্ষাদেয়াল খুবই মজবুত। কন্নৌজ মহারাজার দু'টি সেনাদলই মূলত মাথুরার নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। মহাবনের রাজাও তাদের সহযোগিতা করেন। সারসভা ও বুলন্দশহরের শাসকরা এমন আত্মশ্লাঘা অনুভব করতো যে, কেউ তাদের উপর বহিরাক্রমণ করে মাথুরা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। কারণ, প্রকৃতিগতভাবে যমুনা ও গঙ্গা নদী মাথুরার সুরক্ষার ব্যবস্থা বিরাট সহায়ক ছিল।

ইতিহাস বলে, সুলতান মাহমূদ অত্যন্ত বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে আগে চারপাশের ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে পরাজিত করে পথের সব বাধা-বিপত্তি দূর করেন। এরপর প্রতিবন্ধক মহাবনের সামরিক শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে মাথুরার দিকে অগ্রসর হন।

তিনি দূর থেকে মাথুরা শহরকে দেখে বিস্মিত হয়ে দারুণ! দারুণ!! বলে চিৎকার করেন। এরপর একদিন তিনি গযনীর গভর্নরকে মাথুরা শহরের সৌন্দর্য এবং হিন্দুদের নির্মাণনৈপুণ্য সম্পর্কে লিখেন, মাথুরা নগরীর স্থাপনা ও নির্মাণশৈলী এখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাসের মতোই মজবুত ও বাহারী। এখানকার অধিকাংশ ধর্মীয় স্থাপনা মর্মর পাথরে তৈরী। গঠনশৈলী দেখেই বোঝা যায়, এসব মন্দির ও ইমারত যেনতেন ভাবে তৈরী হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে বছরের পর বছর সময় ও বহু শ্রমের বিনিময়ে এসব স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। এসব স্থাপনা তৈরীতে হিন্দুরা কোটি কোটি দিনার খরচ করেছে। মন্দিরগাত্রে নিপুণ কর্মকৌশলে ফুটিয়ে তুলেছে হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাস। কোন কোন স্থাপনা তৈরীতে হয়তো শত বছরও ব্যয় করা হয়েছে। বস্তুত এই শহরের রূপ-সৌন্দর্য আমার পক্ষে কোন ভাষায়ই বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

মাথুরা পর্যন্ত পৌঁছাতে সুলতানের তেমন কোন জনবল ব্যয় করতে হয়নি, যার ফলে অনেকটা নিশ্চিত ও দৃঢ়চিত্তে তিনি মাথুরার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। মহাবনের পালিয়ে আসা সৈন্যদের অনেকেই মাথুরা শহরে পৌঁছে মুসলিম সৈন্যদের সম্পর্কে ত্রাস ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল। অপরদিকে গোয়েন্দা হিশাম ও তার সঙ্গীরাও লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল।

মহাবন থেকে পালিয়ে আসা সৈন্যরা মাথুরায় এসে লোকজনের মধ্যে এমনই ভীতি ছড়িয়ে দিলো, 'গযনী বাহিনীর সামনে বিশাল বটবৃক্ষও টিকে থাকতে পারবে না।'

এসব আতঙ্ক ছড়ানোর ফলে শহরের অধিবাসীরা প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা না করে জীবন বাঁচাতে এবং বিপদ অপসারণের জন্য মন্দিরগুলোতে গিয়ে জমায়েত হয়ে বিপদঘণ্টা বাজাতে শুরু করলো।

গযনীর সৈন্যরা মাথুরা শহর অবরোধ করলে সামান্য প্রতিরোধ হলো বটে; কিন্তু তা গযনী বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে বানের খড়কুটোর মতোই ভেসে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই খুলে গেল শহরের প্রধান গেট। সুলতান মাহমূদ বিজয়ীবেশে শহরে প্রবেশ করে প্রথমেই গেলেন মাথুরার প্রধান মন্দিরে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেবের অতি মূল্যবান মূর্তি প্রতিস্থাপিত ছিল। এই মূর্তিগুলো ছিল খুবই মূল্যবান উপাদানে তৈরী। এ দুটি মূর্তির গঠন ছিল অস্বাভাবিক সুন্দর। খুবই দামী ও উজ্জ্বল হীরে দিয়ে বানানো হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেবের মূর্তি। কৃষ্ণমূর্তির দুটি চোখ ছিল দীপ্তিময় হীরের দ্বারা গঠিত। পাঁচটি বিশাল মূর্তি ছিল সম্পূর্ণ সোনার তৈরী এবং এগুলোর চোখে ছিল দামী হীরে। এই হীরের তৎকালীন বাজার মূল্য ছিল পঞ্চাশ হাজার দিনার।

সবচেয়ে ছোট মূর্তিটিতে পাঁচশ কেজি সোনা ছিল। একটি মূর্তিকে গলিয়ে পাওয়া গিয়েছিল ৯৮০০০ (আটানব্বই হাজার) গ্রাম সোনা। এ ছাড়া একশ মূর্তি ছিল সম্পূর্ণ রুপার তৈরী।

বিজয়ী সুলতান মাহমূদ পাথরের মূর্তিগুলোকে ভেঙে ফেললেন এবং সোনার মূর্তিগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে গলিয়ে ফেললেন। হিন্দুদের এই পবিত্র শহর থেকে পৌত্তলিকতার বিষময় উপাদান দূর করতে তিনি কুড়ি দিন মাথুরা শহরে অবস্থান করলেন। এই কুড়ি দিন পর্যন্তই শহরের বিভিন্ন স্থাপনা জ্বলছিল এবং মাথুরা শহর একটি ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

এদিকে মহারাজা কন্নৌজ সুলতানের আগমন খবর শুনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে জোর চেষ্টা চালাতে লাগলেন। কারণ, সুলতানের পরবর্তী লক্ষ্য কন্নৌজ। এবার কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপালের পালা।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

[চতুর্থ খণ্ডের জন্য অপেক্ষা করুন]

সুলতান মাহমুদ গজনবীর ঐতিহাসিক
সিরিজ উপন্যাস ৩

ভারত অভিযান
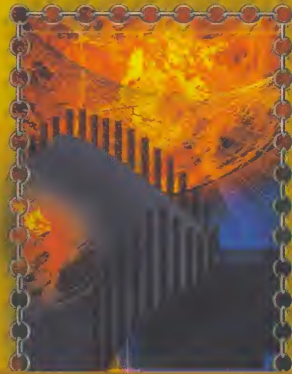
VAROT OVIJAN : 1
ISBN 984-70109-0000-3 SET